ইস্কুলের ইতিবৃত্ত

(পশ্চিম খণ্ড)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় এম-এ (বাংলা), বি-টি. এম-এ (শিক্ষাবিজ্ঞান)
অধ্যাপক ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পুরস্কার প্রাপ্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন-বৃত্তিপ্রাপ্ত

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স
৬১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী '৫৪

মূল্য : সাত টাকা

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত এবং রাণীশ্রী প্রেস, ৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবামাচরণ মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রদ্ধেয়

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে—

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ঃ

বাংলা-পড়ানোর নূতন-পদ্ধতি
(শিক্ষাবিষয়ক)

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত (প্রাচ্য খণ্ড এবং
শিক্ষা-দর্শন খণ্ড প্রকাশিতব্য)

কাঁচা-মাটি (গল্প সংগ্রহ)

ইস্কুল (স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটক)

ভূমিকা

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ইস্কুলের সঙ্গে যেমন প্রায় প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠতা, অপর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, ইস্কুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি অল্পই বটে। গ্রামে বা সহরে ইস্কুল আছে, আর সেখানে লেখাপড়া করানো হয়—এইটুকুই তো ইস্কুলের পরিচয় নয়। কত হাজার বছর আগে পিতামাতার হাত থেকে লেখাপড়া বা বৃত্তিশিক্ষার ভার সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রহণ করেছিলেন। আর ধীরে ধীরে সেই ইস্কুল এখন সমাজের এমন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যে, ইস্কুল-বর্জিত অঞ্চলে আমরা বসবাসই করতে চাই না।

আবার, এই ইস্কুলকে রাষ্ট্র নিজের কাজে লাগাতেও কসুর করে নি। সমাজবাসীর ঐক্যের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে এমনভাবে এই ইস্কুল জড়িয়ে রয়েছে যে, ইস্কুলকে আমরা দেবালয়ের মতোই মনে করি।

ইস্কুলকে বুঝতে পারলেই সমাজকে বুঝতে পারা যায়। জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে ইস্কুল বিশেষভাবে জড়িত। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির যেখানে যা কিছু মানুষ আহরণ করেছে তা-ই ইস্কুলে এনে তুলেছে ; যেন জাতির এ এক গোলাবাড়ী।

শুধু গোলাবাড়ী নয়, ইস্কুল মানুষের এক বিচিত্র-দর্শন। পরিবার থেকে জাতির মধ্যে এই ইস্কুল কেমন ভাবে এল, আবার জাতির কুক্ষি থেকে ব্যক্তির হাতে সেই ইস্কুল কেমন ভাবে আসছে—সেই সংগ্রামের বিচিত্র পরিচয় রয়েছে এই ইস্কুলে।

সমাজের মানুষও এই ইস্কুল-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবার-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতা থেকে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতা সৃষ্টিতে এর অংশ গ্রহণ, আবার ব্যক্তিগত তারতম্য থেকে অস্মিতায় তার রূপান্তরণ—প্রভৃতি প্রমাণ করে, ইস্কুল এবং মানুষের মন যেন একটি চাকার মতো অবিরত ঘুরছে কিন্তু একস্থানে দাঁড়িয়ে নয়।

বর্তমান গ্রন্থে আমি ইস্কুলের সেই রূপটিকেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি।

ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ইতিহাস, সমাজ-গঠন, সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ায় সেগুলি এড়িয়ে যাই নি। বাংলা ভাষায় প্রাথমিক কাজ ব'লে সর্বত্র হয়ত সাফল্যের সঙ্গে রচনা করতে পারি নি। আমার পক্ষে বড় অসুবিধা ছিল, পাঠাগারে শিক্ষা-সংক্রান্ত পুঁথি-পুস্তকের অপ্রতুলতার ব্যাপার। প্রামাণ্য এবং সহজে আয়ত্ত করা যায় এমন শিক্ষা-ইতিহাস ইংরেজিতেও যা আছে তা এখনও আমাদের দেশে সুলভ নয়। কাজেই এই পুস্তকের উপকরণ আমাকে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষাদর্শন, এবং শিক্ষা-পদ্ধতির এবং মনোবিদ্যার বই থেকে আহরণ ক'রে নিতে হয়েছে। একটি মঙ্গল হয়েছে এই যে, শিক্ষা-ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকের দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাধীনভাবে বিচার ক'রে নিতে সুযোগ পেয়েছি।

স্বাধীনভাবে বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় আমি অন্য গ্রন্থের উক্তিকে তেমন অনুবাদ করে ব্যবহার করিনি; সেই উক্তি কেন হয়, সমাজ-মানসের কোন্ প্রবণতার দরুণ এই উক্তি করতে হয়, উক্তিটির উদ্দেশ্য কি—সেই বিচার ক'রে বাংলা মর্ম দিয়েছি; অবশ্য ইংরেজি-জানা পাঠকের সুবিধার জন্য সময় সময় বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি উক্তিও তুলে দিয়েছি। কাজেই তার আক্ষরিক অনুবাদ যে করিনি, তা পড়লেই তাঁরা দেখতে পাবেন।

এই পুস্তকের আমি কোন প্রকার মৌলিকতা দাবী করি না। তবে ভুল-ত্রুটিতে হয়ত মৌলিকতা এসে যেতে পারে! অথচ সেইরূপ মৌলিকতার পরিচয় রাখাও আমার অভিপ্রেত নয়। সহৃদয় পাঠক যদি সেগুলি আমাকে নির্দেশ ক'রে জানিয়ে দেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইস্কুলের পরিচয়ই দেবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিষয় সঙ্গতি এবং পাঠের সৌকর্যার্থে তিন খণ্ডে ইস্কুলের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করা মনস্থ করেছি। আমাদের দেশের বর্তমান ইস্কুলের আকৃতি এবং প্রকৃতি বুঝতে সহজ হবে ব'লে প্রথমেই পশ্চিমদেশের ইস্কুলগুলোকে ব্যাখ্যা করেছি। কারণ, প্রধানত ঐ সব দেশ থেকেই আমাদের ইস্কুলের বর্তমান আদর্শ ও গঠন এসেছে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের

অধ্যাপকবৃন্দের কাছ থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছি ; আমি তাঁদের ছাত্র, কাজেই তাঁদের ধন্যবাদ জানানো আমার পক্ষে অশোভন। আর সাহায্য নিয়েছি, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সহকর্মীদের কাছ থেকে এবং এই কলেজের শব্দ-গবেষণা বিভাগ ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণা পর্ষতের বন্ধুদের কাছ থেকে। কিন্তু তাঁদের হয়ত ভবিষ্যতেও বিরক্ত করতে হবে—তাই এখনই ধন্যবাদ দিয়ে সব হিসাব শেষ করতে চাই না।

এত সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও একথা সত্য, প্রবর্তক-সম্পাদক অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের অশেষ স্নেহ এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী মমতা রায়ের অসীম উৎসাহ না থাকলে এ কাজে আমি হাত দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ইতি

কলিকাতা | গ্রন্থকার
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

পরিচিতি

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এই তিনটি বিষয়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা রাষ্ট্রের বিশেষভাবে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর প্রাথমিক কর্ত্তব্য। একটা জাতিকে সুস্থ ও স্বকীয়তায় স্বপ্রতিষ্ঠ করতে হলে শিক্ষার দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। স্বাধীন ভারতে এ বিষয়ে যতখানি মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল তা দেওয়া না হলেও, শিক্ষা সম্পর্কে নানারূপ পরিকল্পনা চলেছে, নানা দিকে কাজও সুরু হয়েছে। বিভিন্ন রকমের ইস্কুল কলেজের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমাদেরই সমাজের মত করে শিক্ষাকে কেমন রূপ দেব? স্বভাবতই আজকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা বাস করতে পারি না। শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি অন্য দেশের মানব-সমাজের প্রভাব স্বীকার করতে হবেই। দীর্ঘ দিন ইংরাজের সম্পর্কে আসায় আমাদের বর্ত্তমান ইস্কুল-পরিকল্পনা বহুলাংশেই পশ্চিম বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারত সেই কাঠামোর মধ্যেই ভারতের নিজস্ব চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এ ছাড়া হয়তো গত্যন্তরও নেই। বিবর্ত্তনের ধারাকে রাতারাতি উল্টে দেওয়াও চলে না। কাজেই আমাদের প্রথম দরকার ইস্কুলের এই চেহারাকে বুঝতে জানা। তাহলেই ঐ চেহারার কোন্ চরিত্র আমাদের পরিবর্ত্তন করতে হবে, কোন্ চরিত্রের কতটুকু গ্রহণ-বর্জ্জন ক'রতে হবে, তাও বুঝতে পারব। অর্থাৎ আজকের ভাঙ্গা-গড়ার ডামাডোলের মধ্যে সমগ্রভাবে আমাদের কর্ত্তব্যটির স্বচ্ছ ও সম্যক ধারণা থাকার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের বহুলাংশ বর্ত্তমান গ্রন্থ 'ইস্কুলের ইতিবৃত্ত' মিটাবে বলে আশা করা যায়।

সারা পৃথিবীর শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের ইতিবৃত্ত গ্রন্থকার তিন খণ্ডে—পশ্চিম খণ্ড, প্রাচ্য খণ্ড ও শিক্ষা-দর্শন খণ্ডে—লিখবার মনস্থ করেছেন। প্রথমেই পশ্চিম খণ্ড লেখা ও প্রকাশের হেতু আমাদের দেশের বর্ত্তমান ইস্কুলের বিবর্ত্তন এই ভূ-খণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোতভাবে সংজড়িত ব'লে।

বক্ষ্যমাণ পশ্চিম খণ্ডে মিশর থেকে সুরু ক'রে হিব্রুদের মধ্য দিয়ে, গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, আয়র্ল্যাণ্ডে, ইংল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে, জার্ম্মানীতে এবং

আমেরিকায় ইস্কুলের ও ইস্কুলের শিক্ষার যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং আজও ঘটছে তারই আলোচনা গ্রন্থকার করেছেন। কেবল ইতিহাস নিয়েই আলোচনা তিনি করেননি, আলোচনা করেছেন সমাজতত্ত্বের, সাধারণ ইতিহাসের, গণ-মননের, মনোবিদ্যার এবং শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা-পরিকল্পনার ও সমাজ-জীবনে তার সংগ্রামময় প্রয়োগের কথা। শিক্ষা-ইতিহাস তথা ইস্কুলের ক্রমবিকাশের উৎস এবং মূলসূত্রটিতে পৌঁছানোর একটা সফল চেষ্টা এই গ্রন্থে আছে।

কি ভাবে সমাজে ইস্কুলের চেতনা এল, সমাজ ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন অনুভব করে, কেন্ কারিগরী বিদ্যার সঙ্গে মনন-বিদ্যার (humanities) সঙ্ঘর্ষ ঘটে, কেন ভাষা-বিরোধ হয়, প্রভৃতি সমস্যা থেকে সুরু ক'রে—কত রকমের ইস্কুল পশ্চিম সমাজে আছে, সে সব ইস্কুলের কাজ কি, কত রকম পড়ানোর পদ্ধতি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হ'ল, সমাজ-বিষয় পাঠ (Social Studies), পরিচালনা পদ্ধতির (Guidance Method) এবং ব্যবহারকের শিক্ষা (Consumer Education) বলতে কি বোঝায় প্রভৃতি সবই এই সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আছে শিক্ষা-মনীষীদের জীবনী ও শিক্ষাদর্শনের পরিচয়—সোক্রাতিস থেকে সুরু ক'রে ডিউয়ি পর্যন্ত—হার্বার্ট এবং মরিসনের পাঠ-টীকার প্রভেদ।

বাংলার শিক্ষা-সাহিত্যে বিশেষভাবে শিক্ষক-শিক্ষণক্ষেত্রে গ্রন্থখানি যে অভিনব, অমূল্য সংযোজন সে বিষয়ে দ্বিমত কেহ করবেন বলে মনে করি না। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানি এদিকে প্রথম দিগ্‌দর্শক হিসাবে নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রন্থের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে লেখকের অননুকরণীয় ভাষা। ভাষা তীক্ষ্ণ, তীব্র, দীপ্ত। স্বচ্ছ চিন্তার মৌলিকতা ও সুশৃঙ্খলিত বিষয়-বিন্যাস লক্ষ্যণীয়। জটিল বিষয়বস্তুকে বলবার সাবলীলতা উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বইখানি পাঠে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা ও গর্ব্ব না হয়ে পারে না। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয় ও বিভাগের পরিধিকেই এই গ্রন্থে পরিক্রমা করা হয়েছে সম্পূর্ণ বাংলা পরিভাষায়, কিন্তু কোথাও কষ্টকল্পনা, অসহজ ও অস্বাভাবিক মনে হ'ল না। গ্রন্থখানি

পাঠে এ কথা বার বার মনে হয়েছে যে, বাংলা ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হবার সম্ভাবনা রাখে। শুধু বাংলা কেন, সম্ভবতঃ সর্ব্ব ভারতের আঞ্চলিক ভাষায়ই এই ধরণের গ্রন্থ এই-ই প্রথম।

উদীয়মান অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় আমার অনুজপ্রতিম এবং অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। বয়সও বেশী নয় তাঁর। এই বয়সের ধর্ম্মেই বোধহয় গ্রন্থে তথ্য পরিবেশনের সময় স্থানে-স্থানে অসহিষ্ণু হয়ে অস্থির মন্তব্য না-করার সংযম রক্ষা করতে পারেননি। প্রুফ দেখার সময় আমার যথাসাধ্য উহা বিষয়বস্তুর গুরুত্বের সহিত সঙ্গত ও শোভন করে দিয়েছি। শ্রীরায়ের স্বভাবের মস্ত বড় ত্রুটি এই যে, তাঁর ধীরসুস্থ গতি, আলস্যপ্রবণ প্রকৃতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাদকতাবর্জিত। অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। নাম-করা ব্যক্তির খোসামোদ না হোক, একটুখানি আনুগত্যে হয়তো অনেক উন্নতির দরজা অবাধ হতে পারতো, কিন্তু তা তাঁর দ্বারা হবার নয়। শ্রীরায়ের প্রথম শিক্ষা-সম্পর্কিত বই 'বাংলা পড়ানোর নূতন-পদ্ধতি'। বই-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, কিন্তু প্রকাশের জন্য অনুরোধ, প্রকাশকের দরজায় ধর্না দেওয়া—অত্যন্ত সঙ্কোচের ব্যাপার তাঁর কাছে। অপ্রকাশিতই রয়ে যায় পাণ্ডুলিপি। ঘটনাক্রমে উহা আমার হস্তগত হয়। পরিচ্ছন্ন রুলটানা কাগজ। ঝরঝরে হাতের লেখা। সংক্ষিপ্ত সংযত ভাষা। নিজস্ব লেখার ভঙ্গী। কোথাও কমা-সেমিকোলনের ত্রুটি নেই। সেদিন পাণ্ডুলিপি দেখেই লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলাম। বইখানি ছাপারও ব্যবস্থা করেছিলাম। তারপর 'ইস্কুলের ইতিবৃত্ত' লেখার প্রেরণা ও তাগিদ আমিই দিই এবং দিই যোগ্য বলেই। সে যোগ্যতা বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীরায় দেখিয়েছেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। এই আত্ম-পরিতৃপ্তির জন্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মাদৃশ নগণ্য ব্যক্তির এই পরিচিতি দিবার ধৃষ্টতা।

নামজাদা কোন শিক্ষাবিদের প্রশংসা-পত্র থাকলে হয়তো পুস্তকখানির কদর আর একটু বাড়তো। কিন্তু শ্রীরায়েরই কথা, 'কি দরকার সুপারিশ-সার্টিফিকেটের সাইনবোর্ড কপালে ঝুলিয়ে বাজারে ঘোরার! অন্তঃসার যদি থাকে তো মানুষ একদিন নিজের বিবেকেই বাছাই করে নেবে।' এই ভরসা রাখি বলেই শ্রীরায়কে তাঁর প্রতিভার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বঙ্গবাণীর সেবায় আরও উদ্বুদ্ধ হতে অনুরোধ করি। ইতি

১লা ফাল্গুন '৬৪
কলিকাতা

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী
(সম্পাদক : প্রবর্ত্তক)

সূচীপত্র

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥"

॥ সমাজের কথা ॥

রাজা-বাদশা'র ইতিহাস আছে, পণ্ডিতদের জীবনের ইতিহাস আছে, জাতির সংগ্রামের ইতিহাস আছে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী কুকুরটার মতো মানব-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ইস্কুল-কলেজ এবং শিক্ষা আবহমান কাল চলছে তার ইতিহাস অন্তত আমাদের বাংলায় বিশেষ আলোচনা হয় নি। পৃথিবীর সর্বত্র মারণ-অস্ত্র আর বণিকী-কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাধারার নতুন নতুন দিক উদ্ভাবনার কতরকমই না তোড়জোড় চলে। আমাদের দেশেও তোড়জোড় আছে, কিন্তু উদ্ভাবনীশক্তি আনবার চেষ্টা করছি আমরা বিদেশী 'সাবধান ৪৪০ ভোল্ট'-এর মোটর থেকে উৎসারিত ক'রে। বুদ্ধদেব ভারতের, অহিংস মন্ত্র ভারতের, গান্ধীজী ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। কিন্তু বিদ্যালয়গুলো 'হাই' হ'য়ে বসে আছে, পাঠক্রমে ইংরেজি ভাষা প্রধান, শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি-নিয়ামক আসছেন হয় কামচাটকা থেকে, নয় লণ্ডন থেকে, না হয় ন্যুইয়র্ক থেকে। যুধিষ্ঠির নরক-ভোগ করবার পর বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন কুকুরটা ধর্মরাজ নিজে। তার পূর্বে সঙ্গী হিসেবে তাকে পছন্দ করেছেন, জীব হিসেবে আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু সে যে তাঁর নিজেরই অন্তরের জিনিস তা দুঃখভোগ না ক'রে বুঝতে পারেন নি। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, তখন দু'বার বুঝতে পেরেছিলাম, ইস্কুল আর শিক্ষা আমাদেরই সমাজ-সম্মত হওয়া দরকার; একবার উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে, আর-একবার অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাতে। প্রথমবার জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছিলাম, দ্বিতীয়বার বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন করব ব'লে শপথ নিলাম।

কিন্তু সমাজ-সম্মত কথাটির অর্থ কি? সমাজ থেকে জাত যে-বস্তুটি তা স্বভাবতই সমাজ-সম্মত; কারণ, সমাজের আর সমাজ-ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সে-বস্তুটি তৈরী হয়। কিন্তু সমাজ তো স্থির থাকে না! সমাজ

বদলায়; নিজেও যেমন বদলে যায় তেমনি অপর সমাজ কর্তৃকও বদলে যায়। নিজে যখন বদলায়, তখন নিজের অভাব মিটাতে নিজেই উপকরণ সৃষ্টি করে; আর অপরে যখন বদলে দেয়, তখন তাকে ভাবতে হয়, অপরের উপকরণের কতটুকু সে রাখবে, কতটুকু অগ্রাহ্য করবে। গ্রহণ আর বর্জনের বড় মাপকাঠি হচ্ছে, সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে সত্যকার বোধ। এবার তর্ক উঠতে পারে, বিদেশী উপকরণ তাহ'লে কিছু এলই। আসবেই তো। কিন্তু যখন সেই বিদেশটিই সেই উপকরণ নিয়ে নাস্তানাবুদ, তখন সেইটিকে আমার ঘরে স্থান দেওয়া মানে আমার ঘরটিকে আবর্জনাস্তূপ ক'রে তোলা। কাজেই যুগে যুগে শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন মানুষেই বোধ করে, সমাজ-নায়ক হয়ত সেটি ঠিক পথে চালু করেন।

কিন্তু সমাজের মধ্যে আছে কি? মানুষ তো আছেই, মানবগোষ্ঠী আছে, ভৌগোলিক পরিবেশ আছে, ভূখণ্ড আছে, মানুষের অভিজ্ঞতা আছে। এই সব বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে কোন্ শক্তি? মোটামুটি একটা হিসাব করা যায়, যেমনঃ (১) পিতা-মাতা নিয়ন্ত্রিত পরিবার বা স্বজন গোষ্ঠী, (২) ধর্ম-নিয়ন্তা, (৩) অর্থনৈতিক শক্তি, (৪) রাজনৈতিক শক্তি, (৫) এবং সামরিক শক্তি।

এই সব শক্তি কাজ করে, ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পিতামাতা পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ গঠনের একটা নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখেন, যৌন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন; ধর্ম-নিয়ন্তারা পূজো-পালি বা আধ্যাত্মিক দিককে পরিচালিত করেন; অর্থনৈতিক শক্তি সমাজের আয়-ব্যয়ের কথা ভাবে, সমাজ ব্যক্তির উপার্জনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমাজ-সম্পদ প্রত্যেকের ভোগে আনতে চেষ্টা করে; রাজনৈতিক শক্তি এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির সম্পর্কের অনুশাসন জানিয়ে দেয়, সমাজ-ব্যক্তির সমাজে আচরণ করবার নিয়মগুলো জানিয়ে দেয়, কোন সময় অপর সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নিরূপণ করে; সামরিক শক্তি সাধারণত সমাজকে অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, হিংসা আর বিদ্বেষের দুয়ারের এ জাগ্রত প্রহরী।

এরা কাজ করে। কিভাবে এরা কাজ করে, সেটুকুও একটু দেখা যাক।

এই পাঁচটি শক্তি সবাই স্বয়ং-নির্ভর। সাধারণত, একটি আর-একটির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু উপেক্ষাও করতে পারে না। আবার এমন সময়ও দেখা যায় যখন একটি প্রবল হ'য়ে আর-গুলোকে দাবিয়ে রাখে। যেমন ক্রুজেডের সময় ধর্মনিয়ন্তারা সামরিকশক্তিকে হাতে তুলে নিল, পরিবার-নীতি ভেঙে দিল, রাজনৈতিক শক্তিতে চিড় ধরিয়ে দিল; যুদ্ধের সময় বিশেষ নিয়মে সমাজ-মানুষের অশন-বসনে হস্তক্ষেপ করল। শক্তিতে শক্তিতে এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বা মাৎস্য-ন্যায় দেখা যায়। তবু স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কাজ করে কেমন ভাবে? শৃঙ্খলাবিধান ক'রে। প্রত্যেক শক্তিরই একটা নিজের চরিত্র আছে। এই চরিত্রকে তারা নিয়মবদ্ধ ক'রে অক্ষুন্ন রাখে। নিয়মবদ্ধ করে তারা ভাষার সাহায্যে, শিক্ষার সাহায্যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা-কে কাজে লাগিয়ে। সমাজতত্ত্বের আর বেশি দূর আমরা এগোতে চাইনে। আমরা এখানেই পেয়ে গেলাম শিক্ষার স্থান কোথায়। শিক্ষা স্বয়ং-নির্ভর নয়, সে আশ্রয় করে উপরের পাঁচটি শক্তির যে-কোন একটিকে। অথচ, বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো সে যদি আলোর ডুমে যায় সে দেবে আলো, পাখার মধ্যে ঢুকলে সে দেবে হাওয়া, কারখানায় ঢুকলে সে চালাবে বিভিন্ন যন্ত্র।

তবে শিক্ষা যে একেবারেই আত্ম-নির্ভর হতে পারে না, তা কিন্তু নয়। আমরা যখন আদর্শ-মানুষের কল্পনা করি, মহাপুরুষদের চরিত্র আয়ত্ত করতে চাই, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-বোধ সৃষ্টি করতে চাই—তখনই শিক্ষার সেই আত্মনির্ভরতা স্বীকার করি। পর নিরপেক্ষ শিক্ষাই শিক্ষার প্রকৃত রূপ। এই রূপ আমাদের ধ্যানে আছে, আমাদের শ্রদ্ধায় আছে, আমাদের দর্শনে আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা শিক্ষার স্থূল দিকটিকেই চাই, তার নৃসিংহ মূর্তিটিকে চাই। সেই নৃসিংহ-মূর্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিপদ থেকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু তার রূপ ধ্বংসেরই রূপ, তাকে দেখে বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা জাগে না। গোপীরা যেমন ক'রে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারেনি, আমাদের অন্তরস্থ মনও তেমনি ব্যবহারিক শিক্ষা, সমাজ-শক্তির যে কোন একটির উপরে নির্ভর-করা শিক্ষাকে ভালোবাসতে পারে নি। তাই শিক্ষা সংস্কারকদের মতবাদে বৈষম্যের আর ইয়ত্তা নেই,

কেউ একটি সর্ববাদী শিক্ষার কথা বলতে পারেন না ; আর তাই আমাদের শিক্ষা সংস্কারে কমিসনের পর কমিসন বসে, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন হয় না, তাদের জীবনের নীতি দৃঢ় হয় না ; বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে তারা তাঁতের মাকুর মতো একদিক থেকে আর-একদিক অবিরাম চলছে, কিন্তু মাকুতে স্থতোটুকু নেই। বৈদিক ঋষিরা শিক্ষার সেই বল্লভ রূপ দেখতে পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বল্লভকে কল্পনা ক'রে প্রচলিত শিক্ষা-কে বর্জন ক'রেছিলেন, গান্ধীজী শিক্ষার কল্যাণের দিককে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যোগীর ত্রিনয়ন আছে তাই চোখ বুঁজেই দেখতে পান, কিন্তু আমাদের দুইটি মাত্র নয়ন ; জন্ম মুহূর্তে ঐ সম্পদ পেয়েছিলাম, মৃত্যুর পূর্বে ঐ দুটিকে আর ছাড়তে রাজি নই। যেন, বিনা আয়াসে কালোবাজারী ক'রে সম্পদ জুটিয়েছি, জগতের বিষয় বস্তু স্বাভাবিকভাবেই ওর কাছে ধরা দেবে, চিন্তা করতে হবে না, শ্রম করতে হবে না। বেশতো চলছে। গড্ডলিকা। ব্যবহারিক-বুদ্ধির গড্ডলিকা প্রবাহ।

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত আলোচনায় আমরা শিক্ষার এই আত্মনির্ভর রূপ আর সমাজ-শক্তির আশ্রিত রূপের দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে দেখতে পাই। তবে সে দ্বন্দ্বটি শিক্ষা-ভূমিতে তেমন হয় না, একটু উপরে গিয়ে। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব আছে সমাজের ঐ পঞ্চশক্তির মধ্যে, শিক্ষাকে কে কুক্ষিগত করবে—সেই ব্যবস্থা নিয়ে। প্রথম দ্বন্দ্বের আভাস আমরা 'শিক্ষার লক্ষ্য' নির্ধারণের বেলাতে পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই লক্ষ্যটিকে হাতিয়ার ক'রে শিক্ষা যখন কাজে-কর্মের মধ্যে নেমে আসে তখনই কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কে হস্তগত করবে। পরিবারের আশ্রয়ে আসবে, ধর্মযাজকের আশ্রয়ে, না রাজনীতি-অর্থনীতি বা সমরশক্তির আশ্রয়ে ? ইস্কুলের উপকরণগুলো কিন্তু সবাই বজায় রাখে। ইস্কুলের প্রধান উপকরণের মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক আর জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই তিনটি উপকরণ একত্র করবার জন্যই শিক্ষানীতি, শিক্ষায়তন, পুঁথিপুস্তক ; পুঁথিপুস্তক, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষার্থী-শিক্ষক আর বিষয়বস্তু নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে ইস্কুলগুলো কিভাবে গড়ে উঠেছে—সেই কথাই বর্তমান গ্রন্থে আমরা আলোচনা করব। তত্ত্বের দিকটি আমরা আপাতত বন্ধ রাখছি, শুধু ইতিহাসের দিকটাই আলোচনা করব।

কিন্তু সে ইতিহাস বুঝতে হ'লে, বিষয়বস্তুর লীলা সম্পর্কে একটু অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সমাজে তিনটি কাল থাকে ; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। অতীতকালের সমাজ থেকে আমরা অভিজ্ঞতা জেনে নিই, বর্তমানে তার উপর নির্ভর ক'রে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, ভবিষ্যতে উত্তরসূরীদের এই সব আয়ত্ত ক'রে নিতে সাহায্য করি। সমাজের অভিজ্ঞতাকে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে চালু করাই ইস্কুল এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই অভিজ্ঞতারাশিই মানব সমাজের জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক, ইস্কুলের বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুই মানবের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে গিয়েই আমরা শিক্ষানীতিকে পরিবর্তন করি ; শিক্ষায় শিক্ষায় প্রভেদের সৃষ্টি করি। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দুটির দুরকমের আকর্ষণ আছে। সভ্যতা থেকে এক রকমের বিষয়বস্তু আসে, সংস্কৃতি থেকে অন্য রকমের। সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পরস্পর নিরপেক্ষও বটে, সাপেক্ষও বটে। সভ্যতা আর সংস্কৃতি থেকে যে বিষয়বস্তু আসে তাদের নিরপেক্ষ করেই আগে ব্যাখ্যা করা যাক।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সভ্যতা হচ্ছে মানবসমাজের কার্যাবলী এবং আবিক্রিয়ার দিক ; জাগতিক বিষয়বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার স্পৃহা থেকেই মানুষ কাজ করে, বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কার করে। আর সংস্কৃতি হচ্ছে, মানব সমাজের একান্তরূপে মনোজগতের দিক। সভ্যতার মধ্য দিয়ে সে কর্মশক্তির চর্চা করে, এটি হচ্ছে তার আধিপত্যের দিক—এখানে সে রাজা হ'তে চায়, এটি হচ্ছে তার ভূষণ, তার সম্পদ ; সভ্যতার মধ্যে আছে 'বুদ্ধি', মানুষের বুদ্ধি আছে ব'লেই সে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। আর সংস্কৃতিতে আছে তার আত্ম-প্রকাশ, ভাবের জগৎ। সংস্কৃতিতে মানুষ লড়াই করেনা, ধ্যান করে আর সৃষ্টি করে। সম্পদ থাকলেই তা ব্যবহার করতে হয়, অন্য মানুষকে সে খোঁজে যার সঙ্গে সে সম্পদের তুলনা করতে পারে, এখান থেকেই আসে তার দম্ভ। যে-সমাজ বারুদ আবিষ্কার করেছিল সে আবিষ্কারে-পশ্চাৎপদ জাতিকে পর্যুদস্ত করেছিল ; মিশরের মামলুক বংশ লোপ পেয়ে গেল, ভারতের লোদী বংশ বাবরের কাছে হার স্বীকার করল ; যন্ত্র যে আবিষ্কার করল সে পশ্চাৎপদ

জাতির অর্থ শোষণ করবার অধিকার আয়ত্ত করল; আণবিক বোমা যে আবিষ্কার করল সে অপর জাতিকে অমানুষ মনে করতে থাকল। আর, সংস্কৃতি আনে গৌরব এবং মহিমা। গৌরব অন্যকে আঘাত করে না, উন্নীত করে—গৌরবের বিনিময় করবার ব্যগ্রতা নেই, সহধর্মী জুটলে বিনিময় ঘটে যায়। আর্য ঋষিদের সংস্কৃতি ছিল, বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ছিল। সংস্কৃতিতে সম-মন তৈরী হয়, তাই সমাজ দানা বাঁধে। এই হচ্ছে নিরপেক্ষ দিক। সভ্যতা আর সংস্কৃতির এই নিরপেক্ষ দিক থেকে কি কি বিষয়বস্তু পাই দেখা যাক।

সভ্যতার দু'টো শাখা; (১) আবিক্রিয়ার ক্রিয়া-কৌশল, এবং (২) সমাজীয় কার্য-ব্যবস্থা। সমাজীয় কার্য-ব্যবস্থাকে আবার দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়; (১) অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালী, এবং (২) রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী। আবিক্রিয়ার ক্রিয়া-কৌশল দিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জ্ঞান আয়ত্ত করি, পার্থিব-নিয়মের উপর আধিপত্য বিস্তার করি। অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীতে আমরা সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিদের পারস্পরিক নিয়ম কি হওয়া উচিত, দেশের সম্পদ বণ্টনে আপাতত তাদের কিরকম সুখ-বিধান করতে পারি—এই সব নিয়ম স্থির করি; রাজনৈতিক কার্যপ্রণালীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যবহারের সাময়িক নিয়ম, অন্য সমাজের ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারের সাময়িক নিয়ম আয়ত্ত করে থাকি; উভয়েই কিন্তু 'আপাতত' বা 'সাময়িকতা'র উপর জোর দেয়। দেশ-বিদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করা থেকে দেশের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ভেজাল দেওয়া পর্যন্ত অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীর গতিবিধি; আবার, রাজনীতির অন্তর্গত ক'রে বিশ্বমানবিকতার অনুশীলন থেকে সুরু ক'রে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ বজায় রাখা পর্যন্ত ঐ রাজনৈতিক কার্যপ্রণালীর খেলা চলে। সমাজীয় কার্যপ্রণালীতে মানুষের মতবাদে অসামঞ্জস্য থাকে, কারণ ঐটি ক্ষণিক-উদ্দেশ্য দুষ্ট।

সংস্কৃতিতে আছে কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক, দর্শন, ধর্মমত প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটিতেই মানুষের ব্যক্তিমনের উন্নয়নের এমন আত্মস্থ চিন্তা আছে যে এগুলো সর্বকালের মানুষকেই সাধারণত স্পর্শ করে। মানব-জাতির

কল্যাণবোধ ছাড়া এগুলি সার্থক হয় না। দর্শনের দিক থেকে যদি বিশ্বমৈত্রী আসে তবে সেখানে অসামঞ্জস্য ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋষিগণ এই জন্যই সভ্যতার বিষয়বস্তুকে অবিদ্যা আর সংস্কৃতির বিষয়বস্তুকে বিদ্যা ব'লে অভিহিত ক'রেছিলেন। কিন্তু সমাজ একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে একান্ত ক'রে আশ্রয় করতে পারে না। কারণ, এরা পরস্পরের সাপেক্ষও বটে। তবে সেই ঐক্যের দিকটি আলোচনা করা আমাদের এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু একটা কথা বলার দরকার; কোন্ ধরণের শিক্ষার্থী কোন্ বিষয়টি শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত—সে বিষয়ে একটি সাধারণ কথা বলা যায় এই যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া প্রতিভাশালী বক্তিই করে বটে, কিন্তু তার উন্নতি ঘটাতে সাধারণ কারিগরই সক্ষম। বিদ্যুৎ আবিষ্কার করতে ফ্যারাডের মতো মনীষীর প্রয়োজন, কিন্তু সেই বিদ্যুৎকে নানাভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম সাধারণ স্তরের পদার্থবিজ্ঞানী। সাধারণ মিস্ত্রিও অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেছে। আর সেইজন্যই সভ্যতার বৃদ্ধি প্রায়শই ঘটে থাকে; সভ্যতায় অগ্রগতি-অবনতির পরিমাপ করাও সহজ। কিন্তু সংস্কৃতির ধারক হ'তে হ'লে প্রতিভাশালীর সহমর্মী হ'তে হবে; কালিদাস বা সেক্সপীয়র-কে বুঝতে হলে তাঁদের সমানস্তরে মনকে তুলে আনতে হবে, সহৃদয় হৃদয়েই সংস্কৃতির সংবাদ সরবরাহ করা যায়। সেইজন্য সংস্কৃতি বহুকাল ব্যেপে থাকলে সমগ্র মানবসমাজ সেই প্রতিভার চিন্তাস্তরে উঠে আসে; পরে যখন অক্ষম হয় তখনও শ্রদ্ধা বজায় রেখে রক্ষণশীল হ'য়ে পড়ে। আর যখন সে শুধুমাত্র অনুকরণকারী রক্ষণশীল হ'য়ে উঠল তখনই সমাজের গতির বিরোধী এই সংস্কৃতি অনুষ্ঠান; মানুষ তখন অন্ধ-অভ্যাসের মোহে ঘুরপাক খেতে থাকে। মনকে উন্নীত না করলে, সমমনা না হ'লে সংস্কৃতির মর্মটি বজায় রাখা যায় না। শিক্ষাবিজ্ঞানে সংস্কৃতিকে তাই মানব-মন শাস্ত্র বা মননবিদ্যা বলা হয় (humanities)। এই বিষয়টি যখন শিক্ষাব্যাপারে একমাত্র শিক্ষণীয় ছিল তখন প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকে কুক্ষিগত ক'রে রাখতে বাধ্য হয়েছিল; শিক্ষার্থীকে তারা নির্বাচন ক'রে নিত। শিক্ষার্থী মনন-শাস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত হবে কি না তা বিচার ক'রে নিত। সব

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই প্রাচীনকালে এই প্রথা ছিল। আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা এই রকম ভাবে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছিল। শিক্ষার্থী সংস্কৃতির ধারক হবে, স্রষ্টা হবে, সেই আশাতেই গুরু তার হাতে পরাজয় বরণ করতে চাইতেন। অথচ, সভ্যতার বিষয়বস্তু-শিক্ষায় এমন নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষাকে যতই সর্বসাধারণের ক্ষমতার মধ্যে আনতে চেষ্টা হ'ল ততই শিক্ষা কার্যক্রমে কারিগরি শিক্ষার দিকে জোর পড়তে থাকে। গণতন্ত্রের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক আর কারিগরি শিক্ষা প্রাধান্য পাবেই। মানুষে চাইবেও এই শিক্ষা, শিক্ষাপ্রদান সহজও হবে। সংস্কৃতির বিষয়বস্তু যদি গণতন্ত্রের আওতায় আনতে হয় তবে সমাজকে অনেক বেশি উন্নত করতে হবে, অনেক কাল ধ'রে চেষ্টা করতে হবে এবং তা ঢালাও ভাবে ইস্কুলের শ্রেণীকক্ষে অল্প খরচায় নিষ্পন্ন হ'তে পারবে না। এইজন্য শিক্ষার লক্ষ্য বারবার ভ্রষ্ট হয়, বারবার মানুষের মন নেমে যায়, শিক্ষাদর্শনবেত্তারা বারবার শিক্ষাসংস্কার করতে কৃতসংকল্প হন। 'সুখ অতি সহজ সরল' সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি একটি বৃত্তের উপর ঘুরছে তার পক্ষে ঐ সরল পথ ধরা নিতান্ত কঠিন। এই জন্যই আমি শিক্ষার বিষয়বস্তুর এই চরিত্রকে 'লীলা' বলেছি। এই লীলার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, এর সম্বন্ধে ভাবা যায়, এর বিচিত্র গতি দেখে মুগ্ধও হওয়া যায়, কিন্তু এর সমস্যার সমাধান করা যায় না। অন্তত আজ পর্যন্ত তো কেউ পারে নি।

কিন্তু সমস্যার সমাধান করা যায়নি বটে, তবে মানুষে যুগে যুগে বুঝেছে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে আঁকড়িয়ে থাকলে সমাজের পরিতৃপ্তি হয় না। এইজন্য সমাজতাত্ত্বিক 'কোল'-সাহেব শিক্ষার পাঠক্রম নিরূপণ করতে গিয়ে ব'লেছেন, দু'টো ধারার বিষয়বস্তুই যে-কোন শিক্ষার্থীকে আবশ্যিক ভাবে শিখতে হবে, সভ্যতার বিষয় ও সংস্কৃতির বিষয়ও। অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ারকে ইঞ্জিনবিজ্ঞানও পড়তে হবে, সাহিত্যও পড়তে হবে; সাহিত্যশিক্ষার্থীকে দু'টো বিভাগের বিষয়ই পড়তে হবে—সাহিত্য এবং বিজ্ঞান; তবেই আমরা উত্তম নাগরিক পাব। এইজন্যই আলডুস হাকসলী বলেছেন—বয়স্ক সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন না ক'রে শিশুদের ইস্কুলে বসিয়ে আদর্শ নাগরিকত্বে

হাতে-খড়ি দিতে যাওয়া বৃথা; সেইজন্যই তিনি বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিরাসক্ত ব্যক্তিমনের সৃষ্টি করা। বোধহয় এই জন্যই জোয়াড্ সাহেব বলেন, মানুষের জীবন-নীতি ভুলপথে যাচ্ছে বলেই সে শিক্ষাকেই সুখ ব'লে মনে করছে, বস্তুত শিক্ষা যে সুখলাভের উপায় সেই কথাটি বুঝতে হবে। কিন্তু এতো গেল বর্তমান শিক্ষাবিদদের কথা। এঁরা মানবসমাজের মনের ধারা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন, তাই এই সত্যে পৌঁছতে পেরেছেন; আমরা পর্যালোচনা করিনি, তাই তাঁদের কথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়।

আমরা মানবসমাজে ইস্কুলের এই দিকগুলোই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একবার আলোচনা ক'রে নিই। ইস্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর কেমন দ্বন্দ্ব চলেছে, সমাজের কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে শিক্ষার পাঠক্রমে কি পরিবর্তন করেছে—সেই সব এবার আলোচনা করব।

মোটামুটিভাবে, আদিম মানবসমাজে, মিশরে, হিব্রুদের মধ্যে, গ্রীসে, রোমে, খৃষ্টধর্মের আওতায়, এবং অন্যান্য দেশে ইস্কুল কেমনভাবে গ'ড়ে উঠেছে সেইগুলো আলোচনা করলেই, ইস্কুলের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

॥ আদিম মানব-সমাজে ॥

আদিম মানবসমাজে আচার ব্যবস্থা এবং মানসিক অবস্থা বেশ সরল ছিল; তাছাড়া তাদের আবিষ্ক্রিয়াও এত বহুল পরিমাণে ছিল না, সেই স্বল্প কর্ম-উপকরণের উপরই নির্ভর করত তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার গঠন। নতুন আবিষ্কার যেহেতু কম ছিল, সেইজন্য কর্মসংস্থানের সাধারণ উপকরণটুকু তাদের সমাজজীবনে বহুদিন একই অবস্থায় থাকত; আর তাই সেই আবিষ্ক্রিয়া আয়ত্ত করতে তারা বহুদিন সময় পেত। বহুদিন ধ'রে একই রীতি-নীতি যখন তারা মান্য করত, তখন তাদের সমাজ-চরিত্রে ঐ উপকরণগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করত এবং তাই তাদের সভ্যতা আর সংস্কৃতি সমাজচিন্তাধারায় একটা

ঐক্যের সৃষ্টি ক'রে বসেছিল। এইজন্যই দেখা যায়, এই আদিম মানবসমাজ সভ্যতায় আর সংস্কৃতিতে একটু রক্ষণশীল। নতুন সমাজ-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্বভাবতই কম ছিল। নিজদের সমাজে বিদেশী সমাজের প্রভাব বিশেষ আসতে পারত না। এই সঙ্কীর্ণ সমাজক্ষেত্রে সমাজের সবকিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার এক প্রবণতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। তাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি অনুশীলন করবার বিশেষ অবসর ছিল। তা ছাড়া সমাজব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে তেমন জটিলতা আসে নি; কাজেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হ'ত কৌম-প্রথায়, কিন্তু রাজনৈতিক প্রথায় নয়। শ্রমবণ্টন প্রথা বা কোন একটা বিশেষ বৃত্তিকে বিশেষ ক'রে আয়ত্ত করবার স্পৃহা তেমন ছিল না। আমাদের বর্তমান সমাজে যেমন একখানা মোটর তৈরী করতে ভিন্ন ভিন্ন লোক মোটরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করে, আদিম মানবসমাজে তেমন কিছু ছিল না। কৌমপ্রথায় পরিবারগোষ্ঠীর প্রাধান্য বিশেষ ভাবে বর্তমান! তাদের উপকরণ ছিল যেমন অপ্রচুর, চিন্তাও ছিল তেমনি সঙ্কীর্ণ। কাজের সম্যক্ আলোচনার স্থান নেই। পরিবারগোষ্ঠীই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার বিধাতা। পরিবার এবং পিতামাতাই শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করত। পরিবারগোষ্ঠী আবার তার সমাজগোষ্ঠীর মূলনীতিকে মান্য ক'রে চলত। তাদের শিশুটি যাতে সমাজের ধারা থেকে বিচ্যুত না হয় সেদিকে ছিল তাদের সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু তাদের মধ্যে লেখা বা পড়ার স্থান ছিল না, তখনও বোধহয় ঐ দুটি প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নি। ভাষা ছিল, কিন্তু ভাষার যাদুটিকে তারা আয়ত্ত করতে পারে নি। কাজেই সমাজের অনুশাসন মেনে চলা, সমাজের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করা—এইই ছিল শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্য। আর বৃত্তি হিসাবে তারা গ্রহণ করত তাদের পিতামাতার বৃত্তিটিকে। কারণ শিক্ষায় ঐটিই ছিল সহজ। ছোটবেলা থেকে বয়স্কদের সঙ্গে মিশে, বাপ-মায়ের কাজকর্ম দেখে তারা বৃত্তিটির সমস্ত ক্রিয়া কৌশল জেনে নিত। অর্থাৎ শিক্ষায় অনুকরণের দিকই ছিল প্রবল। বয়স্কদের কর্মপদ্ধতি অনুকরণ ক'রেই তারা শিক্ষালাভ করত। 'কাজ করতে করতে শেখা' – এই মূলনীতিটিই ছিল তাদের শিক্ষায় সর্বস্ব। নিজের পরিবেশকে তারা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করত,

মাতাপিতা এ বিষয়ে সহায়তাও করতেন ; আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তাও শিখে নিত, কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজের মানসিক শান্তি যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে আত্মচিন্তা ছিল ; এই থেকেই বোধহয় ধর্মের উৎপত্তি। তাছাড়া মনোভাব প্রকাশের জন্য তারা নানা সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করত—যেমন, ধ্বনি-শব্দ-বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি, সৌন্দর্যবোধ এবং এই থেকেই আসত কাহিনী রচনা, সঙ্গীত, ভাষা, অঙ্কন-নৃত্য প্রভৃতি। এই যে সংস্কৃতির দিক এ কিন্তু সবই পরিবেশ, প্রকৃতি, আর কর্ম-উপকরণকে কেন্দ্র ক'রে, পর্যবেক্ষণ আর কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে গঠিত হ'ত। সেইজন্য আদিম মানবসমাজে অনুষ্ঠানের দিকটি বেশ বড়। অবসর সময় তাদের এই সৃষ্টিমূলক কাজে ব্যয় হ'ত - তারা আনন্দও পেত। পরবর্তীকালে যারা অবসর বিনোদনের জন্য শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, কি ক'রে মানুষে সৎ-ভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে অবসর সময় যাপন করবে তার জন্য পাঠক্রম রচনার যে নীতি দিয়ে গেছেন—সে দিকটি তাঁরা এঁদের কাছ থেকে ধার ক'রেছেন কিনা জানিনা। তবে সভ্যমানুষ অতীতের কাছে ঋণী হ'তে সঙ্কোচ বোধ করে—তাই তাঁদের যুক্তি হয় যে, 'না, তা ঠিক নয়, আসল কথা ওদের অবসর বিনোদনের ত্রুটি দেখেই সভ্যমানুষ ঐ নীতিবাক্যে ত্রুটি সংশোধনের একটা চেষ্টা করেছিল।'

সে যাই হোক্ একথা ঠিক আনুষ্ঠানিক ভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত না, অর্থাৎ কোন বিদ্যালয় ছিল না। পরিবার এবং বয়স্কসমাজই শিক্ষাগুরু। গুরু শিক্ষার্থী নিজেই, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষালাভ করত, অবশ্য বয়স্ক-রা তাকে চালিত করত এই মাত্র। বয়স্করা শিক্ষার্থী বা শিশুকে স্বাধীনভাবে যোগদান করতেই সুযোগ দিত, সেখানে কোন 'ঢাক্-ঢাক্' 'গুর্‌গুর্' ছিল না। বয়স্করা শিশুদের গল্প বলত, বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করত,—সবই মৌখিক। কিন্তু যেখানে সমস্যা ছিল, সেখানে হাতে-নাতে কাজ করিয়ে, শিল্প-যন্ত্রের কারিগরি বুঝিয়েও শিক্ষা দিত। অবশ্য শিশু যদি কাজে আনন্দ না পেত তবে এ শিক্ষা সফল হ'ত না। কিন্তু মানবশিশুর মনেরই এই বৈচিত্র্য যে কাজ করতে সে আনন্দ পায়-ই, দায়িত্ব নিতে সে বিশেষ আগ্রহশীল।

ছ' সাত বছর বয়স পর্যন্ত তারা বাড়ীতে মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। এখান থেকেই তাদের সমাজ শিক্ষার হাতে খড়ি; তারপর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সাহচর্যে তারা আসবার সুযোগ পেল, তাদের ব্যবহার অনুকরণ করবার দিকে তাদের মন ধেয়ে চলে। শিশুর প্রতি এই সমাজের মাতাপিতা এবং স্বজন-পরিজন অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন; সেজন্য শিশুরা যে স্বার্থপরায়ণ না হ'য়ে উঠত তা কিন্তু নয়; তবু একথা বলা যায়, তারা কোন সময় বেয়াড়া বা সমাজ-বিরোধী হ'য়ে উঠত না। তাদের এই শিক্ষা-কাল নানারকম খেলা-ধূলার মধ্য দিয়েও অনুষ্ঠিত হ'ত। আর সে কতরকম খেলা, শিকার করা পর্যন্ত। সামাজিক অনুষ্ঠানও ছিল তাদের বিশেষ আকর্ষণের। তারপরই তারা যোগদান করত সমাজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু এবং শিল্প রচনায়।

বছর দশেক বয়স পর্যন্ত তারা পিতামাতার তত্ত্বাবধানেই থাকত বলা যায়। এই সময়ে ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই মেশে, কোন বাধা নেই, সংসারের কাজকর্মে তারা যোগ দিত পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী। কিন্তু এর পরই সুরু হয় বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময় থেকে ছেলে আর মেয়ে পৃথক হ'য়ে পড়ে। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজে আর ছেলেরা বাইরের কাজে যোগ দিচ্ছে।

যৌবন-প্রারম্ভে তাদের একটা পরীক্ষা দিতে হ'ত। এই পরীক্ষা উৎসবও বটে। এই যৌবন-উৎসব নির্বাহিত হ'ত সমাজের সর্দার মোড়লের দ্বারা। এই পরীক্ষা আর উৎসবটিকেই বলা যায় আদিম মানব সমাজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্কুর। এই পরীক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। যুবককে সমাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে এখন থেকে। কাজেই বেশ যাচাই ক'রে নিত মোড়লেরা। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের বেলাতেই এই পরীক্ষা ব্যবস্থা—কিন্তু ছেলেদের বেশ কঠোর। সমাজের কাজকর্ম, সমাজের অনুষ্ঠান পর্ব, তার নীতি ও ধর্ম কতদূর আয়ত্ত করতে পেরেছে—সেই পরীক্ষাই দিতে হবে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, অভিষেক পর্ব, বালু দিয়ে গা ঘষে দেওয়া, ত্বক্ ছেদন করা, শারীরিক শক্তিমূলক পরীক্ষা, অধ্যবসায়ের পরীক্ষা, সমাজের কথা-কাহিনী আয়ত্তি, নর-নারীর সম্বন্ধ-নির্ণয়, আতিথেয়তা, সর্দারের মন্ত্র গ্রহণ করা অর্থাৎ

তার রক্ত পরীক্ষার্থীর দেহে সঞ্চার করা, কিংবা নিঃশ্বাস তার কানে বা নাকে ঢুকিয়ে দেওয়া, বন্ধুকে আশ্রয়দান এবং শত্রুকে নিধন করবার কৌশল দেখানো —প্রভৃতি অনেক কিছু। কানের মধ্যে গুরুর নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু অগ্রসর সমাজে এখনও দেখা যায়, তবে সেটা নিঃশ্বাসমাত্র নয় একটা বীজমন্ত্র বা শব্দ ফিসফিস ক'রে বলা হয়।

এই অনুষ্ঠানে নাট্যোৎসব নৃত্যোৎসবও ছিল। তবে সময় সময় দৈহিক-চর্চার সময় এই পরীক্ষার নিষ্ঠুরতার আর অবধি ছিল না। পরীক্ষার্থীকে অনেক সময় মৃত্যুও বরণ করতে হ'ত। যারা ব্যর্থকাম হ'ল এই পরীক্ষায়, তারা সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হ'তে পারল না।

এই উৎসবকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয় কারণ, এই শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য আছে ; উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল নাগরিক ক'রে তোলা ; তাছাড়া এই উৎসব নির্বাহের একটা বাঁধাধরা রীতি সমাজে আবহমান কাল ধ'রে থাকত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এই দুটি দিক থাকবেই। ইস্কুলের শিক্ষাও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, তারও এই দুটি দিক আছে।

এ ছাড়া ছিল বৃত্তিগত শিক্ষা, শিল্প কারিগরী, ভিষকবিদ্যা প্রভৃতি। তবে এগুলির পিছনে তেমন বাঁধাধরা নীতি ছিল না। সমাজে ক'রে খাওয়ার শিক্ষা এগুলি।

কিন্তু পরীক্ষা তো দিত ; শিক্ষালাভ করত কিভাবে—সেকথাও তো জানবার। শিক্ষালাভ করত বয়স্কদের কার্যপ্রণালী দেখে, সমাজ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে, ধর্মসভায় যাতায়াত ক'রে। সময়ে সময়ে, প্রস্তুতিমূলক শিক্ষায়তনের (Preparatory School) মতো, বয়স্কদের একটা গোষ্ঠীও এই শিক্ষা প্রদান করত। সমাজে কতগুলি সঙ্ঘ ছিল, সমিতি ছিল, আবার গুপ্ত সমিতিও ছিল। গুপ্ত সমিতির নাম অনেকটা 'গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘে'র (Secret fraternities) মতো। এই গুপ্ত সমিতি সমাজবিরোধী নয়, ধর্মরক্ষা সমিতি। বয়স এবং নরনারীভেদে এর সভ্য হ'তে হ'ত। সমাজের সবাই সভ্য হ'তে পারত না। এখানে যুব উৎসবের বেতন দিতে হ'ত এবং সমিতির কার্যনীতির শপথ নিতে হ'ত।

এই সমিতিতে ধর্মনীতি এবং সমরনীতিই বিশেষ ক'রে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আবার কতগুলি সমিতি সমাজের সেবাকার্যেও ব্রতী থাকত। তবে এইসব সমিতির সভ্য হওয়া বড় ব্যয়বহুল। আজকালকার পাবলিক ইস্কুলে পড়ার মতোই। সমাজের নৃত্য নাট্য প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানও এখানে অনুষ্ঠিত হ'ত। যাই হোক এখানকার ছাত্র হ'তে পারলে যুব-উৎসব বা 'উপনয়নের' পরীক্ষায় সাফল্য সুনিশ্চিত। জানিনা এই সব সমিতি পরীক্ষা-পাশের কোন 'শর্ট-কাট' বা সহজ পন্থা বের করেছিল কিনা, কিংবা প্রশ্নপত্র 'বাহির করিয়া' দিত কিনা। খুব সম্ভব তা করেনি, কারণ আগেই বলেছি লেখাপড়া তখনও আসেনি, মগজে নকল-কাগজ নিয়ে পরীক্ষা-সভায় ঢুকবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। পরীক্ষায় বেশির ভাগ বিষয়ই ছিল কাজ-কর্ম, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কাজেই এই সব সমিতি সভ্যদের সেই সব কার্যে অনুশীলনই করাত।

ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করুন বা না করুন, এই সব সমিতির মধ্যেই আমরা ইস্কুলের অঙ্কুর দেখতে পাই। এই জন্য আদিম মানবগোষ্ঠীর এই সব গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘ এবং অন্যান্য সমিতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা হওয়া দরকার।

॥ মিশরে ॥

আদিম মানব সমাজে শিল্প আবিষ্ক্রিয়া মন্থর-গতিতে চলেছিল বটে, কিন্তু একেবারে অনড় নয়। সভ্যতার প্রকৃত চরিত্রে আসতে দেরী হ'য়েছে, কিন্তু পরিবর্তনের সুর চলছিলই। এমনি এক অবস্থার পরিণতিতে এলাম আমরা নীলনদের তীরে মিশরে। সমাজ এখানে বৃহত্তর হয়েছে, কৃষিকর্মে অনেকটা উন্নতি নিয়ে এসেছে, অনেক নতুন নতুন শিল্পযন্ত্র তৈরী হয়েছে। বিজ্ঞানের চর্চা কিছু কিছু হ'ল, ভিষকাচার্য রসায়ন নিয়ে ব্যস্ত, ভাস্করেরা বিরাট শিল্প মহিমায় আকৃষ্ট, শিল্প আর ভাস্কর্যকে পুরোহিত আর রাজা ধর্মে এবং রাজনীতিতে বেশ সাদরে গ্রহণ করল। আর প্রকৃতি এখানে 'পেপিরাসের' বন তৈরী ক'রে

দিয়েছেন, এই থেকেই কাগজ; তাছাড়া আছে বালুপাথর, অতএব লিখবার সমস্ত সরঞ্জাম পাওয়া গেল; ভাষাকে ধ'রে রাখবার জন্য বহুদিন থেকেই চেষ্টা চলছিল, সে সুযোগ এবার মিলল। লেখক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হ'ল। লেখার কাজ বেশ ভালো বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কত তাদের সম্মান আর কতইবা মাইনে-পত্তর। সমাজে আর সেই কৌমপ্রথা নেই, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মিলে একটা বেশ বড় সমাজ হয়ে উঠেছে। ধর্ম আর রাজনীতি পরিবারকে বেশ খানিকটা সরিয়ে দিল। এখানে ইস্কুলের কি অবস্থা হবে ? ধর্ম আর রাজনীতির আওতাতেই আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মের আশ্রয়ে সংস্কৃতির দিক বড় হ'ল, আর রাজার আশ্রয়ে বৃত্তির দিক। বৃত্তিকে গ্রহণ করবার মধ্য দিয়েই অর্থ-নৈতিক শক্তি কাজ করছে।

আদিম মানুষের শিক্ষায় সমাজবাসীর মনের একটা ঐক্য ছিল, সবাই সমাজের জন্য। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে ব্যক্তিতা (individuality) বেশ লক্ষ্য করা গেল। সমাজ থেকে ছাড়া ছাড়া হ'য়ে সমাজব্যক্তি নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী নিজের চরিত্র আর প্রবৃত্তিকে গ'ড়ে নিচ্ছে। অতএব, দরকার হচ্ছে তাদের সবাইকে সমাজমুখী ক'রে আনা। কাজেই ধর্মই এই সমাজে প্রধান হয়ে উঠল। শ্রমবণ্টনের মধ্য দিয়ে এই সমাজ-সেবীরা কাজ করে। এত বেশি শিল্প-যন্ত্র রয়েছে আর এতবড় সমাজের পরিধি, সমাজের কাজও এত বেড়ে গেছে যে একজনের পক্ষে সমস্ত কর্মকৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বৃত্তি অনুযায়ী সমাজ-শ্রমিক তৈরী হ'ল। এইজন্যই অনেকে ভুল ক'রে মনে করেছিলেন, সেখানে বুঝি বর্ণবৈষম্য ছিল। আসলে কিন্তু তা নয়। বর্ণবৈষম্য-মূলক সমাজে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতি স্থির হ'য়ে যায়, এখানে তা তো ছিল না। তা থাকতেও পারে না। সমাজ খুব পুরনো না হ'লে জাতি-বৈষম্য আসতে পারে না। কারণ জাতি-বৈষম্য হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত মর্যাদা (Ascribed Status)। সমাজতত্ত্ববিদেরা দু'রকমের ব্যক্তি মর্যাদার কথা বলেন, (১) সমাজ-স্বীকৃত মর্যাদা বা সমাজ-প্রাপ্ত মর্যাদা (Ascribed Status) এবং (২) আত্মলব্ধ মর্যাদা (Achieved Status)। কাজেই বেশ বোঝা যায়, একটা বৃত্তি এবং সেই বৃত্তিগ্রহণকারী ব্যক্তিদের গুণ বহুদিন ধ'রে পরীক্ষা না ক'রে নিয়ে সমাজ

জাতিবৈষম্যনীতিকে স্বীকার ক'রে উঠতে পারে না। লব্ধ মর্যাদার দিকেই প্রচীন-কালের সমাজ বিশেষ ঝোঁক দেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই লব্ধ মর্যাদার প্রলোভনেই মানুষ বৃত্তি থেকে বৃত্ত্যন্তরে ঘোরে, বিশেষ শিক্ষালাভ করতে চায়। মিশরে যখন দেখা গেল, লিপিকারেরা সমাজের কাছ থেকে বেশ ভালো সম্মান আর উপঢৌকন পায়, তখন সমাজব্যক্তি ঐটিকে আয়ত্ত করবার দিকেই ঝুঁকে পড়ল। এখান থেকেই কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু। বৃত্তিশিক্ষায় নির্বাচনী প্রথা থাকবার বড় কারণ, একপক্ষ একে কুক্ষিগত করতে চায়, অন্যপক্ষ একে আয়ত্ত করতে চায়। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যাপারে বাধানিষেধ এই কারণেই এসে পড়ে। একথা আজকের বেলাতেও বোধহয় সত্য; যখন দেখি বিদেশী-ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা, যে ভালো করে আয়ত্ত করেছে তাকেই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করি—তখন এই কথাই মনে হয়। বিলেত ঘুরে এলেই যে সে বড় পণ্ডিত তার কারণও বোধহয় এই। ক্ষমতার চেয়ে অর্থস্তূপের সম্ভাবনাকেই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি।

যাই হোক, মিশরীয় সভ্যতার কালকে আমরা সাধারণভাবে ভাগ ক'রে নিই। প্রাচীন রাজ্যকাল ৩০০০—২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ; মধ্যকালীন রাজ্যকাল, ২০০০—১৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ; এবং আধুনিক বা নব্য রাজ্যকাল ১৬০০—১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। প্রাচীনকালে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে পিতার তত্ত্বাবধানেই চলত; কিন্তু এই কালেরই শেষের দিকে 'ইস্কুল'-এর ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। মধ্যযুগে তেমন কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নব্যযুগে লেখাপড়ায় লিপিকারেরা এসে প্রধান হয়ে উঠলেন। প্রাথমিক দিকে, শিক্ষা বলতে মিশরীয়েরা 'কোন একটা বিষয়কর্মে হয়ে ওঠা'কে বোঝাতেন। এই বৃত্তিশিক্ষা তাঁরা আদিম সমাজ থেকেই হয়ত নিয়েছিলেন। কারণ আদিম সমাজের অনেক কিছুই তাঁদের চরিত্রে বর্তমান ছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইস্কুলগুলো সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। ইস্কুলে মিশরের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করত; কিন্তু সে কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্য। সাধারণ লোক আর ক্রীতদাসদের সেখানে কোন পাত্তা মিলত না। আর যে-সব গরীব ছেলের বা ক্রীতদাসের অপূর্ব মেধাশক্তি দেখা যেত, তাদের পক্ষে

ইস্কুলের শিক্ষালাভে বিশেষ কোন বাধা ছিল না। তবে সে-আর কতটুকু অংশের জন্য! এমনি ক'রে জাতিবৈষম্য-বিহীন সমাজে লব্ধ-মর্যাদার পথে বাধা আসত। আজও আসে ইউরোপ আমেরিকার বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-অঞ্চলে। অর্থনীতি আর সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের এ এক কৌশল।

ছেলেমেয়েদের বয়ঃক্রম-কে দুটো ভাগে ভাগ করা হ'ত। শৈশব অর্থাৎ জন্ম থেকে চার বছর বয়স র্যপন্ত; বাল্যকাল অর্থাৎ চার থেকে চৌদ্দ অথবা ষোল বৎসর বয়স। মিশরের শিশুরা চার বছর বয়স থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী ছিল। আমাদের হিন্দুসমাজেও চার বছর বয়স এক সময় হাতে-খড়ির সময় ব'লে ধরা হয়েছিল; মুসলমানদের মধ্যে বোধহয় চার বছর, চার মাস, চারদিন। বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক নীতি সমন্বিত বয়স বিভাগেও চার বছর বয়সটাকে বেশ মান্য করে। জানিনা বিজ্ঞানপন্থায় বয়স ভাগ করা হয়, না, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, না, অন্যকোন ব্যাপার বিবেচনা ক'রে। যাই হোক চার থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের হাতেই তাদের শিক্ষা নিষ্পন্ন হ'ত। ঐতিহাসিকেরা মিশরে 'ইস্কুল ছিল কিনা' এই নিয়ে নানা তর্কবিতর্ক তুলেও মেনে নিয়েছেন, মিশরে ইস্কুল ছিল।

নানাভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম প্রকারে, পিতাই সন্তানের ধর্ম, নীতি এবং ব্যবসায়গত বা শিল্প-গত শিক্ষার ভার নিতেন; দ্বিতীয় প্রকারে, ধনীর সন্তানদের অন্য কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে রেখে শিক্ষা দেওয়াতেন; এই গৃহস্থ সময়ে নিজেই শিক্ষকের ভূমিকা নিতেন, নয়ত কোন লিপিকারকে নিয়োগ করতেন; আমাদের দেশের গুরুগৃহের মতো অনেকটা; তৃতীয় পন্থায়, প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপন ক'রে লিপিকারেরা শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

এ সব ছাড়াও ছিল মন্দির সংলগ্ন শিক্ষালয়; এ সব শিক্ষালয় পুরোহিতেরাই চালাতেন। সামাজিক নীতি এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতেন তাঁরা। এ সব ইস্কুলের বেশ মর্যাদা ছিল। কিন্তু লিপি যখন রাজকার্যে ব্যবহৃত হ'তে থাকল, তখন রাজকর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাসাদ সংলগ্ন শিক্ষালয়ও স্থাপিত হ'ল। এই সব রাজপুত্র আর রাজকর্মচারীর পুত্রদের ইস্কুলকে বলা হ'ত শেপ্

(Shep)। এখানে শিক্ষক হ'তেন আবার একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শাসনের নানা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিভাগের কর্মপ্রণালী নির্বাহ করতে একরকম বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হ'ত। কাজেই বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য বিভাগীয় ইস্কুলও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যাই হোক, বৃত্তিশিক্ষা, লিপিশিক্ষা আর চরিত্রগঠন এই তিনটি দিককে লক্ষ্য রেখে মিশরীয় ইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা ব'য়ে চলল। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে—মৌলিক রচনার দিকে জোর দেওয়া মাত্র। তাছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থায় আর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষালয়ের মধ্যে, ভিষক-বিদ্যা, যাজন-বিদ্যা, সামরিক বিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, লিপি-বিদ্যা বিশেষ স্থান পেয়েছিল।

এমনি ক'রে মিশরবাসী শিক্ষাকে বেশ খানিকটা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, শিক্ষক নিয়োগ ক'রে নিষ্পন্ন করতে শিখেছিলেন। প্রতিষ্ঠানগত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনেকখানি এগিয়ে এল। তবু মিশরীয় সভ্যতার এমন ক'রে পতন ঘটল কেন? এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। কয়েকটা কারণের মধ্যে, একটা বড় কারণ এই যে, মিশরের পুরোহিতেরা এর জন্য অনেকখানি দায়ী; তারা শিক্ষাকে কুক্ষিগত ক'রে রেখেছিল, সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়তে পারে নি; তাছাড়া, এরা ছিল বড় গোঁড়া। প্রাচীন রীতিনীতিকে বড় বেশি আঁকড়িয়ে থাকত। সমাজের ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকা ভালো, এই ঐতিহ্যই সমাজকে প্রবল করে, কিন্তু সেই অনুষ্ঠান রীতিনীতি যখন অবাস্তব হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তার প্রাচীনত্ব শুধু জগদ্দল পাথরেরই মতো চেপে বসে। এখন এই সব রীতিনীতিকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে শিক্ষার স্বাধীন চিন্তার সুযোগ থাকা চাই। কিন্তু রাজা এবং পুরোহিতের কঠোর শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা উন্মেষের কোন সুযোগ তো ছিলই না, উপরন্তু অভ্যাস আর অনুকরণ, শিক্ষালয়ের এই দুই পদ্ধতির নিগড়ে বদ্ধ হয়ে তারা বন্ধ্যা হয়ে গেল। শিল্প-ভাস্কর্যে, বৃত্তিমূলক যন্ত্র-নির্মাণে, লিপি-অনুশীলনে তারা অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু উদ্ভাবনীশক্তি আর সংস্কৃতির বিষয়বস্তুকে তারা দূরে রেখে দিল। শিক্ষাপ্রসঙ্গে মিশরবাসীদের এই ত্রুটিই যে বিশেষ দায়ী ছিল সে কথা বলা বোধ

হয় বাহুল্য নয়। ইতিহাস থেকে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা পাই, কাজেই কারীগরী শিক্ষায় বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি যাতে খর্ব না হয়ে পড়ে, সেকথা এযুগেও আমাদের হামেশাই স্মরণ রাখা দরকার।

॥ য়িহুদীদের শিক্ষা ॥

মিশরে আমরা মন্দির-সংলগ্ন ইস্কুল দেখতে পেয়েছি। য়িহুদীদের মধ্যে এরই একটা সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দেখতে পাই। মিশরে এ ধরণের ইস্কুল স্থাপনায় সামাজিক মর্যাদাকে নিয়ন্ত্রিত করবার এক ইচ্ছা দেখা যায়, এখানে কিন্তু তা নয়। য়িহুদীদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনীতি হাতে তুলে নিয়েছে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তি তত লক্ষ্য হয় না, যত লক্ষ্য হয় ধর্ম-শক্তি। পরবর্তীকালের খৃষ্টানযুগের পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার আভাষ এখান থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত পিতার হাতেই সন্তানের শিক্ষার ভার কমবেশী অর্পণ করা হয়েছে।

য়িহুদীরা মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকেই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মিশরের শিক্ষাব্যবস্থাকে তারা সঙ্গে আনতে পারেনি। তার বদলে তারা এনেছে যেহোবা-কে। এই যেহোবা তাদের পরম পিতা। ইনি সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক লোকের সঙ্গে কথা বলেন পর্যন্ত। আর তাঁর সেই কথাই সামাজিক অনুশাসন। অতএব সামাজিক অনুশাসন শ্রবণ করা, পালন করা এবং তা বুঝতে শিক্ষাগ্রহণ করা, তাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

মোজেস্ কিন্তু একটা নতুন দিক দেখলেন। সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবের দরুণ য়িহুদীরা মিশরে ক্রীতদাস হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য তিনি প্রবল জাতীয়তার সৃষ্টি করতে চান। আর তাই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় সেই জাতি সংগঠনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে মোজেসই প্রথম শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে প্রয়াস পেলেন। তিনি বলেন, নর, নারী এবং শিশু প্রত্যেককেই ঈশ্বরের অনুশাসন পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেককেই পড়াশুনা করতে হবে, প্রত্যেকের

জন্য পড়াশুনার সুযোগও থাকবে। আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগেও শিক্ষার দুয়ার এমনি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হ'ল। তবে বৌদ্ধেরা আর একটু এগিয়ে গিয়েছিল, শিক্ষায় ধর্মের প্রাধান্যকে কমিয়ে দিয়েছিল। মোজেস সেরকম করেন নি।

য়িহুদী জাতি পরিবার প্রধান; পরিবারের চরিত্রটিই হিব্রু জাতীয়তায় স্থান পায়। সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তারা সবাই এক পরিবারের অন্তর্গত। এই পরিবার সুলভ মানসিকতা তাদের শিক্ষার মধ্যেও দেখা গেল। মোজেস তাই পিতাকেই দায়ী করলেন শিশুর শিক্ষার জন্য। পিতা শিশুকে নীতিজ্ঞান শেখাবে, বৃত্তি শেখাবে, এবং জাতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করতে শিক্ষা দেবে। পিতা হচ্ছেন জাতিগঠনের প্রথম উপকরণ। তাছাড়া এযুগে হিব্রু সন্তানেরা স্তম্ভলিপি পড়ে শিখত, ভোজন-উৎসবে যোগদান ক'রে, নাটক ক'রেও ঈশ্বরের অনুশাসনগুলি জ্ঞাত হ'তে চেষ্টা করত। এছাড়া পূজোপালিতে যোগ দিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে শিক্ষা তো নিতই। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হয় আরও পরে।

৭২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়েরা এই ইস্রাইলদের উত্তর রাজ্যখণ্ডে হানা দেয়, তাদের পরাভূত করে এবং অনেক লোককে তারা ধ'রে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গোরু বাছুর লুট করত, ওদের দেশে করত মানুষ। উভয়েই সম্পদ-প্রসবী। বাবীলনীয়েরা আবার ৫৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জুডাহ্-এর রাজ্য দখল করে। এখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও নির্বাসিত হ'ল। কিন্তু তারপর পারস্যের রাজা এদের জেরুজালেমে ফিরে আসতে সাহায্য করলেন। জুডাহ্-বাসীকে 'জ্যু' নামে অভিহিত করা হ'ত। আমাদের দেশের নামকরণ য়িহুদী। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে য়িহুদীরা কিন্তু নতুন শক্তি আহরণ করল। অন্যান্য দেশে তারা বেশ ভালো ইস্কুল ব্যবস্থা দেখে এসেছে। জাতির প্রয়োজনে এবার তারা ইস্কুল-খুলবার দিকে মন দিল। তাছাড়া এদের অনেকে লিপিকার হয়ে পড়েছে; এই বৃত্তিটা বেশ কাজের ব'লে মনে হ'ল; কতকটা আহার সংস্থানের জন্যও বটে, কতকটা জাতীয়চেতনার জন্যও বটে তারা ইস্কুলের-শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে।

বাবীলন থেকেই তারা সাইনাগগের (Synagogue) ধারণা পায়। এই সাইনাগগ্ কিন্তু পূজার স্থান হিসাবে প্রথম দিকে গণ্য হ'ত না, প্রথম দিকে এখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হ'ত। ছুটি-ছাটাতে অবসর সময়ে এখানে ইস্কুল বসত, পরে এটি উপাসনার কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এখানে ধর্মযাজকেরা, লিপিবিশারদেরা প্রথন প্রথম বিনা বেতনে বয়স্কদের ও যুবকদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। পরে, এই ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। এখানে আর-একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা গেল। ধর্মযাজক হিব্রুভাষায় প্রার্থনা করতেন, অনুশাসন পড়তেন। কিন্তু অধিবাসীরা হিব্রুভাষা তেমন আয়ত্ত করেনি, তাছাড়া এ আবার হচ্ছে প্রাচীন হিব্রু। কাজেই ঐ হিব্রুকে লিপিবিশারদেরা ভাষান্তর ক'রে দিতেন। অনুবাদের একটা লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে।

ইস্কুলে আসবার আগে অনেক শিশু বাপ-মার কাছ থেকে পড়তে শিখে আসত। তারপর ছ' বৎসর বয়স থেকে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক ইস্কুলে এসে পড়বার জন্ত ভর্তি হ'ল। প্রাথমিক ইস্কুলের নাম ছিল, 'বেথ্ সেফার' (Beth-Sepher)। এই ইস্কুল সাইনাগগের সংলগ্নও থাকত কিংবা কাছাকাছি অন্ত কোথাও বসত। পড়া, লেখা আর অঙ্ককসা ছিল প্রধান পাঠসূচীর মধ্যে।

তারপর সুরু হয় উচ্চতর শিক্ষা। এই উচ্চ শিক্ষার ইস্কুলগুলোকে তারা বলত বেথ্-হামিদ্রাস (Beth-hammidrash)। প্রাথমিক ইস্কুলে তারা ঈশ্বরের অনুশাসনের, সামাজিক রীতিনীতির প্রাথমিক দিকটি জানত; কিন্তু এখানে আরও গভীরভাবে জানবার সুযোগ পেল। য়িহুদীদের সমাজে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল; কারণ তারা বিশ্বাস করত, অশিক্ষিত লোক ধার্মিক বা নিষ্ঠাবান হতে পারে না। বোধহয় নানা সংগ্রাম ও জাতির বিপর্যয়ের মধ্যে তারা শিখেছিল, শিক্ষাই জাতিগঠনের সহায়ক। কারণ, জাতিগঠনের জন্য যে-মতবাদ প্রয়োজন হয়, তাকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে হলে তার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। এ ছাড়া আর একটি দিকও বোধহয় ছিল; কালক্রমে সমাজ বড় হচ্ছে; সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে সমাজ-নেতারা উপস্থিত হ'য়ে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেত না; সে

অবস্থায় লেখাপড়া জানলে পুস্তক এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে তারা অল্প আয়াসে জানতে পারবে।

কিন্তু শিক্ষা-দানের পদ্ধতি খুব একটা মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না। স্মৃতি-চর্চাই ছিল বড় কথা, আর ছিল অভ্যাস-গঠন। যে-বিষয়বস্তুকে অবলম্বন ক'রে তারা লেখা-পড়া শিখবে, সে বিষয়বস্তুর একটি শব্দও তাদের পক্ষে বদলানো নিষেধ। একেবারে যাকে বলে 'মাছি-মারা কেরাণীর' মতো শিক্ষার্থীর অবস্থা হ'ত। এমন কি এই শিক্ষার্থী যখন শিক্ষক হ'ত তখনও এই যথাযথ ভাষা ও বস্তু উদ্গীরণ করাই ছিল তার ভালো-শিক্ষকতার মানদণ্ড। সে তার শিক্ষকের কাছ থেকে যেমনভাবে শুনেছে, ঠিক তেমনভাবেই তার ছাত্রকে সে পড়াবে, মায় সেই শিক্ষকের বক্তব্য ভঙ্গিকে হুবহু অনুকরণ ক'রে। আমাদের দেশে হিন্দুযুগেও এই স্মৃতিচর্চার প্রাধান্য ছিল ; কিন্তু হিন্দুশিক্ষকেরা মনে রাখবার জন্য কবিতা বা ছন্দের মধ্যে নানারকম অনুষঙ্গ নির্মাণ করবার প্রয়াস পেতেন, ঘন নির্ণয় ইত্যাদির মধ্যে সে সবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের সেই প্রয়াসের অনেকটা পরবর্তীকালের স্মৃতি নিয়ে গবেষণাকারী এবিঙ্গহৌসের অনেক পদ্ধতির সঙ্গে বেশ মেলে। য়িহুদীদের মধ্যে সে সবের সন্ধান খুব পাওয়া যায় না। তবে য়িহুদী সমাজে স্মৃতিক্ষমতায় যে ব্যক্তিগত পার্থক্য ছিল, সে কথা স্বীকার করত। এই হিসাবে ছাত্রদের তারা চারটি ক্ষমতা স্তরে ভাগ করেছিল : (১) স্পঞ্জ-সদৃশ অর্থাৎ এরা সমস্ত কিছুই স্মৃতি সাহায্যে গ্রহণ করে ; (২) ফানেল সদৃশ অর্থাৎ এরা একদিক দিয়ে গ্রহণ করে আবার পরক্ষণেই সব কিছু ভুলে যায় ; (৩) ছাঁকনী-সদৃশ অর্থাৎ ভালো জিনিসকে বাদ দিয়ে খারাপটি ধ'রে রাখে ; (৪) কুলো সদৃশ—অর্থাৎ খারাপ-কে পরিবর্জন ক'রে ভালো-কে গ্রহণ করে।

এই শ্রেণীকরণের মধ্যে কিন্তু একটা লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ; মাছি-মারা কেরাণীর মতো হ'লেও, শিক্ষকের যেন এক আশা ছিল যে, শিক্ষার্থী নিজের মনের প্রক্ষোভ আর যুক্তি খাটিয়ে ভালো মন্দকে বাছাই করতে শিখবে। এই ক্ষমতা শিক্ষক প্রত্যাশা করত, প্রত্যাশা যখন ছিল তখন তার ব্যবস্থাও ছিল ব'লে অনুমান করা যায়। কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি আর রীতির মধ্যে

তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে হয়ত আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার আর একটি দিক য়িহুদী সমাজে খুব স্পষ্ট আর আবশ্যিক হিসাবে গৃহীত হ'ত। তা হচ্ছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই বৃত্তিশিক্ষা ছিল শিল্প-কেন্দ্রিক। আঠার বৎসর বয়সে য়িহুদী-সন্তানদের পক্ষে এই শিল্প-শিক্ষা ছিল আবশ্যিক। তাদের অনুশাসনে একথা খুব জোরের সঙ্গে বলত যে, 'তোমার সন্তানকে যেমন ধর্ম ও সমাজ অনুশাসন শেখানো অবশ্য কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য তাকে শিল্পকারিগরী শেখানো।' 'যে তার পুত্রকে এই শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা দেবে না, সে তার ছেলেকে দস্যু ক'রেই তুলতে চায়।'—ইত্যাদি উক্তি থেকে বোঝা যায়, তারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, আলস্য আর শিক্ষাবিলাসই পাপের সৃষ্টি করে; বুঝেছিল, ধনদৌলত চিরকাল থাকে না, কিন্তু সমাজ উপযোগী কোন কাজ যদি তারা শিখতে পারে তবে তাদের দারিদ্রের মধ্যে পড়তে হবে না কোনদিন। যীশুকে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শিখতে হয়েছিল বোধহয় এই জন্যই।

যাই হোক য়িহুদীরা নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক দিককে গড়ে তুলেছিল, আর তাদের এই শিক্ষাই তাদের একপ্রাণ একমত গড়তে সাহায্য করেছিল—সন্দেহ নেই। কতখানি তারা মিশরের কাছ থেকে নিয়েছিল, কতখানি বাবীলন, আসীরীয় বা অন্যান্য অগ্রসর জাতির কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল জানি না, তবে তাদের শিক্ষারীতিতে ধর্ম-প্রাধান্য ছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আর এই ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই তারা শিক্ষাকে সর্বসাধারণের জন্য জাতীয়করণ করে নিয়েছিল।

॥ গ্রীসে ॥

স্পার্টায়ঃ

মানব সমাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, কি দ্রুতগতিতে, তা হিসাব করা কঠিন। মানব-সমাজের উত্থান আছে, কি পতন আছে, তাও বলা সহজ নয়। 'লাভ আর ক্ষতি তরঙ্গের ওঠা-নামা একই খেলা, একই তার গতি।' কোন

এক বিশেষ জাতির পক্ষে যা উত্থান, সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে তাই-ই হয়ত ক্ষতিকর, অবশ্য সাময়িক ভাবে ; সেই ক্ষতিকে পূর্ণ ক'রে নিতে মানুষের যে-অবিরাম চেষ্টা চলে তার দরুণই সেই একটি মাত্র উন্নত সমাজ ভেঙ্গে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। আবার তার অভিজ্ঞতার মিথস্ক্রিয়ায় অন্য আর এক জাতি নিজকে গড়ে নিচ্ছে। এই-ই তো সমাজের লীলাবৈচিত্র্য।

গ্রীসের ইতিহাসে এই লীলাকে ধরবার জন্য ঐতিহাসিকেরা বহু চেষ্টা করেছেন। কারণ, গ্রীসে অনুসন্ধান কার্যের উপযোগী উপকরণ বহু মিলেছে ; অন্য অতীত সমাজে এত উপকরণ আধুনিক ঐতিহাসিকের হাতে পড়তে পায়নি। এই গ্রীসের শিক্ষা ইতিহাসও বিচিত্র। গ্রীসে প্রত্যেক যুগের শিক্ষা ধারাতেই স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে, তবু প্রত্যেক যুগই ভেঙে পড়ছে। ভেঙে পড়ল, কিন্তু অন্যান্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

শিক্ষা-ইতিহাসে গ্রীসের অন্তর্গত দুটো বড় অঞ্চলের বিশেষ নাম করা হয় ; একটি স্পার্টা, অন্যটি এথেন্স। অতি সঙ্কীর্ণ আর অত্যন্ত সহজ সরল ব'লে স্পার্টার শিক্ষা ইতিহাসই প্রথমে আলোচনা করা যাক।

খৃষ্টপূর্বাব্দ অষ্টম শতাব্দী থেকে ডোরিয়ান জাতি ইয়োরোটাস নদীর তীরে এসে আদি বাসিন্দাদের উপর কর্তৃত্ব সুরু করল। ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম আর ব্যারাক ধরণের ঘর-বাড়ী বাঁধল তারা। সংখ্যায় তারা আর বেশি নয়। কাজেই সামরিক শক্তির চর্চায় তারা এখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায়। একটা সমগ্র সমাজকে অধীন ও নির্ভরশীল ক'রে সামরিক শক্তির জবরদস্তিতে বসবাস করবার ফন্দি কি ভাবে আয়ত্ত করতে হয় গ্রীসে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল। এর অনেক দিন আগে থেকেই পশু-কে প্রবঞ্চনা ক'রে মানুষ সভ্য হ'তে শিখেছিল বটে, তারও অনেক পর মানুষকেই প্রবঞ্চনা ক'রে মানুষ মানুষের মতো বাস করতে শিখেছে, আর ইউরোপে এবার এল মনুষ্য সমাজকে প্রবঞ্চনা করে সভ্যতা বিস্তারের পালা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মানুষ দুটো প্রবঞ্চনা রীতিকে কাজে লাগিয়েছে : (১) অন্য সভ্যতাকে চুরি ক'রে নিজের সমাজকে উন্নত করবার রীতি ; (২) অপরের জীবন নীতিকে ভেঙে দিয়ে নিজের জীবন নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু 'চুরি' শব্দটা শুনতে যত খারাপ, সভ্যতা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রক্রিয়াটা তত খারাপ নয়। এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের অভিজ্ঞতা পরিশুদ্ধ হ'তে সুযোগ পায়। তবে অপরের জীবন-নীতি যেখানে ভেঙে দেওয়া হয়, সেখানে ঘৃণার ভাব প্রবল। আর এই ঘৃণা আসে, বোধহয়, সমাজের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি থেকে। সেইজন্যই সমাজে কোন প্রগতি আসতে পায় না, বরং কেমন যেন তির্যক গতিতে চলতে চায়। সমাজের প্রগতি বলতে সমাজের পঞ্চশক্তির কোন একটির অতিবৃদ্ধিকে বোঝায় না; তার সমস্ত অবয়বটিকে নিয়ে সে যদি এগিয়ে চলতে পারে তবে এল তার প্রগতি। শুধু সামরিক শক্তি যদি প্রধান হয়, আর অন্য শক্তি চারটি যদি পিছিয়ে থাকে তবে সমাজে কেমন যেন এক অস্থিরতার আলোড়ন পড়ে যায়। সে সমাজ পরিণামে ভেঙে পড়বেই। কারণ সমাজ-ব্যক্তির মনে এমন এক দ্বন্দ্ব এসে পড়ে যে, তার সঙ্ঘর্ষে সমাজের আত্মা মুষড়ে পড়ে, চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে পড়ে।' এমনি ক'রে অন্য চারটি শক্তির সম্পর্কেও বলা যায়।

স্পার্টা শিক্ষারীতিতে কিন্তু এই ভুলই ক'রে বসেছিল। ভুল করবার কারণ তার অর্থনৈতিক দুর্বলতা, আদিবাসীদের উপর এই দিক দিয়ে অতিরিক্ত নির্ভরতা। এই দুটিকে সামলে নেবার জন্য তারা সামরিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলল, নিজেরা আদিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। এই জন্যই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সামরিক শক্তির কর্তৃত্ব এল পূরো মাত্রায়।

সমাজের গতির বিরুদ্ধতা যে-শক্তিগুলো করে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সামরিক শক্তির অতিবৃদ্ধি। একজাতিত্ব গঠন করবার পক্ষে এইটি অতি সহজ আর অনিবার্য প্রক্রিয়া। আদিবাসীদের মধ্যে ছিল সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিতা বৃদ্ধির প্রবণতা, হয়ত সেইজন্যই তাদের অপস্মৃতি ঘটল; তাদের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই স্পার্টার নতুন অধিবাসীরা বুঝে নিল ঐ ব্যক্তিসর্বস্ব সমাজ-গোষ্ঠীকে ভুলে যেতে হবে, কঠোরভাবে এক-মন তৈরী ক'রে গোষ্ঠীকে বাঁচাতে হবে; তারা সাফল্যও অর্জন করল। কিন্তু একটি দিক এখনও তারা বুঝতে শেখেনি; সে হচ্ছে, সমাজকে মান্য ক'রেও ব্যক্তিতা অর্জন করা যায়; আর

এমন ব্যক্তিতাই সমাজের বাঁচবার এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ব্যক্তিতা অর্জন করতে হলে, মানুষকে অনুকরণ করানোর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে হয়, সমাজকে সংহত হ'তে হয়, যাতে সমাজ-ব্যক্তিকে শৈশব থেকেই হুকুমের আওতায় মানুষ না হ'তে হয়। প্রথার প্রতি আঠার মতো লেগে থাকলে, বা অন্ধপ্রথার দাস ব'নে গেলে সমাজব্যক্তির এই ব্যক্তিতা-বৃদ্ধি ঘটে না; এই ব্যক্তিতা যখন সৃষ্টি হয়, তখন সমাজ-ব্যক্তি কেবল সমাজের ব্যক্তি হয়েই সীমাবদ্ধ হয় না, তার মধ্যে তখন একটি 'মন'-এর আবির্ভাব ঘটে; এই ব্যক্তিমনই তখন সমাজ-শক্তির কেন্দ্র, সমাজ কর্মের বোধের আশ্রয়। এই ব্যক্তিমন দেখে সমাজের ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই, এই ব্যক্তিমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অযথা মৌলিক নয়, আত্ম-কেন্দ্রিকও নয়। এই ব্যক্তিমন সমাজ-অন্তরের আর ক্রিয়াকলাপের বুদ্ধির দিক, সে যেন সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী। এই ব্যক্তিমনই সমাজের চরিত্র। এই চরিত্রের যত বিকাশ ঘটবে, সমাজ তত 'এক' হবে; কিন্তু সামরিক শক্তি এই 'এক'-কে গঠন করতে পারে না, সে 'একাকার' করে, সে চেহারাকে ঠিক রাখে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজের সমগ্র ব্যক্তি-কে কি কখনও 'এক' করা যায়? সমগ্র ব্যক্তির ব্যক্তিমন গঠন কি করা যায়? একথা ঠিক যে, তেমন 'এক' কখনও হয় না। সমাজ-ঐক্য আর ব্যক্তিতা-অর্জন—সমাজের এই প্রক্রিয়াটির কখনও সমাপ্তি ঘটে না; প্রক্রিয়াটির কোন লক্ষ্য নেই, সে একটি প্রবাহের মতো লক্ষ্যের উপলব্ধি নিয়ে লক্ষ্যের সন্ধানে চলবে। তার জোর ক'রে সমাপ্তি ঘটানো নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতা কি স্পার্টার সভ্যতা-স্তরে প্রত্যাশা করা যায়? প্রত্যাশা করা অন্যায় নয় এই জন্য যে, ইতিপূর্বেই য়িহুদী-দের সমাজে এই ব্যক্তিমন সৃষ্টি ক'রে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখা গেছে; তারা বিফল হ'ল, কারণ চিন্তাধারার 'অনুকরণ'-এর দিকটিতে তারা বেশি জোর দিয়েছিল। আবার এথেন্সেও দেখা গেছে, এই ব্যক্তিমন সৃষ্টির দিকে তাদের আত্মনিয়োগ, কিন্তু তারা বিফল হ'ল অন্য একটি কারণে। তবে একথা সত্য, ব্যক্তিমনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ সে সভ্যতা-স্তরেও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না।

আর স্পার্টা পুরনো মানুষদের যেমন বাইরে রেখে দিল, তেমনি নিজদের তারা একবারে খাঁচায় পুরে বসল। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চলবেনা, বাইরের শিক্ষা দীক্ষায় মানুষ হওয়া চলবেনা। এই নতুন মানুষদের আমরা বলতে পারি স্বাধীন নাগরিক। স্বাধীন নাগরিক কোন ব্যবসায় করতে পারবেনা, বাণিজ্য করতে পারবেনা। পয়সা-ক'ড়ি জমানোও তারা পছন্দ করত না। তাদের কিছু জমিজমা ছিল আর সেগুলো আদিবাসীরা চাষ ক'রে দিত। কোন কাজই করতে হচ্ছে না যখন, তখন এই সমাজ চাইত তারা সমর-বিদ্যা শিখুক।

স্পার্টার শিশুরা পরিবারের নয়, রাষ্ট্রের। খুব কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে তাদের মানুষ করা হ'ত। তাদের ধারণা ছিল, পরিবার-তন্ত্রে মানুষ অর্থ জমাতে চায়, এবং তার ফলেই সমাজে অসাম্য আসে। স্বাধীন নাগরিকদের সমাজে অসাম্য থাকলে চলবেনা। তারা ঐক্যের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের পর্যুদস্ত করবে। সংস্কৃতি থেকে সভ্যতার দিক বড় হয়ে পড়ছে; সমাজে কাজ আছে, চিন্তা নেই যেন; আইন আছে, বিচারও হয়ত আছে, কিন্তু দর্শন নেই। বিবাহ ইত্যাদিতেও সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এমনি ক'রে তারা স্বাধীন নাগরিকদের শিশুর মনোগঠন করতে চায়, সাহসে দীক্ষা দিতে চায়, সমরবিদ্যায় পারদর্শী করতে চায়। পাভলভের সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত পরীক্ষা অনেক পরে হয়েছিল, কিন্তু স্পার্টার কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই তার শক্তি উপলব্ধি করেছিল।

কৃচ্ছ্রতাসাধনে চরিত্র হয়ত দৃঢ় হয়, কিন্তু চরিত্র মরেও যায়। চরিত্রের জীবন আছে, ইস্পাতের জীবন নেই। 'শেষ প্রশ্নে' শরৎচন্দ্র 'ব্রহ্মচর্য' শিক্ষা দেখে এই প্রশ্নও তুলেছিলেন। স্পার্টার শিশুদের চরিত্রও দৃঢ় হয়েছিল হয়ত, কিন্তু তার চলতাশক্তি থাকল না।

জন্মমুহূর্ত থেকেই স্পার্টার শিশুদের শিক্ষা সুরু হ'ত। স্পার্টার শিক্ষাকে বলা হয় এ্যাগোগ্ (agoge)। মদের মধ্যে সদ্যোজাত শিশুকে স্নান করিয়ে দেখা হ'ত শিশু ভবিষ্যতে সুস্থ নাগরিক হবে, না, দুর্বল হবে। দুর্বল শিশুরা ঐ বিচিত্র স্নানে গতাসু হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্পার্টার কর্তৃপক্ষ

চাইত-ও তাই। তারপর বসল বয়স্কদের সভা। এই শিশুকে কি বাঁচতে দেওয়া হবে? যদি তাঁরা মনে করতেন, না এ শিশুটি সুস্থ শিশু নয়, তবে তাকে মেরে ফেলা হ'ত। মেরে ফেলার মধ্যে নানা রকম প্রক্রিয়া ছিল, একেবারে তরবারি দিয়ে কেটে ফেলার মতো বা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়ার মতো নৃশংস আর বর্বর তারা ছিল না! পাহাড়ের কন্দরে তাদের ফেলে দিত। সৃষ্টির বিস্ময়কর বস্তু সেই পর্বতের সান্নিধ্যে এবং সুনীল আকাশের দিকে চোখ মেলে, আদিবাসীর গুহাবাসের কথা স্মরণ করতে করতে, তারা চোখ বুঁজত। যারা মারত তাদের হয়ত রসজ্ঞান ছিল, কিন্তু যারা মরত তাদের সৌন্দর্যজ্ঞান কতখানি ছিল ঠিক জানিনা, তবে সোফোকলস ঈডিপাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কিছু দেখতে পেয়েছেন কিনা, ভেবে দেখা দরকার।

এইভাবে এই শক্তিপ্রমত্ত জাতিটি শিশুদের জীবন-প্রাপ্তিতে বাছাই ক'রে নিল। কারণ শিক্ষা ছিল সমস্ত শিশুর পক্ষে আবশ্যিক। বর্তমান কালে বিশেষ বিশেষ ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য বাছাই করা হয়। যে নির্বাচিত হ'লনা সে অশিক্ষার মধ্যে মানুষ হ'য়ে অমানুষ হ'য়ে পড়ুক, শিক্ষা কর্তারা এই কথা বোধহয় অনুমোদন করেন। তাতেই সমাজ বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এবং বিভিন্ন চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। স্পার্টার শিশুদের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল না। তাদের চরিত্র এক, নীতি এক। স্পার্টার সমাজনীতি অনুমোদিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেই তারা অনুসরণ করত। এই যদি ঘটনা, তা হ'লে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষায়ও যে-খুব বৈচিত্র্য ছিলনা তা ধ'রে নেওয়া যায়।

প্রথমে মাতার তত্ত্বাবধানে তারা মানুষ হ'ত; অবশ্য এই মাতা রাষ্ট্রের নিয়োজিত নার্স বা ধাত্রী মাত্র। মায়ের সন্তান-স্নেহ কতখানি বজায় থাকত, তা গবেষণা সাপেক্ষ। রাষ্ট্রের জন্য শিশুকে তৈরী করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। ওঁরা দেখতেন, শিশু যেন না কাঁদে, না-রাগে, না ভয় পায়। মানুষের সহজাত তিনটি প্রক্ষোভকেই তাঁরা অবদমিত করতেন। 'ক্ষিধে পেলে সিধে হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক' আর, 'কষ্ট পেলেও পষ্ট কথা বলবে না', এইই ছিল তাদের প্রতি মায়ের নির্দেশ। তারপর পিতা শিশুকে 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করিয়ে বয়স্কদের আড্ডায় নিয়ে গেলেন; সেখানে শিশু মেঝেতে খেলুক,

বয়স্কদের জীবনযাত্রার 'অমানুষিক' সারল্য লক্ষ্য করুক, তাদের কথাবার্তা থেকে নিজে কথা বলা শিখুক।

শিশু সাত বছরে পড়ল। এইবার শিশুর ভার নিলেন পেইডোনোমাস (Paidonomus), ইনি একজন সরকারী কর্মচারী। ফি বছর এই পদে লোক নিযুক্ত হ'ত। এরা সাধারণত শাসকগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নির্বাচিত হ'ত। এরা শিশুদের শিক্ষাদান কার্যের তত্ত্বাবধান করত। এই পেইডোনোমাস বা শিশু-তত্ত্বাবধায়ক ছিল এই বিভাগের সর্বেসর্বা। তার নিচে আরও কয়েকজন অবর তত্ত্বাবধায়ক ছিল, তাদেরকে বলা হ'ত 'বিদিঅয়' (Bidioi); তার নিচে ছিল চাবুক-হাতে কর্মচারী। এরা শৃঙ্খলা বিধানের ভারপ্রাপ্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারী। কোন রকম বাইরের শিক্ষক বা শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারী ব্যক্তিকে শিক্ষার ব্যাপারে নিযুক্ত করা হ'ত না। এরা সবাই যেন লাইকার্গাসের কঠোর আইন মেনে চলত। সাত বছর বয়স থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থী তাদেরই তত্ত্বাবধানে থাকত বলা যেতে পারে। প্রত্যেক নাগরিক তার শিশুর আহার সরবরাহের জন্য দায়ী। রাষ্ট্রের এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম ছিল। এই নিয়মটুকুর মধ্য দিয়েই পিতামাতা সন্তানের সঙ্গে যা কিছু যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

শিশু-তত্ত্বাবধায়ক বালকদের এনে উঠালো রাষ্ট্রীয় বা সরকারী আবাসিক বিদ্যালয়ে। এখানে তারা সমবেত ভাবে চলতে ফিরতে শিখত, খেলাধূলোয় যোগদান করত। কতগুলি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থীদের ভাগ ক'রে দেওয়া হত। এই গোষ্ঠীকে বলা হ'ত 'ইলাই' (elai)। প্রত্যেকটি ইলাই-তে ষাটজন ক'রে শিক্ষার্থী থাকত। বিশ বৎসর বয়স্ক এক নেতার অধীনে তারা পরিচালিত হত। এই নেতার নাম ছিল এইরেন বা ইরেন (eiren)। এক সঙ্গে খাবে, এক সঙ্গে খেলবে, এক সঙ্গে ব্যায়াম করবে—এই ছিল তাদের শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়ম। পরিদর্শকেরা তাদের কার্যাবলী মাঝে-মাঝে পরিদর্শন করতেন। খেয়েদেয়ে মোটা হওয়া চলবে না, চর্বি জমল কি পিঠে বেত পড়ত। কারণ তাদের ধারণা, চর্বি জমা হওয়া অলসতার লক্ষণ। অর্থাৎ স্পার্টার শিশুরা কষ্ট করতে শিখে কষ্ট-সহিষ্ণু হবে; সামরিক নিয়মই ছিল

তাদের একমাত্র মন্ত্র। তের বৎসর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ম-কানুনের যদি বা কিছু শিথিলতা ছিল, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নিয়মের কঠোরতা আরও বেশি। হ্রস্ব পরিধেয় বস্ত্র আর নগ্ন পদে চলাফেরা করা তাদের পক্ষে আবশ্যিক নিয়ম। অপ্রচুর আহার, ছোট্ট ক'রে ছাঁটা চুল, এমনি ক'রে সমস্ত বিলাস এবং ভোগ থেকে তারা স'রে থেকে শিক্ষা-লাভের পথ সুগম করত।

এ পর্যন্ত আমাদের দেশের ব্রহ্মণ্য শিক্ষার সঙ্গে বেশ মেলে। কিন্তু তারপর যে-কথাটি আছে সে কথা শুনলে, ব্রহ্মচারীরা কাহিনীর নটে গাছটি মুড়িয়ে দিতে বসবেন। কথাটি হচ্ছে এই, স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতিতে 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা' নীতিটি খুব কার্যকরী ছিল। জানিনা, এ নীতি উদ্ভাবনের সার্থকতা কি। তবে এখানকার শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কেরা বিশ্বাস করতেন, চুরি করবার মধ্যে নানা-কৌশল আবিষ্কারের প্রেরণা থাকে, ভবিষ্যৎ সামরিক নাগরিকের পক্ষে এই কৌশল-উদ্ভাবনী শক্তি বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যই তাঁরা চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহ দিতেন। তবে চুরি ক'রে ধরা পড়লে তার শাস্তি হ'ত চরম। কারণ, ধরা পড়লে উদ্ভাবনী শক্তির অভাব বোঝাত।

অনেকে অবশ্য বলেন, তাদের ব্যবহারকে ঠিক 'চুরি' বলা যায় না। তাঁরা বলেন, আবাসিক বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষীয়েরা এই সব শিক্ষার্থীকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিত, যেমন শাকসব্জী যোগাড় করা, কাঠ কুড়োনো, বাসনপত্তর যোগাড় করা ইত্যাদি। যাদের উপর যে-কাজের ভার থাকত তাদের সে কাজ করতেই হ'ত। কাজেই সময়ে সময়ে তারা এই সব বস্তু নানা কৌশলে সংগ্রহ করত। কিন্তু এতো গেল ব্যাখ্যা। আসল কথাটা কি? এই সব আবাসিক বিদ্যালয়ের, ব্যারাক পদ্ধতির দোষই এই। সমাজের স্নেহের দিক থেকে তারা থাকত বঞ্চিত, কঠোর পরিশ্রম আর শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের মানুষ হ'তে হ'ত, এ অবস্থায় মানসিক দিক দিয়ে তারা যে বেশ চড়া-সুরের হয়ে পড়ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই এই সব ছোটখাটো সমাজ বিগর্হিত কাজের মধ্যে তারা জড়িয়ে পড়বেই। কেবল স্পার্টাতেই নয়, আধুনিক কালেও এই আবাসিক বিদ্যালয়ের ছেলেরা যত বেপরোয়া আর দুষ্কৃতিকারী হ'য়ে ওঠে তত সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেরা কিন্তু হয় না।

বারো বছর বয়স হ'লেই তাদের ছাত্র-নেতা তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিত আবাসিক বিদ্যালয়ের পশু-পাখী রক্ষণাবেক্ষণের খাদ্য সংগ্রহ ক'রে আনতে। সারাদিন তাদের এই কাজে চ'লে যেত। অবশ্য অনেকে বলেন, এইভাবে সংগ্রহ-অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা দেশ-গাঁয়ের পরিচয় যোগাড় করত, ভৌগোলিক সংস্থান জানবার সুযোগ পেত, বিপদে পড়লে আত্মরক্ষার উপায় বে'র করে নিত। এ এক ধরণের আহেরিয়া, শিকার উৎসব। তাদের সমাজনীতির পক্ষে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী ছিল। কিন্তু এতটা গুণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বোধহয় ব্যাখ্যা করণের মধ্য দিয়ে। বর্তমান কালের অনুষ্ঠান-গত কার্য তালিকার সঙ্গে অনেকখানি মেলে; কিংবা জার্মাণীতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে (Wander vogel) মেলে বলেই এমন ব্যাখ্যা করা হয়। তা ছাড়া অনুরাগবিহীন শিক্ষাপদ্ধতিতে যে শিক্ষার কাজ এগোয় না, এ কথা আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত। যেখানে কর্তব্যের হুমকি আর বেত্রের অনিবার্য যোগ, সেখানে এইভাবে পর্যবেক্ষণ শক্তি বা ভূগোল পড়ার চর্চা বৃদ্ধি পায়, একথা বলা শিক্ষা ব্রতীদের পক্ষে শোভন নয়।

বেত্রদণ্ডের কথা যদি উঠলই, তবে সে সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলে নেওয়া ভাল। আদিম সমাজে যেমন সমাজ-নায়ক বেছে নেওয়ার প্রথা ছিল, স্পার্টাতে সেই প্রথাটিই আরও স্থূল হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ওদের এক দেবী ছিলেন নাম আর্টেমিস ওর্থায়া (Artemis Orthis)। বছরে একবার এঁর সামনে বেত্রোৎসব হ'ত। অর্থাৎ কে কত বেত খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা। ফলে, অনেক প্রতিযোগী বেত খেতে খেতেই ওখানে মারা যেত, কিন্তু কাঁদত না। সবল শরীর আর মন গঠনের এই যদি হয় আদর্শ তবে সে দেশে ইস্কুলেও যে বেত্রপ্রথা সরকারী বেত্রপ্রহারক কর্তৃক উদ্‌যাপিত হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মাকারেনকোর 'রোড টু লাইফ' বইয়ে দেখেছিলাম, ছেলেদের সবল আর কষ্টসহিষ্ণু ক'রে তুলবার জন্য তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টা। আর সেই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলেছেন, 'কোন কান্না নয়' (No whining), বোধহয় এই পদ্ধতিই সত্যিকারের মনোবিজ্ঞান

সম্মত। প্রয়োজন অন্তরকে স্পর্শ ক'রে শৃঙ্খলাবিধান। অন্তরকেই এমনভাবে জাগ্রৎ করতে হবে যাতে তারা প্রবল মানসিক শক্তিতে দেহের কষ্ট ভুলে যাবে। আমাদের প্রাচীন ভারতের শিক্ষাতেও চরিত্রগঠনের কথা আছে। শিষ্যকে সারাদিন আলে-র পথ নিজের শরীর দিয়ে আটকে রাখতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও দেহকে সমস্ত কষ্ট সহ্য করবার মতো গড়ে তুলতে বলতেন। কিন্তু দেহকে বিনাশ করা এক কথা, আর দেহকে তৈরী করা অন্য কথা। অবশ্য স্পার্টার কথা অনেক আগের। শুধু পার্থক্য টুকু উপলব্ধি করবার জন্যই এই প্রসঙ্গ আনতে হ'ল।

যাই হোক, স্পার্টার ইস্কুলের শিক্ষার খুব একটা বৈচিত্র্য নেই। তারা ইতিহাসে একটি মাত্র জিনিস দিয়েছে, তা হচ্ছে আবাসিক বিদ্যালয় আর কঠোর নিয়মের শিক্ষা, পরকে পদানত ক'রে রাখবার মতো মানুষ তৈরীর শিক্ষা। এই আবাসিক বিদ্যালয় প্রথাই বোধহয় খৃষ্ট পর্বে চার্চের মধ্য দিয়ে, সেণ্ট অগাস্টিনের অনুমোদনে, বিলেতে এসে 'পাবলিক স্কুল' নাম নিল। একটা তীব্র জাতীয়তা-বোধ সৃষ্টির পক্ষে এ রকম শিক্ষা হয়ত উপকারী। কিন্তু জাতীয়তা বোধের এতখানি তীব্রতা প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কিনা, সে কথা ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া চরিত্রগঠনের কথা। চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে স্পার্টার শিক্ষা কি খুব কার্যকরী হতে পেরেছিল? শিক্ষা-ইতিহাস প্রণয়ণের পথিকৃৎ লরী সাহেবের কথা একটু অনুধাবন করা যাক; 'স্পার্টাবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ীতে ততক্ষণ পর্যন্ত লাইকার্গাসের নিয়ম মাফিক তারা চলে—বেশ গম্ভীর, কঠোর, সাহসী, সংযত, স্বার্থত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, গুরুজনে শ্রদ্ধাশীল, এবং রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। কিন্তু এই বিধানতন্ত্রের রাজ্য থেকে তাদের অন্য দেশে নিয়ে এস, তাদের ইতিহাসের প্রমাণপত্রে তখন দেখতে পাবে, তারা অসংযমী, চরিত্রহীন এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে সব অন্যায় এবং পাপ কার্য থেকে দূরে রাখবার জন্য তাদের জন্য এত অনুশাসন আর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সে সমস্ত পাপ কার্যই তারা করছে।'

এথেন্সে ও অন্যান্য দ্বীপে :

এথেন্সের ইস্কুল চালনার রীতি যদিও স্পার্টা থেকে পৃথক, তবু ত্রুটিবিহীন ছিল না। এথেন্স ছিল সংস্কৃতি-ঘেঁষা। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এখানে, পররাষ্ট্র দখল করবার মতো সমরশক্তির উপর জোর বেশি নেই। সংস্কৃতি সম্পর্কে এথেন্সের যে ধারণা তার একটু আলোচনা হওয়া দরকার। সংস্কৃতি বলতে আমরা মানুষের প্রকাশের দিককে বুঝিয়েছি। এথেন্সে এ সবেরই চর্চা ছিল; কবিতা ছিল, সঙ্গীত ছিল, মল্লভূমি ছিল, দর্শন ছিল অর্থাৎ শিব এবং সুন্দর দুটো দিকেরই অনুশীলন করা হ'ত। তবু 'সত্য' বাদ থেকে গেল। তাই লরী (Laurie) বলেছেন, "হে-সুধী, আমি বলবই যে তারা অসৎ বন্ধু।" 'এরা কেবল ফন্দী আঁটে, সম্ভোগপ্রিয়, বাচাল, অবিশ্বস্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের'। এথেন্সের অধিবাসীদের সম্পর্কে লরী'র কথার কেউ প্রতিবাদ করেন নি। এসব কথা যদি সত্য হয়, তবে তাদের সংস্কৃতিতে কোথায় দুর্বলতা ছিল তা খোঁজ করা দরকার। এরা সামরিক শক্তির উপর স্পার্টার মতো জোর দেয়নি, এথেন্স ধর্মের উপরও খুব জোর দেয়নি; লোকায়ত আচার অনুষ্ঠানকে তারা সর্বতোভাবে মান্য করেছে; পরিবারতন্ত্রের উপর আস্থাশীল, সৌন্দর্য-চর্চায় তারা উদগ্র, দেশকে তারা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেনি—তবে তাদের দুর্বলতা কোথায় ?

তাদের মধ্যে দুটো দিক দেখা যাচ্ছে: (১) বহুদেশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল, অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে তারা বিশেষ পরিচিত, এবং (২) তাদের দেশেও ক্রীতদাস-প্রথা এবং স্বাধীন নাগরিকদের অধিকার আর আদিবাসীদের শ্রমের উপর ভাগ বসানোর রেওয়াজ পূরো মাত্রায় ছিল। শেষের এই দিক দিয়ে স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

পদার্থবিজ্ঞানের আলোকরশ্মির তরঙ্গ-ধর্মিতা থেকে জানা যায় যে, দুটি উৎস থেকে দুটো আলোকরশ্মি যখন আসে তখন সব সময়েই যে স্থানটিকে আলোকিত করে তা কিন্তু নয়; এমন এক স্থান আছে, যেখানে আলোকরশ্মি দুটি স্থাপিত হ'লে অন্ধকারই জমা হবে। অর্থাৎ দুইটি আলোক তরঙ্গ যখন পরস্পরের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তখন অন্ধকারেরই সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির বেলাতেও এই

ধর্ম দেখা যায়। সভ্যতাকে বাদ দিয়ে বেশি সংস্কৃতি-নির্ভর হওয়াতেই এথেন্সে সংস্কৃতির অন্ধকার জমা হ'ল। বস্তুবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি যদি অগ্রসর হ'ত তবে এ দুর্বিপাক ঘটত না। চাষ-বাস, অর্থনীতি, আহার সংস্থান সব কিছু নির্ভর করছে অবহেলিত সমাজের উপর। সে দিক দিয়ে তারা এতটুকু নজর দিতে চায় না, আর সংস্কৃতির চর্চা করতে বসেছে এথেন্সের তথাকথিত স্বাধীন নাগরিক। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর পূর্বেকার এথেন্সে এই অবস্থাই ছিল।

সংস্কৃতির জীবন যেমন আছে, বৃদ্ধিও তেমনি আছে। সংস্কৃতি একস্থানে থাড়া থাকে না, আবার চক্রবৃদ্ধির হারে কেবল বেড়েই চলে না। সংস্কৃতির বৃদ্ধি ঘটে, বস্তুবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ায় এবং জাতির মানসিক ক্ষমতায়। বস্তু-র আবিষ্ক্রিয়ার সংখ্যা হয়ত ক্রমশ বাড়তেই থাকে, কিন্তু সমাজ-মানস গঠনমূলক আবিষ্ক্রিয়া কেবল যে বাড়বেই তা কিন্তু নয়। এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায়-ও হয়ত সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এই সংযোগ যে সব সময় আদৃত হবেই এমন কোন্ কথা আছে। সমাজ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি আবিষ্ক্রিয়া দু' রকমের আছে: (১) বস্তুজগৎ সম্পর্কীয়; যেমন ঘড়ি, মোটর ইত্যাদি, এবং (২) সমাজ-মানস গঠনমূলক নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি। এই দুই দিকের আবিষ্কার সংখ্যার উপর সংস্কৃতির বৃদ্ধি অনেক খানি নির্ভর করে। আবার আবিষ্কার এমনিতে হয় না, সমাজে তার চাহিদা থাকা চাই। চাহিদা অনুযায়ী আবিষ্করণের উপকরণ থাকা চাই; সমাজ-ব্যক্তির সেগুলি গ্রহণ করবার মতো মন থাকা চাই; তা ছাড়া, আবিষ্কৃত বস্তুটি সমাজের অন্যান্য দিকের ক্ষতিকর হবে না, সমাজের কর্তৃপক্ষদের স্বার্থে এই আবিষ্কৃত বস্তুটি বাধা জন্মাবে না; ইত্যাদি আবিষ্কৃত বস্তুর অনেক গুণের উপর নির্ভর করে এই আবিষ্ক্রিয়া। সবার উপর আছে, আবিষ্কার করবার মতো সহজাত বুদ্ধি থাকলেই চলবেনা, সেই ক্ষমতা অনুশীলনের সুযোগ সমাজে থাকা দরকার। এই সব জন্যেই সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সংস্কৃতির ধারক তৈরী করতে হলে জাতিকে সমমনা ক'রে তুলতে হবে।

এখন দেখা যাক খৃষ্টপূর্ব 'পঞ্চম' শতাব্দীর পূর্বেকার এথেন্সে সংস্কৃতির বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক কি কি ছিল। আমরা যে যুগটা নিয়েছি, তার পূর্বে হয়ত প্রাথমিক অবস্থায় এথেন্সে সংস্কৃতির বৃদ্ধি এবং গতি ছিল। তাই এই যুগে সেই সংস্কৃতি এমন আকর্ষণের হয়ে পড়েছে, অচল হয়েও পড়েছে। মানুষের অন্ধ অভ্যাসের মধ্যে পড়ে সংস্কৃতি অনুশীলিত হ'চ্ছে, কিন্তু মনের দুয়ারে পৌছাবে না। এথেন্সবাসী যে কত বড় মৃত সংস্কৃতিকে নিয়ে পড়ে আছে, সে কথা বুঝতে পারেনি। তাই এত সত্ত্বেও তাদের চরিত্রের এই অধঃপতন।

সভ্যতার অন্তর্গত যে-সব আবিষ্কার অর্থাৎ বস্তু-আবিষ্কার তা আসবে কৃষিকাজ, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং অন্যান্য দিক থেকে। কিন্তু তা পড়ে রইল অবহেলিত সমাজের লোকের হাতে। এদিক দিয়ে স্বাধীন নাগরিক মোটেই উৎসাহী নয়। ভদ্রলোকের পাঠক্রমে বৃত্তিশিক্ষা স্থান পেত না। কাজেই ইস্কুলের শিক্ষায়ও এই বৃত্তিশিক্ষণ স্থান পেল না। হাতের কাজই যদি করতে চাও, তবে ক্রীতদাস রেখে বাগানের কাজ কর। কৃষিকাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়া তবু চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য পরিশ্রমের কাজ? কদাচ নয়। যন্ত্র-শিল্প তো গেঁয়ো আর অশ্লীল। তা ছাড়া, এইসব যন্ত্রশিল্পের কাজে হাত-পা যে বিকৃত হ'য়ে যায়। যে দেশে হাত-পায়ের সৌন্দর্য-চর্চা, তাদের গতিভঙ্গি সুন্দর করবার প্রবণতা জাতির শিক্ষা এবং সুন্দরের উপাসনার মূলমন্ত্র, সে দেশে ভদ্রলোকের মধ্যে কারিগরী কাজ স্থানই পেতে পারে না। আরও একটা ধারণা ছিল যে, যন্ত্রশিল্পের কাজে মানুষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। পরবর্তী কালে সোক্রাতিস শ্রমের কাজকে খুব মর্যাদা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিষ্য প্লেতো এবং আরিস্ততল এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারেননি। হয়ত শ্রমশিল্পে এসব ত্রুটি আছে, এথেন্সের ধারণা খুব মিথ্যা নয়; কিন্তু সমাজের পক্ষে এগুলি পরিহার ক'রেও তো চলা সম্ভব নয়। ফলে এই হল, অশিক্ষিত লোকের হাতে দেশের এই সভ্যতা-সম্পদ বৃদ্ধি করবার দায়িত্ব থাকল; কাজেই সভ্যতার আবিষ্ক্রিয়ার অপূরণীয় ক্ষতি জমা হ'তে থাকে। তা'ছাড়া, যন্ত্রশিল্পের কাজে যদি দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-দর্শন, সঙ্কীর্ণই হয়ে পড়ে তবে যন্ত্রশিল্পকে বাদ দেওয়াও সঙ্কীর্ণতা। সমাজবিজ্ঞানী-'কোল্'

সাহেব এইজন্য পাঠক্রমের পরিবর্তন করবার কথা বলেছেন। বলেছেন, যন্ত্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে যেমন সাহিত্য-শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত, সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষেও তেমনি বিজ্ঞানের চর্চা আবশ্যিক হওয়া উচিত। এথেন্সে এ সম্ভাবনা ছিল-ও। কারণ, তারা সর্বতোমুখী শিক্ষাকে অনুমোদন করত, তবে কোন বিশেষ বিষয়ে একান্তরূপে মনোনিবেশ ক'রে পারদর্শী হওয়াকে তারা ঘৃণার চক্ষে দেখত। সবদিক দিয়ে সুসমঞ্জস শিক্ষাকেই তারা অনুমোদন করেছে। তবে এ ভুল তাদের হ'ল কেন? কারণ হচ্ছে অসাধুতা। সত্যকে তারা মর্যাদা দেয়নি। শ্রমজীবী থেকে নিজদের পৃথক ক'রে রাখা তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাদের শ্রমে এরা বড় হবে। শ্রমজীবীরা শিক্ষা পাবে প্রকৃতি বিচারে, ঘটনাক্রমিক শিক্ষাকে আয়ত্ত ক'রে, আর এরা শিক্ষা নেবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অবসর সময়কে উপভোগ করতে। এই নীতি বজায় রাখতে গিয়েই তাদের মধ্যে অসত্য এসেছে। অথচ মানুষের জীবনের পক্ষে শরীর চর্চা একান্ত আবশ্যিক। সে কথা তারা স্বীকার ক'রে পাঠক্রমে জিমন্যাস্টিক আর এ্যাথলেটিকের ব্যবস্থা করেছিল। শিক্ষা পাঠক্রমে এই দুটি দিক বড় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু কি ক'রে বিকৃত হয়ে প্রতিযোগিতা-মূলক, দ্বন্দ্বমূলক (atheletic) ক্রীড়ার স্থানই বেশী হয়ে গেল। এই দ্বন্দ্বমূলক ক্রীড়ার দোষ সম্পর্কে তারা ওয়াকিব ছিল ব'লেই এইসব স্থানেই বিশেষ পরিদর্শক থাকত, তাঁর নির্দেশেই খেলা পরিচালিত হ'ত। তবু ব্যায়াম শিক্ষাকে দ্বন্দ্বমূলক ক্রীড়া-শিক্ষা ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে নিল। প্লেতো এই দ্বন্দ্বমূলক ক্রীড়াকে ভীষণভাবে নিন্দা করেছেন, বলেছেন—এসব খেলা যেমনি পৈশাচিক তেমনি কুঁড়েমির। ইউরিপিডিস (Euripides, 480-406 B. C.) লিখেছেন, যতরকমের নষ্টামি গ্রীসকে পর্যুদস্ত করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এই দ্বন্দ্বক্রীড়া। তবে সামরিক শক্তি, সমজাতিত্বের উদ্দীপনার খোরাক যে দেশে বেশী, সে দেশে এমনি মানসিক অধঃপতন হবেই, তা কোন সময় যুদ্ধের মাধ্যমে আসে, কোন সময় ধর্মের মাধ্যমে আসে, কোন সময় বা খেলার মাধ্যমে আসে। মোটকথা, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি কল্যাণবোধ ছাড়া, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া, সংস্কৃতির উন্নতি হ'তে পারে না। আমরা সভ্যতা ও

সংস্কৃতির পূর্বে যে শ্রেণীভাগ ক'রেছিলাম, সেই অংশের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব, এথেন্সের এই সংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতি বিভাগ থেকে আসছেনা, আসছে সভ্যতার সমাজীয় ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে। তাই তারা, সমজাতিত্ব তৈরী করবার দিকে যত নজর দিয়েছে সম-মন (like-mindedness) তৈরী করবার দিকে তত যত্ন নেয় নি ; রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতিকে তারা যতটা নিয়ন্ত্রিত করেছে, দার্শনিকতার ভিত্তিতে ততটা করেনি।

কিন্তু ম্যারাথন বিজয়ের পূর্বে (আনুঃ ৪৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এ্যাটিকা তথা এথেন্সে মানবিক কল্যাণবোধ সৃষ্টির উপায়ও ছিলনা। এথেন্সে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ লেগেই ছিল। নরহত্যা যত্র তত্র। তারপর আছে মন্দিরের অধ্যক্ষার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একান্ত আস্থা। এই ভবিষ্যদ্বাণী রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির জীবনে যখন মোক্ষম তখন তাকে ঘুষ দিয়ে বিকৃত করবার প্রলোভনও কম ছিলনা। রাজা কোড্রুসের আমল থেকে (আঃ খৃষ্ট পূ ৮ম শতাব্দী) ম্যারাথন পর্যন্ত চলছে রাষ্ট্র-বিপর্যয়। স্বেচ্ছাতন্ত্রী (Tyrant)-দের সময় থেকে অভিজাত-তন্ত্র (Oligarchy), আবার অভিজাত-তন্ত্র (Oligarchy) থেকে প্রজাতন্ত্র (Republic) পর্যন্ত গোষ্ঠীভেদ আর শ্রেণী বৈষম্য তীব্রভাবে চলেছে। অভিজাত শ্রেণী (Eupatridae)-দের অত্যাচারে সাধারণ লোকের জীবন বিপর্যস্ত। খেয়ালখুসী মাফিক শাস্তি-প্রথায় নিম্নশ্রেণীরা ক্ষিপ্তপ্রায়। খৃঃ পূর্ব ৭ম শতাব্দীতে শাসন কার্যের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করবার জন্য যে ন' জন রাজ্যশাসক (archons) এবং উপদেষ্টা পরিষদ (Areopagus) তৈরী করা হ'ল, তাতেও এই দুর্নীতি দূর করা গেল না। কারণ, মূলে যে ত্রুটিটা রয়েছে। অধিবাসীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে রাখা হয়েছে—সমতলবাসী, তরাই অঞ্চল আর সমুদ্র-সৈকতবাসী। এই সমতলবাসীরাই অভিজাত শ্রেণী হিসাবে অভিহিত হ'ত। কারণ এরা ভূস্বামী। এই ভূস্বামীদের স্থান রাজ্যশাসনে বিশেষভাবে স্বীকৃত হ'য়েছিল ; এদের যা কিছু তাই-ই এথেন্সের সংস্কৃতি ব'লে ধরা হত ; সংস্কৃতির নামের সঙ্গেও এদের শ্রেণীর নামের যোগ আছে (Pedias)। এই জন্য ব্যবসাবাণিজ্য, পরিশ্রমের কাজ, কারিগরী কাজ আভিজাত্যে বা সংস্কৃতিতে স্থান পেল না। খৃষ্ট পূঃ ৬২১এ

ড্রাকো প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা লিখলেন, তাতেও যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি, সোলোন (খৃঃ পূঃ ৫৯৪)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও বদল হল না। সোলোন-তো আবার বিত্তের উপর বিশেষ জোর দিলেন, এবং সে বিত্ত আসা চাই ভূমি ব্যবস্থা থেকে। কাজেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আভ্যন্তরীণ বিরোধ যে থাকবেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এবং এই অবস্থায় সমাজনির্দিষ্ট মর্যাদাকে নষ্ট করবার আকাঙ্ক্ষা অনভিজাতদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। এখন এই আত্ম-লব্ধ মর্যাদাকে স্বীকার করানোর একমাত্র পথ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত করা; আর তা বিদ্রোহ ছাড়া সম্ভব নয়। এইজন্য মানুষে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় একরকম মানসিক রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ল। নতুবা ম্যারাথন যুদ্ধের গৌরব বহনকারী যোদ্ধা মিলটিয়াডিসের (Miltiades) উৎকট ইচ্ছা এবং চারিত্রিক অবনতি ঘটত না; থেমিস্টোক্লসের (Themistocles) স্বার্থ-পরিচালিত দেশ-প্রীতি এবং রাজনীতিকে অর্থ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করবার সম্ভাবনা থাকত না। আর, এই অভীপ্সা, বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তিই, ভিন্ন দেশ থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিজের দেশ আক্রমণ করবার সুযোগ দিচ্ছে। এথেন্স মূলত স্পার্টার মতো পররাজ্য গ্রাসের জন্য সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করেনি, কিন্তু আত্ম-রক্ষার জন্য এদিকে তাকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হ'ত। গ্রীস ভূখণ্ডের সর্বত্র সর্বক্ষণ এই সাজ সাজ রব থাকতই।

এরই মধ্যে ব্যায়াম খেলাধূলা আর দ্বন্দ্বক্রীড়া একটু স্বস্তি আর শান্তি বহন ক'রে আনল। আদিম অবস্থায় তাদের যে কুসংস্কার ছিল তাই-ই তাদের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ। দেবদেবীর সম্মুখে সৌন্দর্য আর শারীরিক কসরৎ দেখানোকে তারো মহৎ কাজ ব'লে মনে করত। হয়ত এই প্রথারও কারণ দৈহিক শক্তিচর্চা। কিন্তু অলিম্পিয়ার জিয়ুসের সামনে যে ক্রীড়া অনুষ্ঠান (৭৭৬ খৃঃ পূঃ) প্রচলিত হয় তার জন্য তারা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধবিরতির নিয়ম সৃষ্টি করে। এই সময়ে কোন রাষ্ট্রই যুদ্ধ করবেনা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। হানাহানির যুগে এই ব্রতের বিশেষ প্রয়োজনই ছিল। আর এই রীতিটিই, খেলাধূলার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রীসের সর্বত্র প্রচলিত হ'য়ে যায়। এইজন্যই বোধহয়, মনোবিদেরা মনে করেন, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম-প্রবণতার

উদ্গতি সাধন হয়। কিন্তু শান্তি-মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্য না থাকলে শুধুমাত্র ক্রীড়াব্যবস্থা উদ্গতি সাধন করতে পারে এমন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা জানা যায়নি। প্লেতো এবং অন্যান্য সমাজবিদ এই দ্বন্দ্বক্রীড়াকে নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু তাকে উৎখাত করতে পারেন নি, চাননি। তাঁরা দ্বন্দ্বক্রীড়াকে শিক্ষণের স্তরে এনে ব্যায়ামের মধ্যে পর্যবসিত করতে চান। তারও একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল ব'লে অনেকে অনুমান করেন। নতুবা প্লেতো তাঁর 'ল' (Law)-এর মধ্যে আবার এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন, দ্বন্দ্বক্রীড়ার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে, এবং সে লক্ষ্য হবে শিশুকে নির্ভীক ক'রে গঠন করা, এবং ভবিষ্যতের দক্ষ সৈনিক ক'রে গড়ে তোলা; যে দ্বন্দ্বক্রীড়ায় ভবিষ্যতের এই উদ্দেশ্য নেই—তাই-ই খারাপ; ইউরিপিডিস-ও এই জন্যই এই ক্রীড়ানুষ্ঠানকে নিন্দা ক'রেছিলেন। এত সত্ত্বেও দ্বন্দ্বক্রীড়াকে উঠিয়ে দেওয়া গেল না, কারণ জাতির মজ্জায় রয়েছে এই সংস্কৃতি, আর মর্যাদা উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে। এই সংগ্রামশক্তি নিযুক্ত হ'তে চাইছিল গ্রীসের অন্তর্বিরোধের মাধ্যমেই; এই দিকটি লক্ষ্য হয়ত করেছিলেন ইসোক্রাটিস। তাই তিনি রাজনীতির একটা নতুন ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তিনি চাইলেন, গ্রীসকে সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ ক'রে পররাষ্ট্র দখলের দিকে নজর দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু প্লেতো ইসোক্রটিসের এই কথা অনুমোদন করেন নি; তিনি সর্বজনীন কল্যাণবোধ আনবার দিকে তখন ঝুঁকেছেন, অর্থাৎ দার্শনিকতা। যাইহোক মোটামুটি এথেন্সের সমাজের (ম্যারাথন বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত) এইটুকু জানতে পারলেই তৎকালীন ইস্কুলের শিক্ষাকে আমরা বুঝতে পারব।

গ্রীক্ শব্দ 'স্কোলা' (Schola) থেকে স্কুল শব্দটি এসেছে। 'স্কোলা' শব্দটিতে তারা বুঝিয়েছে অবসর। এই অবসর সময়েই নানা বিদ্যা আয়ত্ত করবার প্রয়োজন হ'ত; তাদের সংস্কৃতি বিবর্ধনের জন্য অবসরেরই প্রয়োজন হ'ত। অবশ্য অবসর অর্থে 'অবসর বিনোদন' নয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'কোন কাজ থেকে অবসর পাওয়া মানে, এই সময়টা নিজের অভিলাষ মতো কাজে নিজকে নিযুক্ত করতে হবে; কারণ তোমার মনের এইটিই চাহিদা।

এর দ্বারা একথা বোঝায় না যে, তুমি এ সময় আজে-বাজে কাজে ব্যয় করবে, বরং কাজের আনন্দে কাজ করবে সেই কথাই বোঝাচ্ছে।' এখন, অবসর তো সবাইয়ের ছিল না, কাজেই ইস্কুলে যেত ভূস্বামীদের সন্তানেরাই। আর যেহেতু আনন্দ জনক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে সেইজন্য 'আনন্দ' কথাটি এথেন্সের শিক্ষায় প্রধান হ'য়ে উঠল। আনন্দের মধ্যে অবদমন নেই; ইস্কুলের বিদ্যা অর্জন নিজের রুচিমতো কাজের মধ্য দিয়ে হ'তে হ'লে শিশুদের স্বাভাবিক পথে, তাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে, এই শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হওয়া দরকার। এথেন্সের শিক্ষায় এই কয়টি দিকই মান্য করা হ'ত। আর তাই তাদের শিক্ষাকে 'মানবিকতা'র শিক্ষা বলা হয়েছে। শিশুর চিত্তবৃত্তিকে শ্রদ্ধা আর সমীহ ক'রে ইস্কুলের শিক্ষাকর্তব্য পালন করা হ'ত। স্পার্টার শিক্ষাকে বলা হ'ত এ্যাগোগ্ (Agoge), কিন্তু এথেন্সের শিক্ষাকে বলা হ'ত পেইডেইয়া (Paideia)। এ্যাগোগ কথায় বোঝাত শিশুকে শৃঙ্খলায় আনা, সেইভাবে তাকে চালিত করা; আর পেইডেইয়া কথার অর্থ শিশুদের ক্রীড়া, অর্থাৎ খেলায় যেমন স্বতঃস্ফূর্তি থাকে এই শিক্ষার ব্যাপারেও তেমনি স্বতঃস্ফূর্তি থাকবে। তবে তাদের স্বতঃস্ফূর্তিকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে তাদের চলনে-ব্যবহারে স্বরুচি আর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এইজন্যই প্রাচীন এথেন্সের ইস্কুলকে জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করবার ক্ষেত্র মনে করা হ'ত না, কিংবা প্রয়োজনের জন্য আহার-সংস্থানের কৌশল আয়ত্তির ক্ষেত্রও এসব ইস্কুল নয়। কোন রকম বাধ্যতামূলক কিছু শেখানো চলত না এখানে, শিক্ষকদের দেখতে হ'ত শিশুরা নিজদের ইচ্ছা এবং সহজাত বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করছে কিনা। কিন্তু এই সব শিশুকে সর্বদা সতর্ক প্রহরায় রাখা হ'ত; সংযম এবং কৃষ্টি থেকে যাতে তারা বিচ্যুত না হয় তা লক্ষ্য করা হ'ত। কে এই প্রহরা দিত? পেডাগগ্, শিশু পরিচালক। কে এই শিশু-পরিচালক? এখানে এথেন্সের আর এক বিস্ময়। বাড়ীর বুড়ো বলদ যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তখন কিষাণেরা কি ক'রে জানিনে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের গফুর মহেশকে নিয়ে বড়ই নাস্তানাবুদ হ'য়ে পড়েছিল; এথেন্সের লোক কিন্তু অকর্মণ্য ক্রীতদাসকে দিয়ে এই শিশু তত্ত্বাবধানের কাজটি চালাত। এক মনীষী তদানীন্তন কালে

পরিহাস ক'রে বলেছিলেন, 'যখন ক্রীতদাসটি গাছ থেকে পড়ে পা-টা ভেঙে ফেলল, তখন কি হ'ল? ঐ দেখ সে শিশুর শিক্ষার ভার পেয়েছে।' কি ক'রে যে এত বড় দায়িত্বজনক কাজ এথেন্সবাসী এদের হাতে ছেড়ে দিত তা ভেবে আশ্চর্য হ'তে হয়। কেমন যেন মনে হয়, তারা শিশুর শিক্ষাকে মোটেই বিশেষ দায়িত্বের ব্যাপার বলে মনে করত না। তারা বোধহয় বুঝত, শিশু একদিন বয়স্ক হবেই, সেদিন তারা আপনা থেকেই সব শিক্ষা আয়ত্ত করবে। এখন লালন পালনটা তো হোক। 'এখন' অর্থ ছ' বৎসর বয়স থেকে আঠারো বৎসর পর্যন্ত।

শিশু-পরিচালক ভোরে তাদের ঘুম থেকে তুলে দেবে, তারপর সঙ্গে করে ইস্কুলে নিয়ে যাবে। শিশুর খাতাপত্র বীণা ইত্যাদি সব কিছু এই পরিচালকই বহন ক'রে নিত। সময়ে সময়ে সে শিশুকে পড়িয়ে দিত, পুরনো-পড়া মনে করিয়ে দিত, উচ্চারণ শুধরে দিত, রীতি নীতি-সহবৎ সব কিছু শেখাত এই পরিচালক। অর্থাৎ শিশুদের শিক্ষা অগ্রসর হ'ত নানারকম অভ্যাস গঠনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে এই অভ্যাস-গঠন মূলক শিক্ষায় অনেকে আপত্তি করেছেন। ইসোক্রাটিস তার মধ্যে অন্যতম। তিনি এর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির অভাব বোধ করেছিলেন।

সোলোন শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সূর্য-উদয়ের পূর্বে ইস্কুল খোলা এবং সূর্যাস্তের আগে ইস্কুল বন্ধ করা চলবেনা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ইস্কুল সারাদিন ব্যাপীই চলত। অবশ্য এই সারাদিনের মধ্যে অনেকবার বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্য এবং ব্যায়াম শিক্ষা কালের মধ্যে নিশ্চয়ই ছেদ ছিল। তাছাড়া ছিল শিশুদের খেলাধূলার সময়। সঙ্গীত শিক্ষার সময়। ইস্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে, সাহিত্য-শিক্ষা, সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষা এবং ব্যায়াম শিক্ষা। এই তিনটিতেই শিশুরা যোগ দিত। এ ছাড়া তো নানা সামাজিক অনুষ্ঠান ছিলই। অভিনয়-আবৃত্তি আনুষ্ঠানিক নৃত্য সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তারা, বর্তমান কালে যাকে ব'লে পাঠক্রম বহির্ভূত আনুষঙ্গিক বা অনুষ্ঠান-গত শিক্ষা সেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। এইসব ইস্কুলে ঠিক শ্রেণীগত পড়ানো যাকে বলে তা বোধহয় হ'ত না, বেশির ভাগ ব্যক্তিগত পরিচালনামূলক শিক্ষাই

দেওয়া হ'ত। এই ব্যক্তিগত পরিচালনামূলক ব্যবস্থার দরুণ তাদের শিক্ষা-স্তরের শ্রেণীভেদও তেমন ছিল না, সেদিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না শিক্ষকদের সম্মানের কথা? সেকথা না বলাই ভালো। অল্প বেতনে তাঁদের সংসার নির্বাহ করতে হ'ত; কাজেই সমাজে তাঁদের সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখা হ'ত। ডেমোস্থিনিস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এ্যাসকিনিস্‌কে গালাগালি দিতে গিয়ে বলেছিলেন. 'ওহে তুমি মাস্টারী করেছ আর আমি পড়েছি।' সমাজের চক্ষে তারা ক্রীতদাসেরও অধম ছিল। শিক্ষকতা ক'রে গুরুর সম্মান প্রাচীনকালে একমাত্র বোধহয় প্রাচ্য দেশেই মিলেছে।

এইভাবে তারা অষ্টাদশ বর্ষে যখন পড়ল তখন বংশমর্যাদা অনুযায়ী তারা নাগরিক অধিকারে অভিষিক্ত হ'ল; যার যার কাজে, সৈন্যদলে, রাজ্যশাসনে তারা যোগদান করত। অনেকে বলেন, এই বয়সে সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য তাদের বিশেষ ইস্কুল ছিল (Ephebic Education); কিন্তু সে বোধ হয় প্রাচীন এথেন্সে নয়, বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব তিন শতকের দিকে। অর্থাৎ আলেকজান্দারের সময়ে।

এথেন্সের শিক্ষারীতিতে অপর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অন্য দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণত পুরোহিতদের হাতে ছিল, এখানে কিন্তু কবি-র উপরই বেশি নির্ভর করত। এই জন্য ভালো আবৃত্তি করতে পারা, ভালো ভালো কবিতা মুখস্থ করা হ'ল সাহিত্য শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। এমনি ক'রে ভাষা শিক্ষার দিকে এথেন্সের শিশুদের লেখা আর পড়া শেখা সুরু হয় ইস্কুলে গ্রামাটিস্ট (Grammatist)-এর হাতে। লিখতে এবং পড়তে পারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আবশ্যিক ছিল। শরীর চর্চা বা সঙ্গীত শিক্ষা থেকে অনেককে ছুটি দেওয়া যেতে পারত বটে, কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ছিল বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া ছিল উচ্চারণ শেখানো। ভালো ক'রে বলতে পারা এথেন্সের রাজনীতিতেও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে অঙ্ক শেখানো হ'ত কিনা সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না।

ম্যারাথন যুদ্ধের পর থেকেই এথেন্স গৌরবময় যুগে পড়ল। পারস্যের যুদ্ধের পর থেকেই (৪৭৯ খৃঃ পূর্বাব্দ) এথেন্সের সমাজে ও রাজনীতিতে নানা

পরিবর্তন এসে যেন ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ল। থেমিস্টোক্লস্ নানা প্রতিবাদের মধ্যেও নৌ-সেনা তৈরী করবার দিকে এথেন্সকে নিয়ে চলেছিলেন, আর পরবর্তী কালে এথেন্সের মহান্ নায়ক এ্যারিস্টেইড্স সেই দিকেই গঠনমূলক কাজ করলেন; ডেলোস্-এর রাষ্ট্র সম্মেলনে এথেন্স নেতৃত্ব পেল। এ্যারিস্টেইড্স-এর পর এলেন মিলটিয়াডিসের পুত্র সিমন; আর তারপরই এলেন গণতন্ত্রের উদ্গাতা পেরিক্লস। এতগুলি মহান্ রাষ্ট্রনায়ককে পেয়ে এথেন্স গৌরবশীর্ষে উঠে পড়ল। এ ছাড়া এল চৌদ্দ বছরের যুদ্ধবিরতি কাল (যদিও সর্ত হয়েছিল ত্রিশ বছরের)। গণতন্ত্র স্বীকৃত হ'ল। তাছাড়া অবহেলিত সমাজকে একটু ভালো চক্ষে দেখতে সুরু হল; কারণ স্পার্টাতে হেলটদের বিদ্রোহ, এবং নানা যুদ্ধে এই অবহেলিত সমাজের বিশেষ দান দেখে ধনী বা অভিজাত সমাজ একটু করুণা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় খয়রাতির ব্যবস্থা এবং আরও অনেক দাতব্যের মধ্য দিয়ে অভিজাতেরা তাদের কাছে পৌছতে চেষ্টা করে। তাছাড়া পেরিক্লস্ ডেলিক 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের' টাকা অবলীলাক্রমে এথেন্স নগরীর স্থাপত্য ভাস্কর্য কার্যে বেশ ব্যয় ক'রে চললেন। তদ্রুপ সন্দেহ নেই, কিন্তু বাধা দেবে কে? বাধা দিতে যখন সুরু করল তখন তো এথেন্স ভেঙেই পড়ল। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

রাষ্ট্রের এই ইতিহাস সমাজকে নানাভাবে পালটে দেয়। শিক্ষাব্যবস্থার দিক দিয়ে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমত, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ভূস্বামীদের হাতে থেকে বণিক আর করিগরদের হাতে এসে পড়ল। মর্যাদার চাকা ঘুরে যাচ্ছে। এই মর্যাদা শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। সর্বতো শিক্ষা থেকে এল বিশেষ দিকে দক্ষ হওয়ার শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান চর্চা সুরু হ'ল। জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক এবং আরও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান চর্চার ঝোঁক পড়ে গেল। তৃতীয়ত, রাজনীতি এনে দিল বাগ্মিতার যুগ। রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে বাগ্মিতা খুব প্রাধান্য লাভ করে; শিক্ষাতে এই ন্যায় বিজ্ঞান এবং বাগ্মিতা বিশেষ স্থান পায়; স্থান পেল আইন শিক্ষা। চতুর্থত এল দর্শনশাস্ত্র। অর্থাৎ শিক্ষাতে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং বুদ্ধির চর্চা বিশেষভাবে স্থান পেয়ে গেল। হয়ত পরবর্তী কালে এথেন্স সভ্যতার দিকে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে হেরে

গিয়েছিল, কিন্তু একথা মানতেই হবে গ্রীসের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে এথেন্সের এই যুগের দানই একমাত্র স্মরণযোগ্য।

এই যুগে আমরা এথেন্সে পাই, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, স্থপতি, নাট্যকার, পরিহাস-রসিক, এবং অন্যান্য মনীষীকে যেমন, সোক্রাতিস, প্লেতো, আরিস্ততল, ইসোক্রাটিস, এ্যারিস্টোফেনিস, ফিডিয়াস। যদিও এই যুগে সোফিস্টের সঙ্গে সোক্রাতিস এবং তদীয় শিষ্যদের প্রবল বিরোধ দেখা যায়, তবু মানতেই হবে, শিক্ষার দিক দিয়ে সবাই মিলে এথেন্সে একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করে গেছেন।

এ তাবৎ কাল প্রাথমিক শিক্ষা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'ত না। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকে এই শিক্ষাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁধবার জন্য চেষ্টা হ'ল। প্লেতো তো প্রাক্‌বিবাহ থেকে দম্পতিকে শিশুর শিক্ষার কথা ভেবে দেখতে বলেছেন। তিনি শিক্ষাকালকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করে দেখিয়েছেন: তিন বৎসর বয়স থেকে ছ'বৎসর বয়স; এই সময়ে শিশু কেবল খেলবে। খেলার মধ্য দিয়ে খেলার পদ্ধতি আর খেলনা আবিষ্কারের কথা ভাববে; অর্থাৎ খেলার অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টির সুযোগ দিতে হবে। এই সময়ে তারা ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকবে, তারা নিয়মিত ভাবে সবাই নিকটস্থ চার্চে গিয়ে জমায়েত হবে (এই চার্চ অবশ্য খৃষ্টানদের ধর্ম মন্দির নয়, অনেকটা কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল মতো)। এই সময়ে বালক বালিকা একসঙ্গেই চলবে ফিরবে। কিন্তু তারপরই পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা। তা ছাড়া তিনি একটি বড় কাব্যগ্রন্থ পড়ার চেয়ে কবিতা সঞ্চয়ন পড়ানোর বিশেষ পক্ষপাতী; বোধহয় শিক্ষা ইতিহাসে কাব্যসঙ্কলনের ব্যবস্থা তাঁর সময়েই প্রথম পাওয়া গেল।

প্লেতোর কথা বাদ দিয়েও আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাচ্ছি, প্রাথমিক শিক্ষায় এই সময় অঙ্কনবিদ্যা প্রবর্তিত হয়। বোধহয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে অঙ্কনবিদ্যার যোগ আছে ব'লেই এই ব্যবস্থা।

বুদ্ধির চর্চা, বাগ্মিতা প্রভৃতি যখন সমাজে স্থান পেল, তখন তার শিক্ষণের ব্যবস্থার কথাও এথেন্সের মনীষীরা ভাবলেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এর মূলে সোফিস্ট-রা ছিলেন, ছিলেন রাষ্ট্রের মনীষীবৃন্দ আর ছিল প্রাথমিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল গ্রামাটিস্টের হাতে, খুব অল্প বিদ্যাই তাঁদের ছিল। কাজেই এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই সময়ে তিনটি ধারাই পাওয়া যায়; প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা। মাধ্যমিক ইস্কুলের শিক্ষককে বলা হ'ত গ্রামাটিকাস। এ ছাড়া ছিল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক, যেমন জ্যামিতি, অঙ্ক, ভূগোল, সঙ্কেত-লিখন, অশ্বারোহণ, সঙ্গীত, এবং সামরিক বিষয় শিক্ষার শিক্ষক। কিন্তু এই মাধ্যমিক ইস্কুলে সবচেয়ে বড় স্থান পেল ব্যাকরণ শিক্ষা। ব্যাকরণ-কে অবলম্বন ক'রে তারা দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষার উপযুক্ত হ'ত।

খৃষ্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে এথেন্সের পরিষদ ১৮ থেকে ২০ বৎসর বয়সের তরুণদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এই কলেজই এথেন্সে প্রথম রাষ্ট্র-পরিচালিত শিক্ষায়তন; এর পূর্বে রাষ্ট্র-পরিচালিত ইস্কুল এথেন্সে ছিল না।

উচ্চতর ইস্কুলে সাধারণত সাহিত্যবীক্ষণ শাস্ত্র আর বাগ্মিতার রীতিনীতি শেখানো হ'ত। প্রথম এই উচ্চতর ইস্কুল প্রবর্তিত হ'তে দেখা যায় প্লেতোর পরিচালনায়। এই ইস্কুলের নাম ছিল আকাদেমী। আরিস্ততলও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে স্থাপনা করলেন লাইসিয়াম (Lyceum); খৃষ্টপূর্ব ৩০৬ এ এপিক্যুরাস স্থাপনা করলেন এপিক্যুরিয়ান ইস্কুল; এর পর এলেন জিনো সাইপ্রাস থেকে; তাঁর ইস্কুলের নাম হ'ল স্টোইক্ ইস্কুল। এই সব ইস্কুলের অর্থ সরবরাহ হ'ত ধনীদের পৃষ্ঠপোষণায়। এই উচ্চতর ইস্কুলের একটি বড় দান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌভ্রাত্রের সৃষ্টি।

কিন্তু এই সমস্ত নতুন ধরণের ইস্কুলের প্রবর্তন যে এথেন্সেই ঘটেছিল, তা বোধ হয় বলা যায় না। কারণ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকেই পিথাগোরাস ক্রোটোনাতে নিজের তত্ত্বাবধানে ইস্কুল খুলেছিলেন। ক্রোটোনা কারখানা বাণিজ্যের জন্য বহুদিন থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পিথাগোরাসের ইস্কুলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ ছিল না। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও কম নয়, শতাবধি হবে। প্লেতো তাঁর দু' শ' বছর পর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ দেবার

কথা বলেছিলেন। তবে প্লেতো হয়ত স্পার্টার সমাজের কথা ভেবেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু পিথাগোরাস কেবল যে 'ভাষণ'ই দিয়েছেন তা নয়, তিনি কাজেও তাই-ই করেছেন। পিথাগোরাস স্ত্রী-পুরুষের পৃথক ক্ষমতার কথা বোধহয় মান্য করতেন; তাই, মেয়েদের জন্য দর্শন ও সাহিত্য এবং সংসারিক কাজে কর্মে শিক্ষা নিতে বলতেন। পিথাগোরাসের ইস্কুলের নিয়ম-কানুন দেখে মনে হয়, বিদ্যালয়কে তিনি ধর্ম-মন্দির হিসেবেই গড়তে চেয়েছিলেন। এখানে শিক্ষা নিতে গেলে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্য বজায় রাখতে হবে। বর্তমান যুগেও মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে শিক্ষাব্রতীরা বলেন, শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষকের অভিভাবে (Suggestion) আস্থা রাখতে হবে, নতুবা শিক্ষা এগোবে না; শিক্ষা-সূত্রের সেই 'আগ্রহ' সূত্রটি আসতে পারবে না। পিথাগোরাসের ইস্কুলে মাছ মাংস ডিম খাওয়া চলত না; পশুহত্যা, মানুষকে জখম করা কিংবা বাড়ন্ত গাছকে ছেদন করা নিষেধ ছিল। সহজ সরল পোষাক-আশাক পরতে হবে; দিনের শেষে, ব্যবহারের কি কি ত্রুটি ঘটেছে, কোন্ কোন্ কর্তব্য করা হয় নি, কি কি ভালো কাজ করেছে—সে সম্বন্ধে যার-যার কাহিনী সেই-সেই ছাত্র বা ছাত্রী আলোচনা করত। পিথাগোরাস নিজেও এসব মানতেন। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যাও এখানে পাঠক্রমের মধ্যে ছিল।

ক্রোটোনা ছাড়া আর একটি গ্রীকভূমির নাম করতে হবে। মিলেটাস (Milatus)। এই স্থানটিকেই বলা যায় গ্রীক দর্শনের জন্মভূমি। ব্যবসা বাণিজ্যে এখানকার অধিবাসীরা প্রচুর ধন-সম্পত্তি করেছিল। মিলেটাসের অবস্থানই এই সব বিজ্ঞান এবং দর্শন সাহিত্যের উপযোগী। বহু স্থান থেকে এখানে বহু রকমের লোক আসত। কাজেই কুসংস্কার হোক, কি রীতি নীতির বৈপরীত্য হোক এখানে কিছুই আশ্রয় নিতে পারে নি। বরং সবার মধ্য থেকে একটা শক্তিবোধ জন্মেছিল। এইখানে জন্মগ্রহণ করেন গ্রীকদর্শনের জনক থেলিস (খৃঃ পূঃ ৬৪০)। এই মিলেটাসে তখন ফিনিসীয় সভ্যতা প্রবল। থেলিসের কল্যাণে, 'দার্শনিক' কথা 'ঋষি' (Sophos) অর্থে চালু হয়ে গেল। থেলিস-ই গ্রীকদের মধ্যে প্রথম প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা করেন। থেলিস সম্পর্কে

অনেক কাহিনী আছে ; তার মধ্যে সেই-যে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে করতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর ছাত্র এ্যানাক্সিমেণ্ডারও এখানেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর দর্শন শাস্ত্র পড়ে তো উনবিংশ শতাব্দীতে হার্বার্ট স্পেন্সারও নিজের জ্ঞানগর্ভ লেখাকে মৌলিক ভাবতে লজ্জিত হতেন। আবার এই মিলেটাসই গ্রীক গল্পসাহিত্যের জন্মভূমি। যুক্তি যেখানে আছে সেখানেই গল্পের উৎপত্তি হবে। কিন্তু এখানকার দার্শনিক, কবি, গল্পলেখক, যুক্তি বিজ্ঞানী কেবল যে দর্শন নিয়েই থাকতেন তা নয় ; থেলিসের মতো উদাসীন ব্যক্তিও রাষ্ট্রের ব্যাপার নিয়ে বেশ ভাবতেন। তিনিই রাজা থ্রাসিবুলুসকে বলেছিলেন, লিডিয়া এবং পারস্যের হাত থেকে যদি দেশকে বাঁচাতে হয় তবে আইনিয়ন রাষ্ট্রগুলি নিয়ে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করতে হবে। যাইহোক, এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিতে তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতকের (খৃঃ পূঃ) মধ্যে সরকার-চালিত ইস্কুল, মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল গঠিত হয়ে গেল। কেবল মিলেটাস কেন, রোডেস্, ডেলফি, টেওস সর্বত্রই ওই সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে পাবলিক ইস্কুল গঠিত হয়ে গেল। বড় বড় ধনী ব্যক্তি এই সব টাকা ঢালতেন। অবশ্য ধনীদের এই মনোবৃত্তির পিছনে শিক্ষানুরাগের চেয়ে অর্থের নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ এবং উদ্বেগই বড় কারণ ছিল ; যুদ্ধবিগ্রহে শাসকবর্গ নিঃস্ব হ'য়ে পড়ায়, এদের অর্থাদি কেড়ে নিয়ে রাজ্য চালানোর বুদ্ধি খুঁজে পান। তাই ধনদৌলত দৌলতানারা ইস্কুলের মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করতেন। এই জন্যই এই সব ইস্কুল খুব কার্যকরী হতে পারেনি। জনপ্রিয়ও হয় নি, তবু প্রতিষ্ঠান চলত। ইস্কুল পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের বেতনও দেওয়া হত। এখানেও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষেই পড়ানো হ'ত। বোধহয়, টেওসের পাবলিক ইস্কুলই (খৃ পূ ৩য় শতক) এ বিষয়ে অগ্রণী। এসব ইস্কুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষ ভোটে নির্বাচিত হ'তেন। শিক্ষার এতখানি গণতন্ত্র আর এসেছে কিনা জানিনা। সামাজিক এবং অর্থনিয়োগ কর্তার মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে পারলে, এই গণতন্ত্রের কারণ জানতে পারা যেত।

গ্রীসের শিক্ষা কি জগৎকে একটা নতুন দিক দেখাল? জগৎ-কে নতুন

কিছু দিয়েছে কিনা জানিনা, তবে ইয়োরোপকে বোধহয় দিয়েছে। তা ছাড়া গ্রীসের সামন্তেরা সভ্যতার যে-দিকটিকে গতি-হারা ক'রে দিয়েছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলল। পরবর্তী কালের ইস্কুলের ইতিহাস বলবার প্রসঙ্গে এখানে সেই পাষাণ-অহল্যার দিকটি একটু ব'লে নিতে হচ্ছে।

গ্রীসের প্রায় দক্ষিণ দিকে অনেক আগেই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আমরা জানি। সেই সভ্যতা বাবিলন, এসিরিয়ার মধ্যেও এসে পড়েছিল। গ্রীসের কাছাকাছি ক্রীট্ দ্বীপে এই সভ্যতার অনেকখানি ঢেউ পৌছেছিল। এই সভ্যতার কথা হোমার তাঁর কাব্যে কিছু ব'লে গেছেন। ক্রীটের এই সভ্যতাকে 'মিনোয়ান' সভ্যতা বলা হয়। এখানে শিল্প কারখানা প্রভৃতি ছিল, ব্রঞ্জ ধাতুর ব্যবহারও তারা জানত। এইখানেই নর-নারীর সৌন্দর্য চর্চা সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ দেখা যায়, আর দেখা যায় ক্রীড়াকৌতুক এবং ষাঁড়ের লড়াই। ছবি বা চিত্রশিল্পেও এরা বেশ উন্নতি করেছিল। কিন্তু বোধহয় খৃষ্ট পূর্বাব্দ পনের শতকের মধ্যে এই সভ্যতা অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকে এদের কিছু কিছু অধিবাসী গ্রীস-ভূখণ্ডে নানা যায়গায় এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে তাদের সভ্যতা গড়ে উঠল মাইকেনিয়াতে (Mycenae)। এইজন্যই বোধহয় গ্রীকদের আদি বংশ বলা হয় 'পেলাসগি' (Pelasgi); অনেকে শব্দটির অর্থ বলেন 'সমুদ্রের অধিবাসী।' এরা কৃষিকার্য এবং ব্যবসা-বণিজ্যের উপর নির্ভর করত। এদেরই বংশধর বাস করত পেলোপোন্নেসাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেস্‌সেনিয়াতে। স্থানটি বেশ সমতল, খুব উর্বর, সমৃদ্ধশালী। কাজেই উত্তরাঞ্চলের ডোরিয়ানেরা প্রলুব্ধ হ'য়ে খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী থেকেই আক্রমণ করতে সুরু করে। ডোরিয়ানেরাই স্পার্টাবাসী নামে অভিহিত হয় ইতিহাসে। তাদের সঙ্গে এই মেস্‌সেনিয়ানদের অনেক দিন ধরে যুদ্ধ হয়। খৃষ্ট পূর্ব ৬২০ তে তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় আর 'হেলট' নামে স্পার্টাদের কাছে ঘৃণার পাত্র হ'য়ে ওঠে, ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করে। এমনি ক'রে বহিরাগতদের দ্বারা ক্রীটের সভ্যতার অবশিষ্টও বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। স্পার্টানদের বড় আবিষ্কার ছিল লৌহদ্রব্য এবং রণনীতি। এই জন্যই তারা রণনীতি শিক্ষার উপর জোর দিল। আর সেই শিক্ষা গ্রীসের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, জনসংখ্যা একটা মস্ত সমস্যা হ'য়ে পড়ায় অভিজাতরা পররাষ্ট্র গ্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গ্রীসের অন্য রাষ্ট্রবাসী এই বহিরাগতদের রণকৌশল শিখে নিতে বাধ্য হয়। এমনি ক'রে চলল রণশিক্ষার ঢেউ। এমনি ক'রে, ক্রীট-মাইকেনিয়াতে সভ্যতার যে সম্ভাবনা ছিল, কৃষিকর্ম, বাণিজ্য এবং সৌন্দর্য-অনুশীলনের উপর ভিত্তি ক'রে যে-সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছিল, তা স্পার্টায় এসে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, রুদ্ধ হ'য়ে যায়। কৃষিজীবীর সঙ্গে যাযাবর পশুপালকদের চিরদ্বন্দ্বে গ্রীস ভিতর থেকে এবং বাহিরের পারস্য থেকে বিদীর্ণ। এই দ্বন্দ্ব অবসান কল্পে গ্রীক দার্শনিকেরা সঙ্গীত-নৃত্য-মল্লভূমি এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নতুনভাবে স্পার্টার রণনীতির এবং গণতন্ত্রী মনোগঠনের সঙ্গে মিলিয়ে রূপ দিতে চেয়েছেন ; সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা ক'রেছেন, ইস্কুলের সঙ্গে রাজনীতি তথা সমাজনীতি। আবার সমাজের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখে বাণিজ্যপ্রধান স্থানগুলিতে ইস্কুলের প্রবর্তনা চলেছে, ব্যবসায়িক ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মূলত, শিক্ষা বা ইস্কুলের সহায়তায় যে জাতীয়তা বা ব্যক্তি মনে সমজাতিত্ববোধ জাগানো যায় এ কথা প্রায় স্বীকৃত হ'য়ে পড়েছে। ইহুদীদের শিক্ষায় ছিল পরিবার-গোষ্ঠীকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করা, গ্রীসের শিক্ষায় এল আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবোধ উন্মেষ করা। গ্রীসের শিক্ষার মধ্যেই ছিল ভৌগোলিক সীমাকে ব্যাপ্ত করা। ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডার সে সম্ভাবনাকে রূপ দিলেন। আর সেই রূপ দিতে গিয়েই আক্রান্ত জাতি নতুন শক্তি সংগ্রহ ক'রে গ্রীস-কে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে দিল। সেই আঘাতই এল রোমের কাছ থেকে। গ্রীসের শিক্ষা-ই যাযাবরী শিক্ষা, একস্থানে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না ; আবার যে-দেশেই যাক সেই দেশের সংস্কৃতি সমন্বয়ে তারা নতুন রূপ নেবে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতাকে ধরে রাখছে ঐ অবহেলিত সমাজ—কামার, কুমোর আর কিষাণ। তবে তারা কাজের মধ্য দিয়ে সময় সময় যে নৈপুণ্য এনেছে তা আবিষ্কারের পর্যায়ে ওঠেনি। যাই হোক, গ্রীকশিক্ষার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রুদ্ধ সভ্যতাকে তারা ধীরে ধীরে গতিশীল ক'রে তুলছে ; যাযাবর পশুপালক আর কৃষিজীবীদের শিক্ষাকে প্রায় মিলিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ; আবেগ থেকে যুক্তিকে আশ্রয়

করছে; বাইরের প্রতিবেশ শক্তি থেকে ব্যক্তি-মনের অন্তরস্থ উদ্দীপনাকে উদ্বোধন করবার কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকে বৃত্তিকেন্দ্রিক করল না।

॥ রোমে ॥

রোমের ইতিহাস গ্রীস থেকে যে খুব একটা স্বতন্ত্র তা নয়। ভিতরে বাইরের নানা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে রোমের বৃদ্ধি হয়েছে আবার ভেঙেও পড়েছে। তবে রোমের এই ইতিহাস সুরু হয়েছে গ্রীসের কিছু পর।

ভারতবর্ষের ভরত সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছিল, আর রোমের রোমুলাস নেকড়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিল। ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল, আর রোমের সাত-পাহাড়িয়া উৎসবে অশ্ব উৎসর্গ করা হ'ত। শ্রীকৃষ্ণের রথের চূড়ায় থাকত গরুড় পক্ষী, আর গ'ল-দের সঙ্গে যুদ্ধে রোমকনায়ক ভ্যালেরিয়াসের শিরস্ত্রাণে বসে থাকত কৃষ্ণপক্ষী; আর এই কৃষ্ণপক্ষীটি পাখার ঝাপটায় শত্রুপক্ষকে অস্থির ক'রে তুলত। রামায়ণে রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর দিয়ে সেতু নির্মাণ করেছিলেন; কত বছর পূর্বে আমাদের দেশে এই ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা প্রকাশিত হয়েছিল জানিনা, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে ভেঈ (Veii)-এর যুদ্ধে রোমের সেনাপতি ক্যামিল্লাস (Camillus) এই পূর্ত এবং স্থাপত্য বিদ্যার জোরে খনির অভ্যন্তর কেটে জুনোর মন্দির থেকে বৃহৎ সুড়ঙ্গ কেটে (emissarium) ভেঈ-তে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাচীন কালের কাহিনীর সঙ্গে সবদেশেরই মিল আছে। কিন্তু এইসব কাহিনী থেকেই সেকালের মানুষের জীবনযাত্রা এবং রীতিনীতির অনেক কথাই জানা যায়। তবে অসুবিধা হচ্ছে বিজয়ীদের কাহিনীই টিকে থাকে আর বিজিতদের কোন কাহিনীই পাওয়া যায় না। তাদের পরিচয় মেলে দেশের সনাতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

রোমের অভিজাত-রা জন্মগত অধিকার কিছু পেতনা, তাদের অভিজাত হ'তে হ'ত বয়সে এবং সমৃদ্ধিতে। এবং এই অধিবাসীরা সেনাবাহিনীর কোন্ কোন্ কাজে কেমন অংশ গ্রহণ করবে সেই অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ত। তা ছাড়া ছিল, রাজ্যশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সুবিধা-প্রাপ্ত এবং বঞ্চিত দল (Patricians and Plebians) অর্থাৎ স্বাধীন নাগরিক এবং পরাধীন নাগরিক। কিন্তু গ্রীসের মতো এই পরাধীন নাগরিকদের দাবিয়ে রাখা যেত না; অবিরত তাদের সংগ্রাম চলত, অবশ্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়। রোমের অনুশাসনে তারা অনেক সুযোগ আদায়ও ক'রে নিয়েছিল, ত'বে এই দ্বন্দ্বই সমগ্র রোমে খৃষ্টপূর্বাব্দে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। এই জন্য অনেক সংস্কারক, নেতা এবং রাজাদের জীবন বিসর্জন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। কারণ, রোমে অভিজাতদের হাতে ছিল সৈন্যবাহিনী, কাজেই রাষ্ট্রনায়ককে সব সময়েই সর্বসাধারণের জনপ্রিয় হ'য়ে কাজ করতে হ'ত। এইজন্য গ্রাকাস-পরিবারকে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হ'তে হয়েছে। তবু প্লেবিয়ানদের সংগ্রাম চলেছে।

এমনি করে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, আইনকানুন এবং বিধান পরিষদ আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে রোমকেরা সমাজ-চরিত্রে একটা বড় দিক আয়ত্ত করেছিল, তা হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞান। এই ব্যবহারিক জ্ঞান থেকেই তারা গ্রীসের শিক্ষাকে নতুন ভাবে পরিবর্তিত করল। বৃত্তি-শিক্ষা তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা বড় স্থান পেল। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, যতদিন পর্যন্ত শিক্ষায়তনে এই বৃত্তিশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত কারিগর এবং দেশের উপেক্ষিত জনসমাজই তাদের আদিম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে চালু রেখেছিল। তাদেরই তৈরী জিনিস নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চলত, তাদেরই তৈরী অস্ত্র নিয়ে আলেকজাণ্ডারের সহকর্মী এবং আত্মীয় প্রবীণ যোদ্ধা পাইরাসের সঙ্গে তারা লড়েছিল, তাদেরই সাহায্যে হানিবলকে তারা রুখেছিল; এরাই নগর প্রাচীর নির্মাণ করত, এরাই সুড়ঙ্গপথ কাটত। আবার এরাই দাস হিসাবে দূর-দূরান্তরে বিক্রীত হ'ত। ইতালীর শেষপ্রান্ত টারেণ্টাম (Tarentum) থেকে যে ক্রীতদাস-কে নিয়ে আসা হ'ল (খৃঃ পূ ২৭২)

সেই লিভিয়াস এ্যাণ্ড্রোনিকাস (Livius Andronicus) করলেন রোমের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ, ওডিসিকে অনুবাদ আর নতুন ছন্দ দিলেন যার নাম স্যাটারনিয়ান ভার্স (Saturnian Verse); শব্দ মাত্রা-প্রতুলতার থেকে শ্বাসাঘাতের দিকে জোর দিয়ে কবিতা লিখলেন, ইস্কুলমাস্টার হিসাবে কাজ করলেন। ট্যারেণ্টাম থেকে পিথাগোরাসের ক্রোটোন বেশি দূর নয়, হয়ত লিভিয়াসের সংস্কৃতিতে পিথাগোরাসের প্রভাব ছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষ এমনি ক'রেই যুগান্তরের শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখে। বহু শতবৎসর পূর্বে মিশরের এক কৃষকও তার ত্রুটি-বিহীন সুন্দর বাচনভঙ্গী, এবং যুক্তি-সমৃদ্ধ চিন্তাধারাতে তদানীন্তন কালের মিশরবাসীকে, ফ্যারাওকে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল আর তারই বক্তৃতাবলী মিশরের পাঠ্যতালিকায় ব্যবহৃত হ'ল; লিভিয়াসের পুস্তকও রোমকের ইস্কুলে স্থান পেয়ে গেল।

গ্রীসে পেডাগগ নিযুক্ত হ'ত এই ক্রীতদাসদের মধ্য থেকেই। শিক্ষার ব্যাপারে তারা ক্রীতদাসদের এত যে কর্মকৃতি দেখেছে তবু তারা মানুষকে মানুষের মতো শ্রদ্ধা করতে পারেনি। বরং উল্টো ফল হ'ল, ক্রীতদাস বিক্রীর ব্যবসা ফলাও হ'য়ে জেঁকে বসল। শিক্ষাপ্রসঙ্গে আমরা অবশ্য এই গতিশীল ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের কাছে বহু বিষয়ে ঋণী; আমরা আজ বলব, এই প্রথা ছিল ব'লেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষা এমন যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছে, কিন্তু একথা তো ভুললে চলবে না, এর জন্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকের সুস্থ চরিত্র গঠিত হ'তে পারে নি। কিন্তু উপায় নেই। রোম বা গ্রীস বা কার্থেজ বা মুছমানদের এ ব্যাপারে খুব দায়ী করা যায়নি। তখনকার সভ্যতা এইটিকেই কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। এইটি হচ্ছে তাদের অনিবার্য গতি। এ সম্পর্কে টয়েনবীর 'ইতিহাস পাঠ' (A Study of History—Toynbee) অনুসরণ ক'রে একটু আলোচনা করা যাক।

তরাই অঞ্চল আর সমতল অঞ্চল নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরোধ। দুই অঞ্চলের অধিবাসীর জীবনযাত্রা দু' রকমের। একজন পশুচারণ করে, অন্যজন কৃষিকাজ। কিন্তু আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যায়গা বদল করতে হয়। বদল করা মানে, জোর ক'রে অধিকার করা। এমনি ক'রে তারা

পারম্পরিক সঙ্ঘর্ষে আসছে। টয়েনবী বলেন, যাযাবরের জীবনযাত্রা থেকেই মানুষে বড় কৌশল শিখল। যে-ঘাস বা শষ্প মানুষে খেতে পারে না, সেই শষ্প পশুকে খাইয়ে তার কাছ থেকে দুধ আদায় করতে পারে, মাংস আদায় করতে পারে; অথচ কৃষিকর্ম মানে মানুষের ঠিক যে খাদ্যটি প্রয়োজন তাই-ই তাকে পরিশ্রম ক'রে তৈরী করতে হয়। অবশ্য এ সময়ে যাযাবর মানুষ পশুর উপর পরাশ্রিতভাবে জীবনযাপন করত না, পশু এবং মানুষ পরস্পরের প্রয়োজন মিটিয়ে বাস করত। কিন্তু এই যাযাবর যখন মানুষ খাটিয়ে কাজ করতে শিখল তখনই সে, রাজনীতিগত ভাবে না হোক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই শ্রমজীবীদের উপর পরাশ্রিত হ'য়ে পড়ল। মালিক হ'ল শাসকবর্গ, কিন্তু চাষের কোন কাজ করবেনা। কাজেই, ফসলের অধিকাংশ তাদের ভাগে পড়ায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঘাটতির সৃষ্টি হয়। তখন পররাজ্য অধিকার করতে হয়। কিন্তু তারপর? তারপর সে আর একটি বুদ্ধি পেয়ে গেল। এই যাযাবরেরা কুকুর, উট এবং ঘোড়াও পুষত—এদের কাজ ছিল মানুষের কাজেকর্মে সাহায্য করা মাত্র, খাদ্য উৎপাদন নয়। আবার, গরু ভেঁড়াকে পোষ মানালেই কাজ চলে, যদিও পোষ মানানো একটু কঠিনই ছিল, কিন্তু কুকুর উট ঘোড়াকে কেবল পোষ মানালেই কাজ চলেনা, তাকে নিজের কাজের জন্য অনেক আয়াসে 'শিক্ষিত' ক'রে নিতে হয়। এই যে-বুদ্ধি, এই বুদ্ধিটুকু যাযাবরেরা দাসদের উপর খাটিয়ে অনেক দ্রুত কাজ পেত। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহে, পরিশ্রমের কাজে, শাসন-সহায়ক কাজে এই দাসরা 'শিক্ষিত' এবং 'ব্যবহৃত' হ'তে থাকল।

টয়েন্‌বীর আলোচনার এই সারাংশ থেকে জানা যায়, শিক্ষা-ব্যাপারে দাসদের কার্যকে স্বাধীন নাগরিকেরা কেন শ্রদ্ধা করতনা। দাস-রা সমাজের অনেক কাজের মধ্যে এই কাজটিও করুক, তাই তারা চাইত। তারা ছেলে-মেয়েদের সমাজ-অনুসৃত নীতিতে শিক্ষিত ক'রে তুলুক। পিতামাতার হাত থেকে এই কর্তব্য তারাই তুলে নিক। কারণ, ইস্কুলকে এ সমাজে খুব একটা প্রধান ব্যাপার মনে করে নি। দুটো কারণে ইস্কুলের দরকার হ'ত; (১) সামাজিক রীতিনীতি বুঝবার জন্য কিছু লেখা-পড়া আর অঙ্ক কসা, এবং (২) যারা যুদ্ধে অকালে প্রাণ দিত তাদের শিশুদের প্রচলিত রীতিতে, জাতীয়

রীতিতে অভ্যস্ত করা। কিন্তু সমাজে আইন-কানুনের অংশ বড় হওয়াতে বক্তৃতা করা এবং আইনজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। তখন ইস্কুলেও সেই বিষয় ঢুকল। সমাজের অন্যান্য দিক স্বাধীন নাগরিকের ছেলেরা সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলেমিশে শিখত। এই অবস্থায় ব্যক্তিমর্যাদা লব্ধমর্যাদার স্তরে এসে ঠেকল। এই লব্ধমর্যাদার টানে সমাজ-ব্যক্তি ইস্কুলের শিক্ষা নিতে দেশবিদেশে ছুটত, এদের মধ্যে বঞ্চিত সমাজের লোকই বেশী। যে-কোন মর্যাদাই চতুর্মুখ। এই চারটি মুখ তৈরী হয় (১) কাজ-কর্ম, (২) শ্রেণী, (৩) সম্মান, এবং (৪) ক্ষমতা দিয়ে। কাজ-কর্ম বলতে আমরা বুঝি, উপার্জন করার নিয়মিত বৃত্তিটিকে ; শ্রেণী বলতে বুঝি, বিত্ত-পরিমাণ, অর্থাৎ সে সম্পদশালী, না, খেটে-খাওয়া লোক ; সম্মান বলতে, সম্মান আদায়ের সাফল্যের দিক, অর্থাৎ সমাজের কাছ থেকে কতটা সম্মান আদায়ের অধিকারী সে ; ক্ষমতা বলতে বুঝি, ব্যক্তির ইচ্ছা-শক্তি কার্যকরী করতে কতটা সক্ষম, অন্যের বাধাকে সে ব্যক্তি কতটা প্রতিরোধ করতে পারে। এই চতুর্বর্গেই মর্যাদা নির্ণীত হয়। কিন্তু 'নির্ণীত' হওয়ার আগে আছে, নির্ণয় 'করা' আর 'করানো'। দু পক্ষের ব্যাপার। নির্ণয় করানোর ব্যাপারটিই রইল লব্ধ-মর্যাদায়। আর লব্ধ-মর্যাদার কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, সম্পদ আর শিক্ষা। তবে সম্পদ দিয়ে সমাজকে যত দ্রুত নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসা যায়, শিক্ষা দিয়ে ততটা নয়। অথচ, শিক্ষার শক্তি অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষা সমাজের মূল অর্থাৎ বুদ্ধিকে নাড়িয়ে দেয়। এইজন্যই শিক্ষার মর্যাদা দিতে প্রাচীন-সমাজের ভয় কম নয়। কিন্তু সমাজের পঞ্চশক্তিকে এই মর্যাদা আর শিক্ষা নিয়েই কাজ করতে হবে, নতুবা তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই প্রাপ্ত-মর্যাদাকে টিকিয়ে রাখতে সমাজ-শক্তি শিক্ষা-কে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। রোমেও সেই ব্যাপারই ঘটল। সর্বকালের সমাজ-ই কম-বেশী এই ভুলই করেছে। আরও একটি ভুল করেছে যে, শিক্ষা-কে বিসর্জন ক'রে সমাজ-ব্যক্তির শুধু মর্যাদা বাড়ালেই সমাজ বাঁচে না। মর্যাদা আর শিক্ষা দুটি সমান্তরাল গতিতে চলে। সমাজের পক্ষে দুটিই আবশ্যক। রোম সাধারণের শিক্ষাকে খর্ব ক'রে তার মর্যাদা কিছু কিছু বাড়িয়ে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করল। তার ফলে এই দেখা গেল যে, সমাজ-বিযুক্তির ত্রিধারাটি

স্পষ্ট হয়ে পড়ল। অর্থাৎ সমাজবাসীর তিনটি চরিত্র হয়ে গেল ; (১) আভ্যন্তরীণ প্রোলেতারিয়েত, (২) বহির্বৃত্তের প্রোলেতারিয়েত, আর (৩) আধিপত্যকারী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ শাসকশ্রেণী। এইখানেই সুরু হ'ল আভ্যন্তরীণ প্রোলেতারিয়েত অর্থাৎ সমাজের মধ্যেকার নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে আধিপত্য-কারী বা প্রকট সংখ্যালঘিষ্ঠদের সঙ্ঘর্ষ। এই সঙ্ঘর্ষে প্রকট গোষ্ঠী অনেকটা ঔদার্যের মুখোস পরছে, আর অপর পক্ষ শিক্ষার জন্ম বিরুদ্ধ শক্তির দিকেই ছুটছে। কারণ, বর্তমান সমাজের অজ্ঞাত সংস্কৃতি দিয়ে দেশের অভ্যস্ত পথ আর বিশ্বাসকে ভাঙা যায় কিনা পরীক্ষা করতে ; অথবা, এ বিশ্বাসও হয়ত ছিল, সমাজশ্রেণী সম্পর্কে লোকের এই যে ভগবদ্ভক্তিবাদ বা পবিত্রতা আরোপ, তার সম্পূর্ণ মর্ম ধ্বংসে-যাওয়া স্পার্টা-এথেন্স বা গ্রীকভূমি থেকে আয়ত্ত করা যাবে ; কারণ, তারাই এবিষয়ে পূর্বসূরী ; আর তখনই বোঝা যাবে, এই সমাজীয় শ্রেণী-পূজোকে কিভাবে উঠিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু রোমের এই দুরভিলাষী ব্যক্তিরা জানতে পারে নি, তারা প্রাচীন মিশরের পথে এইভাবে পা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ, রাজতন্ত্র (যা মিশরে ছিল, আর যা রোমে হবে) বা বিধানসভাতন্ত্র-কে পূজো করাতে হ'লেও তার সহায়ক আর একটি দলকে অর্থাৎ শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে এমনি ক'রে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ক'রে উপাসনা করতে হবে। ব্যুরোক্রাসী বা শিক্ষিত-গোষ্ঠীকে উপাসনা করার পথেই তারা এগোতে বাধ্য হ'ল। মোটের উপর, পরিবারতন্ত্রকে রোম থেকে যেদিন স্থানত্যাগ করতে হ'ল, সেইদিন থেকে সে আধুনিক ইয়োরোপের জনয়িত্রী হ'তে পারল। আর, সেইদিন থেকে তার শিক্ষায় উন্মাদনা এলেও, তাকে মূর্ত ক'রে রাখতে পারে নি। তবে, জগতের সম্মুখে রোম শিক্ষা আর মর্যাদার নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ক'রে দিল। অর্থাৎ, শিক্ষা আর মর্যাদা সমান্তরাল ধর্মী নয় ; শিক্ষাই মর্যাদা, মর্যাদাই শিক্ষা ; শিক্ষিত হ'লেই মর্যাদা চাই। শিক্ষাকে মর্যাদা ব'লে প্রতিপন্ন করায়, শিক্ষা নেমে যেতে বাধ্য ; শিক্ষা সমাজশক্তি হিসাবে স্বাধীনতা পেল বটে, কিন্তু সে কেবল পরাশ্রিত হওয়ার জন্যই। রোমের শিক্ষাব্যাপারে এই-ই হচ্ছে প্রথম অপকীর্তি। দ্বিতীয় অপকীর্তি হচ্ছে, সমাজ-মর্যাদাকে একটি পৃথক সমাজ-শক্তি ব'লে মনে করে

নিল। অথচ, আমরা জানি, সমাজ-মর্যাদা হচ্ছে সমাজ-শক্তি পঞ্চকের অবলম্বন (Sphere) মাত্র। এর পরিবর্তে রোম যদি শিক্ষাকে পৃথক সমাজ-শক্তিতে রূপান্তরিত করত, তবে জগতের শিক্ষা-চরিত্র সুস্থ হ'ত। কিন্তু পৃথিবীতে তা কোন কালেই ঘটল না।

রোমে অধীন-প্রজারা নাগরিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু সুযোগ আদায় করছিল। কাজেই তারা এই সুযোগ পেয়ে উপযুক্ত হওয়ার জন্য ইস্কুলের প্রয়োজন বিশেষ উপলব্ধি করে। তবে তারা রাজ্যশাসনের সুযোগ পেয়েই অভিজাতদের স্তরে উঠত, তাই তাদেরই অনুকরণ ক'রে, যাদের মধ্য থেকে তারা এসেছে, তাদের প্রবঞ্চিত করবার অধিকতর চেষ্টা করত। চতুর্থ-তৃতীয় শতকে (খৃঃ পূঃ) রোমের সমাজে এই দুর্নীতির অভাব ছিল না; এই জন্য সমাজ সংস্কারক লিসিনিয়াস (Licinius)-এর শাস্তিই হয়ে গেল। এই বিপদ এসেছিল অবশ্য সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে। এই দুরবস্থা সাময়িকভাবে কাটানোর জন্যই রোম ইতালীতে রাজ্যবিস্তারের জন্য বাহু প্রসারিত করে। সেই লুটের মাল দিয়েই সমাজের দুঃস্থ এবং ধনীদের সাময়িক শান্ত করে। সমাজের এই পাপচক্রের মধ্য দিয়ে রোমের পরিবারের পিতা তাঁর সন্তানকে কিভাবে শিক্ষা দিতেন দেখা যাক।

বহু গোষ্ঠীতে, বহু উপজাতিতে রোম অধ্যুষিত ব'লে নাগরিকদের পারিবারিক-সংস্থায় মর্যাদা দেওয়া হ'ত। পরিবারে পিতাই ছিলেন 'সর্বেসর্বা' (Patria Potestas)। পিতা তাঁর পরিবারের দাসদাসী, অধীন প্রজা, স্ত্রীপুত্রকন্যা সবারই কর্তা। এমন কর্তা যে কার্যত না হ'লেও আইনত তাদের বিক্রয় করার বা হত্যা করারও অধিকারী। অবশ্য এপথে কিছু কিছু ধর্ম-গত বাধা যে না ছিল তা নয়। এই সর্বকর্তৃত্ব কেবল পারিবারিক-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কিন্তু নাগরিকতার ক্ষেত্রে পিতা পুত্র দুজনই সম-কর্তৃত্বের অধিকারী, এবং পুত্র যদি শাসকপদে থাকে তবে পিতাকে হুকুমও করতে পারে।

প্রায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা এইভাবে পরিবার-নিয়ন্ত্রিতই ছিল। এই সময় মাতার তত্ত্বাবধানে শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হ'ত। কোন কোন

সময় পরিবারের বয়স্কা নারীর সাহায্যে শিশুরা চরিত্র-গঠনের এবং সামাজিক আচরণের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করত। কোন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা চলত না; এমন কি পাঠের কিংবা পরিবারের উপযোগী কাজের সময়ও নির্ধারিত ক'রে দিতেন এঁরাই। পিতার অংশও কম নয়। পরিবারের কাজে-কর্মে পিতার সাহায্যেই তারা অভ্যস্ত হত। পরিবারের কাজের থেকে সুরু ক'রে বিধান-পরিষদের রীতিনীতি পর্যন্ত সবই তারা পিতার সাহায্যে জানত। অবশ্য কেটোর (ইনি সেন্সর ছিলেন) মতো সবাই দায়িত্বশীল পিতা নয়। তিনি তাঁর শিশুর শিক্ষার ভার দাসদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। তা ছাড়া, তাঁর ছেলেকে দাস-শিক্ষক বকুনি দেবে, কি কান ধরবে, কিংবা ছেলে শিক্ষাবিষয়ে দাসের কাছে ঋণী থাকবে, একথা ভাবতে কেটো-র আভিজাত্যে বাধত। তাই শিক্ষা ব্যাপারে যদিও তাঁর ছেলের জন্য দাস-রা নিযুক্ত থাকত, তবু তিনি অবিরত প্রহরায় থাকতেন। ছেলেরা শিখত, রোমের ইতিহাস, রোমের আইনের দ্বাদশ তালিকা, পরিষদের সদস্যদের কর্তব্যপ্রণালী, যুদ্ধবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিবিদ্যা, এবং ব্যবহারিক জ্ঞান; আর মেয়েরা শিখত গৃহস্থালী কাজ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল সমাজের অন্যান্য রীতিনীতি জানবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান। অর্থাৎ সাধারণভাবে পাঠক্রমের শিক্ষা এবং অনুষ্ঠান-গত শিক্ষা। এই-ই ছিল অভিজাতদের শিক্ষা; আর সাধারণ পরিবারের ছেলেদের শিক্ষা নির্বাহ হ'ত কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়ে অর্থাৎ ঘটনাক্রমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা বহুদিন থেকেই এট্রাসকানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমগ্র রোমে এই ইস্কুল ব্যবস্থা চতুর্থ-তৃতীয় শতকের পূর্বে বিশেষ পাওয়া যায় নি। গ্রীকদের প্রেরণায়, তাদেরই সাহিত্য, সমৃদ্ধিতে এই ইস্কুলের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। পূর্বেই আমরা বলেছি, টারেণ্টাম থেকে লিভিয়াস এসে রোমে ২৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ইস্কুল প্রবর্তন করেন। এই সময়ই লাতিন ভাষা সাহিত্যে স্থান পায়। কাব্য-নাটক এই সময়ই রচিত হয়। তারপর একে একে নেভিয়াস, প্লটাস প্রভৃতি এলেন। রক্ষণশীল সমাজ এই নতুন শিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গারণ করেনি তা নয়, কিন্তু পরে এই নতুন সাহিত্য, নতুন

ইস্কুল, সমগ্র রোমের জনচিত্তে সাড়া জাগাল। রোমের যুবকেরা শিক্ষালাভের জন্য সুদূর এথেন্সে গেছে, গ্রীক অধ্যুষিত ইতালী অঞ্চলে গেছে। কেন তারা এমনি ক'রে ছুটেছে সে কথা পূর্বে আলোচনা করেছি। কার্থেজ বিজয়ের পর রোমের বিধানপরিষদ কৃষি-বিদ্যা বিষয়ক মাগো-র প্রায় আটাশ খানা বই লাতিনে অনুবাদ করতে অনুমোদন করলেন। কার্থেজবাসী কৃষিবিদ্যায় সেকালে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিল। এমনি ক'রে সেই হিব্রুদের শিক্ষায় 'অনুবাদের স্থান'-থেকে রোমে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার জন্য 'অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্য গ্রন্থই' রচিত হ'তে থাকল। এখন থেকে রোমে লাতিন সাহিত্যের পাশাপাশি গ্রীকসাহিত্য পড়বার ব্যবস্থাও স্বীকৃত হ'ল। কেবল লেখা-পড়া আর অঙ্ক কসতে জানলেই তো জাতির উন্নতি হয় না, শিক্ষায় উচ্চচিন্তার সুযোগও থাকা চাই। ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রীক সাহিত্যের শিক্ষক, লাতিন সাহিত্যের শিক্ষক নিযুক্ত করার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু পিউনিক-যুদ্ধের পর থেকেই রোমে দারুণ খাদ্যসমস্যা এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। খৃঃ পূর্ব ২৩২এ ফ্লামিনিয়াসের কৃষি-আইন নিয়ে শাসন-কর্তাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ এই আইন তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু প্রতিবাদে দেশের দুর্দশার স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না; রোমের যে ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছে তাতে বহু দেশের লোকে এসে রোমে ভেঙে পড়ছে, যুদ্ধে দেশবাসী কৃষিকাজ ভুলে গেছে, জমি-জিরেত সব নষ্ট হয়ে গেছে, দাসদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে; টয়েনবীর সেই কথা,—অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পর-শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রোমের অধিবাসী নীতির দিক দিয়ে বহু নিচে নেমে যাচ্ছে; এ স্রোতকে ঠেকানো অসম্ভব। তারা কেউই কাজ করতে চায় না, শুধু দাবী জানায়। এই অবস্থা কেটোর আমল (খৃঃ পূ ১৮৪) পর্যন্ত চলতে থাকল। সংস্কারক হিসাবে কেটো আবার ছিলেন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর। এই সময় আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। খৃঃ পূর্বাব্দ ১৫৫তে এথেন্সের সঙ্গে রোমের সংলগ্ন রাজ্য নিয়ে একটু মতবিরোধ দেখা যায়। এথেন্সের রাজদূত হিসাবে কার্নিয়াডিসের নেতৃত্বে কয়েকজন এপিক্যুরিয়ান দার্শনিক আলোচনার জন্য আসেন। এথেন্স জানত,

রোমের অধিবাসীর বাগ্মিতার প্রতি এবং দার্শনিকতার প্রতি মোহ আছে, সেইজন্য রাজদূত হিসেবে এদের পাঠিয়ে দিল। প্রথম দিনের বক্তৃতায় রোমবাসীকে কার্নিয়াডিস মুগ্ধও করেছিলেন; এমনকি ঐ সংলগ্ন রাজ্য যে এথেন্সের প্রাপ্য একথা তাঁর যুক্তি, এবং বাগ্মিতায় পরিষদের সভ্যেরা প্রায় স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু পরের দিন বক্তৃতা করতে উঠে কার্নিয়াডিস রোমের সমাজনীতি বিরোধী একটা কথা বললেন; বললেন, 'জগতে ন্যায় অন্যায় ব'লে কিছু নেই, আসল কথা যার শক্তি আছে তার সব কাজই ন্যায়সঙ্গত।' এই কথায় কেটো প্রমাদ গণলেন। এই-ই কি গ্রীসের দর্শন? এই-ই কি দার্শনিকতা? তিনি এইসব রাজদূতকে দেশ থেকে অবিলম্বে স'রে পড়তে হুকুম করলেন। গ্রীক দার্শনিকদের দেশ থেকে নির্বাসিত করলেন, এমন কি গ্রীকভাষা, সাহিত্য এবং দর্শন সমস্ত কিছুর পঠনপাঠন নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর কেমন সন্দেহ হ'ল, রোমের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের মূল কারণ এই গ্রীকসাহিত্য এবং দাসদের তত্ত্বাবধানের শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষাকে তো রুদ্ধ করবার ক্ষমতা এখন আর রোমের নেই। কাজেই মাতৃভাষায় শিক্ষাকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতে সুরু করেন। নিজেও গ্রন্থ রচিত করেন। জানিনা, এই বিদ্বেষ মাসিডনীয় যুদ্ধের সঙ্গে কতখানি জড়িত। তবে একথা সত্য, অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশত যদি মাতৃভাষায় আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে সে আগ্রহ খুব কার্যকরী হয় না। মাতৃভাষায় আগ্রহ শিক্ষার্থী এবং দেশবাসীর অন্তর থেকে আসা চাই। যেখানেই আগ্রহের মূল কারণ বিদ্বেষ থেকে, সেখানেই মাতৃভাষার শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিদ্বেষ-বহ্নি চলে গেলে, কেটো নিজেও গ্রীকসাহিত্য পড়েছেন। কাজেই তাঁর শত চেষ্টা সত্বেও গ্রীক শিক্ষার বিরোধী মনোভাব দেশের অন্তরে স্থান পেল না। এমনি বোধ হয় নিয়ম। টয়েনবী একেই বলেছেন স্বয়ং-বিযুক্তি (Schism in the Soul)। কারণ, তখনও গ্রীকভাষা বাইরের জগতে বিশেষ ভাবে প্রচলিত; এদিকে রোম ভেতর থেকে বাইরের দিকে আসতে চাইছে। এই অবস্থায় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে ভাগ্যান্বেষীরা গ্রীক ভাষার দিকেই ঝুঁকে পড়বে। কোন দেশেই রাষ্ট্রনায়কের

ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা তৈরী হয় না। রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্র যদি সঙ্কীর্ণ হয়, তবে সে ভাষা শিখতে শিক্ষার্থী আগ্রহী হয় না। কেটো মনে করেছিলেন, মাতৃ-ভাষার জিগিরে বোধ হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রীক থেকে লাতিনে ফেরাতে পারবেন। কিন্তু যে-লাতিন কেটো অনুমোদন করেন সে-লাতিন লাতিনের জনসাধারণের মাতৃভাষা নয়। অতএব লাতিন শিখতেও আয়াস আছে; অথচ আয়াস স্বীকার ক'রে কেবল কুনো হয়ে থাকতে হয়। লাতিন যেদিন বহু দেশে প্রচলিত হবে, যেদিন বহু দেশে প্রচলিত হ'ল—সেইদিন থেকেই লাতিন চর্চার সুরু। সাহিত্য-প্রীতি বা দেশ-প্রীতিতে মানুষ ইস্কুলে ভাষা খুব কমই শিখতে যায়, সে শিখতে যায় তার মর্যাদা-স্তরকে উন্নীত করতে, তার অবস্থাকে উন্নত করতে, বৈষয়িকতার দরুণ। এ্যাটিকেরা এই নিয়মেই পুরনো গ্রীককে সরিয়ে দিয়েছিল (খৃঃ পূ ৫ম শতাব্দীতে), তারপর কাজ কর্মের ভাষা হিসাবে ম্যাসিডনের ফিলিপও এই ভাষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; কেটো তো এখন গ্রীককে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন-ই। সর্বজনীন না হ'লে কোন মাতৃভাষাই প্রসার লাভ করে না। আবার প্রসারিত হ'লে মাতৃভাষা এমনি করে ভেঙেও যাবে। ঠিক এই নিয়মে যুগের পুরনো সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভাষাকে সঞ্জীবিত করা যায় না। সঙ্কীর্ণ-ক্ষেত্রে হয়ত তার সাফল্য আছে, কিন্তু যে বর্তমানকে আমল দিল না সে বর্তমানে জীবন লাভ করবে কি করে! পরবর্তীকালে আমরা লাতিনকে দেখেছি গ্রীককে বরবাদ করতে, কিন্তু সেই লাতিনকে আবার খৃষ্টীয় যাজকেরা বর্তমান যুগে বাঁচাতে পারছেন না। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাঁদের বিরুদ্ধে মাতৃভাষার উপকারিতা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক রসায়ন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যতই মাতৃভাষা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত হোক না কেন, মাতৃভাষার পাশাপাশি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ভাষাকে শেখানোর ব্যবস্থা রাখতেই হবে। 'বৃহত্তর' শব্দটি অজ্ঞাতসারে 'বৃহত্তমের' দিকেই চলতে চায়।

এই জন্যই আমারা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমে গ্রীসের প্রভাবে কয়েক রকমের ইস্কুল দেখতে পাচ্ছি। (১) প্রাথমিক ইস্কুল: এখানে শুধু লিখতে আর পড়তে শেখানো হ'ত। শিক্ষকদের নাম ছিল—লুডি মাজিসটার (Ludi Magister) (২) সাহিত্য ও ব্যাকরণের ইস্কুল—এখানে সাহিত্য

ও অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক বিদ্যা পড়ানো হ'ত,—এখানকার শিক্ষকের নাম গ্রামাটিকাস (Grammaticus) (৩) উচ্চতর সাহিত্য ও বাগ্মিতার ইস্কুল—এখান থেকে দেশের যুবকেরা আইন কানুনে, রাজনীতিতে, দর্শনে অভিজ্ঞ হয়ে দেশের কাজে নামত।

কিন্তু একদিকে যেমন গ্রীসের প্রভাব কমে আসছিল তেমনি রোমের প্রভাব বেড়ে চলছিল। কাজেই কেটো যা পারেন নি লাতিনের বুদ্ধিজীবীরা লাতিনকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন। রোমে আক্কিয়াস, কবি লুসিলিয়াস, ভালেরিয়াস সবাই লাতিন ভাষা গবেষণা করতে থাকেন; আর সিসেরোর গুরু প্রেকোনিনাস (খৃঃ পূঃ ১৫৪-৭৪) তাঁর ক্ষিপ্র এবং তীক্ষ্ণ সমালোচকের প্রতিভায় লাতিনকে পংক্তিতে আনলেন। আর এলেন ভারো (খৃ পূ ১১৬-২৭)। এঁদের প্রচেষ্টায় লাতিনের ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, স্থাপত্য, রসায়ন শাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র—প্রভৃতি সমস্ত কিছুই কৌলীন্য পেল। একদিকে যেমন রোমের সাম্রাজ্য বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি লাতিন ভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে—এ অবস্থায় কোন ভাষার ব্যাপ্তিকে ঠেকিয়ে রাখা বোধ হয় যায় না। ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত এই ভাষার চর্চা ছাড়য়ে পড়ল; এদিকে সমৃদ্ধ নগরী রোম ইয়োরোপের সমগ্র জাতির মিলনস্থল হ'য়ে ওঠে; নাগরিকতার অধিকার স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষের ভাগ্যের এক নতুন দুয়ার খুলে গেছে। কাজেই লাতিন ভাষা সমাদৃত হ'য়ে ওঠে। আবার এই লাতিনের শিক্ষা কি ক'রে ভেঙে পড়ল, কেন পরবর্তীকালে সিসেরোর মতো প্রতিভা রোমে পাওয়া গেল না—সেকথা রোমের রাজনৈতিক ইতিহাস রোমেই থাক। আমরা কুইন্টিলিয়ান এবং তাঁর সমকালীন শিক্ষারীতি নিয়ে একটু আলোচনা করি।

খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের পূর্বে সরকার শিক্ষাব্যাপারে খুব একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেনি। কিন্তু বে-সরকারীভাবে শিক্ষাকে রোমকবাসী পৃষ্ঠ-পোষকতা করছিল। তবে তার মধ্যে কৃষিবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা এবং বাস্তু ও স্থাপত্য বিদ্যাতেই তাদের উৎসাহ বেশি পরিমাণে ছিল। সিজার, অগাস্টাস এঁরা উভয়েই নানাদিক দিয়ে স্থাপত্যশিল্পী, চিকিৎসক প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণা

করতেন। লাইব্রেরী এবং কিছু কিছু ইস্কুল এইসব সম্রাটদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেত। কিন্তু সম্রাট ভেসপাসিয়ান (খৃষ্টাব্দ ৭৬) শিক্ষকদের কাছে একটা নতুন সম্ভাবনা খুলে দিলেন; তিনি লাতিন এবং গ্রীক শিক্ষককে রাজ-কোষাগার থেকে বেতনের ব্যবস্থা ক'রে দেন। পাবলিক ইস্কুল, মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল স্থাপিত হল। এই যুগেই আমরা পাই স্থপতি ভিট্রুভিয়াস এবং শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়ানকে।

ভিট্রুভিয়াস স্থাপত্য বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা, স্থাপত্য বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক, তার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক প্রভৃতি এমন স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে, এ যুগেও তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। জি, ডি, এচ কোল শিক্ষার পাঠক্রম নিরূপিত করতে যে-কথা বলেছেন—ভিট্রুভিয়াসের লেখা থেকে অনেক আগেই সে কথা জানতে পারা গেছে। ভিট্রুভিয়াস যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি জোর দিয়েছেন শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর। কাজ করতে করতেই মানুষ শিখে থাকে, কাজেই কোন একটা কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা যদি এগোয় তবেই সে শিক্ষা হবে স্বাভাবিক। রোমকেরা ব্যবহারবাদী, বুদ্ধির চর্চা অপেক্ষা তারা কাজ করতে ভালবাসে—কাজেই রোমের শিক্ষা বৃত্তিকেন্দ্রিক এবং শিল্পকেন্দ্রিক হবে সে বিষয়ে খুব একটা সন্দেহ হয় না। গ্রীসের শিক্ষা-ইতিহাস থেকে রোমের শিক্ষা ইতিহাসের এইখানেই নতুন সুর। আদিম মানুষের শিক্ষাধারা সংগঠিত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক কাল পরে আমেরিকার শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক পেইয়ার্স (Peirce) কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে অগ্রসর করতে বলেছিলেন; তাঁরই মতবাদ জন ডিউঈ-এর মধ্যে এসে বড় হ'য়ে উঠল।

এর পর নাম করতে হয় প্রধান এবং বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতী কুইন্টিলিয়ানের। ইনি খৃষ্টাব্দ ৩৫-এ স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্যান্বেষণের জন্য রোমে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি জোর দেন বাগ্মিতার উপর। এঁর সময়েই সরকারী বেতনে ইস্কুল মাস্টার রোমে নিযুক্ত হ'ল। বাগ্মিতায় সিদ্ধ হ'তে হ'লে নৈতিক চরিত্রে উন্নত হতে হয়—এই কথাই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। বাগ্মীকে মানবিক সংস্কৃতিতে বা মনন বিদ্যায় যেমন জ্ঞান নিতে হ'বে তেমনি নিতে হ'বে

বিজ্ঞানের শিক্ষা। ভিট্রুভিয়াস এবং কুইন্টিলিয়ান সমস্ত রকমের শিক্ষাকেই কেন্দ্রায়িত করলেন। প্রকৃত ভাবে শিক্ষিত হ'তে হলে কোন বিদ্যাতেই অজ্ঞ থাকলে চলবেনা। কিন্তু এঁরা প্রাথমিক শিক্ষাকে পিতামাতার হাতেই ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক। শিশুদের শিক্ষা-সামর্থ্যের উপর কুইন্টিলিয়ানের খুব বেশি আস্থা ছিল। শিক্ষার দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—শারীরিক শাস্তি বিধান তিনি অনুমোদন করতেন না। যে-অক্ষম শিক্ষক সে-ই শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকে। শিশুদের চিত্তবৃত্তিকে ধীরে ধীরে শিক্ষার দিকে এগিয়ে আনতে হবে। শিক্ষকের চরিত্র সম্পর্কেও তিনি অনেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মোটকথা সেকালে কুইন্টিলিয়ানই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি শিক্ষা সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁর বক্তব্য বেশী আছে উচ্চতর শিক্ষাকেই অবলম্বন ক'রে।

চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রোম সাম্রাজ্যে সরকার-পরিচালিত আর পৃষ্ঠপোষিত ইস্কুল স্থাপনার হিড়িক পড়ে গেল। সরকারের তত্ত্বাবধানে ইস্কুল প্রতিষ্ঠার এতবড় যুগ এর পূর্বে আর দেখা যায়নি।

এর পরই খৃষ্টধর্মের আওতায় ইস্কুল এক নতুন রূপ গ্রহণ করে।

॥ ফ্রান্সে ॥

ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠাই অচল নয়। কারণ, ইতিহাস কেবল 'জটিল মনোবৃত্তির একটি দেহধারী জীব' সেই মানুষই সৃষ্টি করেনা; মানুষকেও পরিবর্তিত ক'রে নেয় ভৌগোলিক সংস্থা, খাদ্যব্যবস্থা, ভূখণ্ডের নিয়ম, প্রাকৃতিক যোগাযোগ, মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সামাজিক নিয়ম, তার অতীত, ধর্ম, আর তার দুর্নিবার আকাজ্ক্ষা এবং প্রতিপত্তি খাটানোর প্রলোভন। রোমকেরা, গ্রীকদের অনুকরণ ক'রে গ'লদের এবং অন্যান্য

জাতিকে, বলত বর্বর (অর্থাৎ যারা নিজ দেশবাসী নয়) ; সেই গ'ল্-দের মধ্যেও ইতিহাস থেমে যায়নি। তাদের মধ্যেও ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল, আর রোমকদের এমনি একটা অন্যায় দেখে তারা রোম সাম্রাজ্য প্রথমে আক্রমণ করে। এই নিয়ে চলল বহুদিনের সঙ্ঘর্ষ, জুলিয়াস সিজারের আমল (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) পর্যন্ত।

দানিয়ুব নদীর কাছ থেকে গ'লেরা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকে। এই আদিম-সমাজ ধীরে ধীরে রাজনীতি অনুসরণ ক'রে সমাজ গঠন করল ; এদের মধ্যে রাজ্য ছিল (রাজার শাসনে), গণতন্ত্র ছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘও ছিল ; তাছাড়া অঞ্চল গুলো জেলায় জেলায় ভাগ করল, এই জেলাকে বলত তারা পেজি (pagi) ; আর দেশের লোক সাধুতার সঙ্গে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

এতৎসত্ত্বেও তাদেব মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যই তাদের সমাজকে গ্রীক-রোমকদের মতোই বিধ্বস্ত ক'রে দিতে বাধ্য হ'ল। যারা বিজয়ী তারা অপরাপর শ্রেণীকে শায়েস্তায় রাখতে চেষ্টা করল ; এদের শক্তির সঙ্গে যোগান দিল দেশের পুরোহিত সম্প্রদায় ড্রুইডেরা। সম্মান কত রকম ভাবে জিইয়ে রাখা হচ্ছে ; ভালো বংশে জন্মানোর দরুণ এক মর্যাদা, অনেক জমিদারী আছে তার সম্মান, ভালো যুদ্ধ করতে পারে তার দাবী। এখানকার ড্রুইডেরা আবার বিচিত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়েছিল ; বংশ-মর্যাদায় নয়, নিরাসক্ত চরিত্রে নয়, এককভাবে নয়, প্রতিষ্ঠানও নয়, একেবারে যাকে বলে কর্পোরেসন। ড্রুইডদের এই কর্পোরেসনে প্রথমে হয়ত নীতি-বোধ খাঁটিভাবেই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক নেমে গেল। শেষ আঘাত হানলেন এদের উপর সিজার। যাক্! তাদের শক্তি এবং সম্মান দুইই চলে গেল। খৃষ্টধর্ম বা রোমক-ভাবধারা প্রচারের একটা রাস্তা হ'য়ে থাকল। মানুষ তখনও বিপ্লবী হয় নি ; তারা যুদ্ধ করে আর হেরে গেলে গভীর দুঃখে বশ্যতা স্বীকার করে। তাদের অভিযোগ আছে, কিন্তু তাকে পরিচালিত করে সংস্কৃতির ধারক এই পুরোহিতেরাই। সিজার একটা কাজের কাজ করলেন। এই সব অভিজাত শ্রেণীর নীচেই আছে মাটির মানুষেরা ; তারা চাষবাস করে আর ওদের খাদ্য যোগায়; কর

যোগায়, যুদ্ধের দক্ষিণা দেয়। এরা এইসব রাজকীয় ব্যাপারে মুরগীর মতোই নিরাসক্ত দার্শনিক, তবে একটা নিরাপত্তা চায়; আর তাই কোন শক্তিশালী নরপতির আশ্রয় খোঁজে। যেখানেই অবিরত সংগ্রাম চলেছে সেখানেই কৃষিকাজ বন্ধ হয়েছে, চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেশে অভাব এসেছে। তারা নিজেরা খেতে পায় না, কিন্তু খাওয়াতে বোধ হয় ভালোবাসে; কৃষিকাজকেই তাদের অভ্যাসমূলক ধর্ম ব'লে মনে করে। স্পার্টায় এই বিপদ থেকেই (পেলোপন্নেসিয়ান যুদ্ধ) চাষীদের বিদ্রোহ হয়েছিল, রোমে পিউনিক যুদ্ধে এই বিপ্লবের সম্ভাবনাই এসেছিল। এই নিয়েই গ'ল-দের সমাজ সঙ্ঘর্ষ, আর তারই ফলে এবং বৃটেনের পশ্চাৎ আক্রমণে জুলিয়াস সিজারের কাছে তারা পরাজয় বরণ করল। এর পর থেকেই রোমকেরা শকুনি গৃধিনীর মতো নাড়ীচেরা ক'রে তাদের সংস্কৃতি সভ্যতা নষ্ট ক'রে দিয়ে নিজেদের বস্তু বস্তা বোঝাই ক'রে চাপিয়ে দেয়। খৃষ্টধর্ম পূর্বাঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে যেন ধর্মের একটা ক্রিকেট মাঠ তৈরী করল। মুর্খেরাই বুঝি বলে, 'অন্ধজনে দেহ আলো', আর পণ্ডিতে বলে 'খঞ্জকে খঞ্জ বলিও না।' পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য নিজেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এইবার 'বর্বর'-দেশ থেকে এক 'বর্বর' এলেন, আর পলকে খৃষ্ট-ধর্ম-যাজকেরা তাঁকে 'ডেভিড' 'ডেভিড' ব'লে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন! ইনিই ফ্রাঙ্কবংশ এবং রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ক্লভিস (Clovis)।

সিকাম্ব্রিয়ান্স রাজ্যের রাজা ক্লভিস, সালিয়ান ফ্রাঙ্কসের একটি বংশ থেকে এসেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে এরা গল-ভূমির উত্তরাঞ্চল থেকে সোমে (Somme) উপত্যকার উর্বরাভূমিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়। ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে সোইসন্স (Soissons)-এর যুদ্ধে রোমক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত ক'রে লয়ের (Loire) অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর? তারপর তাঁর স্ত্রী ক্লোটিলডা আর রেইমস (Reims)-এর বিশপ রেমিজিয়াসের প্ররোচনায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, এর পিছনে তাঁর অপ্রতিরোধ্য রাজ্য-বিস্তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চার্চকে সৈন্য যোগান দিলেন। চার্চ-ও সাম্রাজ্য গড়তে চায়। ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম

পালন ক'রে যীশুই বা এমন কি করেছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে দেহত্যাগ করতে হ'ল মাত্র! কাজেই সৈন্য দিয়ে পররাজ্যের অধিবাসীকে দ'লে পিষে শান্তির বাণী শোনালে অন্তত ইহলৌকিক কাজ বেশ হবে! সাধারণ মানুষের দুরবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ যীশু একবার প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তা যখন এমনি ক'রে বিনষ্ট হয়ে মানুষকে ছন্নছাড়া ক'রে দিল তখনই তারা আর একটা পথ খুঁজেছিল। আপাতত সে কথা থাক।

যাইহোক, ক্লভিস ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠীর রাজ্যের বিস্তার করলেন, বার্গাণ্ডির রাজা গাণ্ডিবল্ড্‌কে পরাজিত ক'রে সন্ন্যাসী ক'রে দিলেন আর আরিয়ান ভিসিগথ্‌স-এর রাজাকে স্পেনে বিতাড়িত করলেন। তারপর চলল স্বজনবর্গকে হত্যা। ধর্মযাজকেরা 'বাহা বাহা' ক'রে এই হত্যাকারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ ব'লে স্বীকার ক'রে নিল। পুরোহিতেরাও লুটের মাল থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর ছেলেরাও খৃষ্টধর্মকে জার্মাণীর অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কেঁদেছে। তারই অভিশাপে এই বংশের বংশধরেরা সামান্য দুটি নারী-কে নিয়ে অন্তর্যুদ্ধ ঘটাল (৫৬১-৬১৩)। সাধারণ মানুষ দুঃখ-বেদনায় অবিরত কেঁদেছে, তাই তাদের মধ্যে রাজায় আভিজাত-সম্প্রদায়ে বিভেদ বাধল। প্রাসাদের মেয়র পিপ্পিন এবং চার্চের বিশপ আর্নাল্‌ফ (Pippin and Arnulf) ৬২৯ থেকে রাজাকে অপসারিত করবার ধ্বনি তোলে। ৭৫২ খৃষ্টাব্দে টার্ট্রির যুদ্ধে দ্বিতীয় পিপ্পিন রাজ্য হস্তগত ক'রে নিল।

এই সময়ে সমাজের অবস্থা চমৎকার! ৩০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রার (Wergild) ভাগে মানুষকে অভিজাত শ্রেণীতে ভাগ করা হ'ত। দাস আছে, রায়ত আছে। তা ছাড়া আছে চার্চের কর্তৃত্ব। বহু লোকের দান নিয়ে চার্চ তখন প্রকাণ্ড জমিদার। কত অন্নসত্র খোলা হ'ল; কত লোক পোষা হ'ল। সবার মূলে আছে 'অধীন প্রজা' ক'রে তোলার আকাঙ্ক্ষা। ভূস্বামী আর চার্চের ধর্মযাজক একত্র হয়ে সমগ্র দেশের অধিবাসীকে যেন হুকুমের চাকর ক'রে তুলল। এই অবস্থায় শাসনভার নিলেন শার্লেম্যান (৭৬৮ খৃঃ)। ইনিই পুরোহিতদের অশিক্ষা কুশিক্ষায় বিরক্ত হয়ে দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এঁর রাজত্বকালের পরেই ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়।

৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভার্দুনে ফ্রাঙ্কিসরাজত্বকে দুভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বাঞ্চল এখন থেকে জার্মাণী নামে এবং পশ্চিমাঞ্চল ফ্রান্স নামে অভিহিত হ'ল। এই থেকে দুইটি দেশ দুরকমের জাতীয়তারও সৃষ্টি ক'রে বসে। ফ্রান্সে ৮৪৩-৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চার্লস-দ্য-বল্‌ড রাজত্ব করেন। এঁর আমল থেকে উত্তুরে জলদস্যুদের (Norse pirates) উৎপাত সুরু হয়, আর তা থাকে ৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেই সময়ে এই জলদস্যুরা এখানে বসবাস সুরু করে।

যাইহোক ৮৪৩ পর্যন্ত সমস্ত দিক দিয়েই বর্তমান জার্মাণী, ফ্রান্স এবং রোম-ইতালীর ইতিহাস প্রায় এক। ৮৪৩ থেকে নতুন অধ্যায় সুরু হল।

কিন্তু ফ্রান্সের ইস্কুলের কথা আলোচনা করতে গেলে কয়েকটা কথা সব সময় স্মরণ রাখা দরকার। এখানে রাজা আছে, পুরোহিত আছে, সম্পন্ন অধিবাসী আছে আর আছে দরিদ্র জনসাধারণ। অধিবাসীদের মধ্যে আবার অনেক সম্প্রদায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে আইবেরিয়ানদের প্রভাব, ভূমধ্যসাগরের সমুদ্রতটে লেগুরিয়ান, রাইন নদীর পূর্বে জার্মান এবং উত্তর-পশ্চিমে স্কাণ্ডি-নেভিয়ান। ধর্মও (cultes) মোটামুটি তিনটি: রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট (সংস্কারকামী এবং লুথেরীয়) এবং হিব্রু। ১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সব ধর্মই রাষ্ট্র সমর্থন করত; কিন্তু ১৯০৫ এর আইন থেকে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ সমর্থন তুলে নেয়; সমস্ত ধর্মই প্রকাশ্যে উপাসনার অধিকার পেল।

শার্লেম্যানের আমল থেকেই প্রাসাদ-সংলগ্ন, বিশপের কার্যালয় সংলগ্ন এবং মঠ-সংলগ্ন ইস্কুলের সৃষ্টি হ'তে দেখা দেয়। বিশপের ইস্কুলকে বহিস্থ ইস্কুল (External school), আর মঠ-সংলগ্ন ইস্কুলকে আভ্যন্তরীণ (Internal school) ইস্কুল বলা হ'ত। বিশপের ইস্কুলে বেতন দিয়ে পড়তে হ'ত। মঠের ইস্কুলের পাঠক্রমের প্রাচুর্য ছিল। সবই ছেলেদের জন্য, মেয়েদের ইস্কুল নেই। আবার সব ছেলেই পড়তে পেতনা, বাছা-বাছা।

পিথাগোরাসের ইস্কুলের মতো এই সব ইস্কুলের বড় আদর্শ ছিল চরিত্র-গঠন। আমাদের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের মতো। ধর্মযাজকদের মধ্যে তখন ঋষি-চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। লোভ-প্রলোভনকে দমন করতে শেখা তখন বড় আদর্শ। দরিদ্রদের শিক্ষার জন্যও ইস্কুলকে মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে নালন্দাবিহারে শিক্ষায় যে-নীতি অবলম্বন করেছিল, এখানেও তাই।

দ্বাদশ-শতাব্দীতে মানুষের মনে এক নতুন চেতনা আসে। এই যুগকে 'পণ্ডিতের যুগ' (age of scholasticism) বলা হয়। এই যুগের বড় চরিত্র হচ্ছে, যুক্তিবিজ্ঞান এবং তর্কশাস্ত্রের দিকে ঝোঁক। কিন্তু এই সব যুক্তি-প্রবাহ নির্ভর করত কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ চিন্তাকে মেনে নিয়ে। যেগুলো মেনে নেওয়া হ'ল, সেগুলোর পক্ষে কোন যুক্তি থাকল না কিন্তু। কাজেই এই যুগেও চিন্তাধারাতে কোন মৌলিকতা পাওয়া যাচ্ছেনা। সেইজন্যই এই যুক্তিবিজ্ঞান কেবল বুদ্ধির যন্ত্র হিসাবেই পর্যবসিত হ'ল। দর্শনও তাই ধর্মশাস্ত্রকে আঁকড়িয়েই অগ্রসর হ'তে থাকে। আবে ফ্লারে (Abbe Fleury) এবং লক্ (Locke) এইজন্য এই যুগকে তীক্ষ্ণভাষায় আক্রমণ করেছেন। কিন্তু এই যুগপ্রভাবের আওতাতেই আছেন এ্যাবেলার্ড (Abelard), ১০৭৯—১১৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁর বাগ্মিতায় প্যারিসে বহু ছাত্রকে তাঁর কাছে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছিলেন। সে যুগে বই-পত্তর কিছু ছিলনা, কাজেই পণ্ডিতের বাক্‌ভঙ্গিমায় শিক্ষার্থী মুগ্ধ হয়ে ঘিরে ধরত।

শৃঙ্খলাবিধানেও বড় কড়াকড়ি। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দের দিকে এমন নিয়মও পাওয়া গেল যে, শিক্ষার্থীদের চেয়ার-বেঞ্চ ব্যবহার করা চলবে না; কেন? কারণ ঐ উঁচু আসনে বসতে দিলে তাদের মধ্যে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়ে পড়বে। এ ছাড়া তো যষ্টি-প্রহার ছিলই। ঐ সময়ে মেয়েদের প্রতি একটি নির্দেশও পাওয়া যায়: 'প্রত্যেকটি নারীরই কর্তব্য, যদি কিছু শিখে থাকে তা ভুলে যাওয়া, সৎ হওয়া, বিনম্র আর মধুর হওয়া।'

কিন্তু বিপদ আর-এক দিক দিয়ে এল। মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠার হিড়িক। কেবল ফ্রান্সে নয়, সারা ইয়োরোপে।

এই মধ্যযুগে রোমক-শিক্ষা, তাদের জাতিগত সেই বৃত্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে গ্রীকদের মতোই একরকম বর্জন ক'রে বসেছিল। মধ্যযুগে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে ভাষাগত বিভিন্নধরণের সাতটি শিক্ষাকে বুঝত। কারণ শিক্ষা এখনও তো অভিজাতদের জন্যই রয়ে গেছে। ধর্মশিক্ষায় ভাষার জোর বেশী। ধর্মের

সঙ্গে রাজনীতি মিশে যাওয়ায় আইন-কানুন ও বাগ্মিতার শিক্ষাকেও গ্রহণ করবার প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে পাঠক্রম নিরূপিত হচ্ছিল। এইজন্য সপ্ত-সাহিত্য-শিক্ষার অন্তর্গত ছিল শুধু, লাতিন, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র এবং বাগ্মিতা—এই তিনটিকে বলা হত ত্রয়ীশিক্ষা (Trivium) বা ট্রিভিয়াম, আর চার-পাঠক্রমের (Quadrivium) মধ্যে সঙ্গীত, গণিত, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা। এগুলো বিমূর্ত চিন্তার ধারা বেয়ে এবং গতানুগতিক অনুষ্ঠান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হ'ত; বাস্তব জ্ঞান মিশ্রিত বা ধরা-ছোঁয়া যায় এমন ভাবে পড়ানো হ'ত না। উচ্চ-চিন্তার মার্গ থেকে উন্মার্গ-গামী শিক্ষায় তাই এগুলির পরিণতি ঘটে। মানুষের চিত্ত ও কর্মবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশসাধন এতে ঘটত না।

এদিকে সাধারণ কাজে-কর্মের মানুষ কিন্তু থেমে নেই। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, বৃত্তিশিক্ষার জন্য, শিক্ষা দরকার। কাজেই তারা চার্চনিরপেক্ষ হ'য়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠার মতলব করে। সহরের সংখ্যা যেমন বেড়ে যাচ্ছে তেমনি বেড়ে যাচ্ছে জন-সংখ্যা এবং বিপণি আর পণ্য দ্রব্য। প্রাচীন গ্রীসে মিলেটাস, রোডসে এবং টিওসে যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাই এবার কার্যে পরিণত হ'তে চলল। ধাতু, চর্ম, কাঁচ, কাষ্ঠ, এবং প্রস্তর-শিল্প যুগকে অনেক উন্নত করেছে, চাহিদাও বেড়েছে। ধীরে ধীরে এইসব শিল্পে বুদ্ধি এবং নিপুণতার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, বিশেষজ্ঞের স্থান জুটে যায়। এগুলি শেখাবে কারা? বণিকদের সমবেত শক্তিতে গিল্ড-ইস্কুল হ'ল (Guild School)।

গিল্ডের আসল স্বরূপ হচ্ছে—ব্যবসায়ী এবং শিল্প-কারিগরদের সমিতি; এই সমিতি পারস্পরিক ভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, সামাজিক ব্যাপারে সাহায্য করে, উপাসনার সুযোগ জুটিয়ে দেয়, ব্যবসা বাণিজ্যিক নীতি নির্ধারণ করে। সরকারের হস্তক্ষেপ এসব সমিতিতে পড়লেও, এরা স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিতই বলা যায়। কাজ-কর্মের জন্য সাধারণ মানুষও এখানে ধর্না দিতে সুরু করল; সরকার অর্থনীতির এই পরিবর্তন দেখে তাদের কাছে ছুটে এলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই ইয়োরোপে এইরূপ বহু সমিতির অস্তিত্ব ছিল; রাজা এই সব সমিতিকে অনুমোদন করলেন, সাহায্য করলেন। প্রথমে ছিল

বণিক সমিতি (guild merchant) পরে এইগুলো ভেঙে ভেঙে কারিগর সমিতিতে (craft-guild) পরিণত হয়। এইসব কারিগর আবার নানা ভাগে ভাগ হ'য়ে পড়ল, শিক্ষানবীশ (apprentice) বদলী কারিগর (journey-man) এবং বিশেষজ্ঞ (master); কাজেই শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। এইসব সমিতিতে উৎসব অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য নাটক-প্রহসন লেখায় উৎসাহ দেওয়া হ'ত, দাতব্যের ব্যবস্থা ছিল, এবং নিজদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার চেষ্টা করা হল; শিক্ষানবীশদের জন্য ইস্কুল খোলা হ'ল। আর এগুলি ঐতিহ্য এবং আইনে নিয়ন্ত্রিত হ'ত। তবে এখানকার 'মাস্টারে'রাই মাস্টার হলেন অর্থাৎ কারিগরীতে বিশেষজ্ঞ। অভিভাবকেরা পড়ানোর জন্য বেতন দিতেন। ছাত্রদের শপথ নিতে হ'ত যাতে শিল্পের গূঢ়কথা অন্যকে প্রকাশ না করে; নৈতিক চরিত্রের দিকেও নজর দেওয়া হ'ল। শিক্ষাকাল নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হ'ল। শিক্ষকেরা আহার-বিহার পোষাক-আশাক চিকিৎসা-পত্তর সমস্ত কিছুর দিকেই নজর দিতেন, এগুলি সরবরাহও করতেন।

এই সমিতিই পরবর্তীকালে মিউনিসিপালিটিতে রূপান্তরিত হয়। এখন শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা থেকে আরও প্রয়োজন এসে পড়ল হিসাব-নিকাশ রাখার। চার্চ থেকে তাদের বাছাই করা শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়েও লেখা-পড়া সাধারণ নাগরিকের পক্ষেও প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তখনও মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি, কাজেই লেখক বা সেহানবীশদের সুযোগ এসে গেল; তাদের শিক্ষারও প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। পুরোহিতদের আওতা থেকে ছেলে মেয়েদের বাইরে এনে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করবার উৎসাহ দেবার জন্য অভিভাবকেরা সচেষ্ট হলেন। সমাজের মর্যাদা-অতিক্রমণের নিয়ম এখানে আবার দেখা দেয়। মর্যাদা এল অর্থের মাধ্যমে। কিন্তু পড়ানো হবে কোথায়? আছে তো মাত্র চার্চ ল্যাটিনগ্রামার ইস্কুল। ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে সাধারণ নাগরিকের শিক্ষা উপযোগী (সেক্যুলার বা মিউনিসিপ্যাল) ইস্কুল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ড-জার্মাণী থেকে ফ্রান্সেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আলসাসের উত্তরে এবং রোন্ উপত্যকায় মিউনিসিপাল ইস্কুল স্থাপিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। চার্চ প্রথম খুব বাধা দিল, বাধা একেবারে ব্যর্থ

হয় নি—কিন্তু কিছু কিছু এই ধরণের ইস্কুল পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্যন্ত বেঁচে ছিল। নানা অপ্রত্যক্ষ এবং কর-চাপের অত্যাচারে বেশীরভাগ মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলই বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু শিক্ষাদানের রীতি-নীতি সম্পর্কে এই যুগে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত দেখা গেল। শিক্ষাবিদ শিক্ষার কঠোরতার বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করলেন। এঁদের মধ্যে (Gerson) গ্যার্‌সঁ (১৩৬৩-১৪২৯), (Erasmus) এরাসম্যুস (১৪৬৭-১৫৩৬), (Rabelais) রাবেলে (১৪৯০-১৫৫২) এবং (Montaigne) মঁতাইন্‌ (১৫২৩-৯২) অন্যতম। গ্যার্‌সঁ বললেন, শিক্ষা প্রচলিত এবং ব্যবহৃত ভাষাতেই হওয়া উচিত ; শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি ধীর-স্থির, এবং স্নেহশীল হবেন ; অর্থাৎ প্রাথমিক এবং একান্ত গুণ শিক্ষকের হবে ছাত্রদের প্রতি পিতার মতো ব্যবহার করা ; ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভীতি অপেক্ষা আদরেই বেশী বশ্যতা স্বীকার করে। স্নেহেই তার শক্তি জাগে। তিনিই বললেন, শিশুরা চারাগাছের মতো বড় পেলব আর লঘু, কাজেই বাইরের নানা বিরুদ্ধ প্রভাব থেকে তাদের সযত্নে রক্ষা করতে হয়। শিক্ষকেরা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না, তাদের বেত্রাঘাত করবেন না। তারা যে-ভাবে বোঝে সেই পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেই পড়ানো উচিত। গ্যার্‌সঁ গ্রীকদের স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে শিক্ষার কথা বললেও, কেবল খেলাধুলাতেই তাদের ছেড়ে দিয়ে শিক্ষককে পেডাগগদের মতো নীরব দর্শক ক'রে ছাড়েন নি।

এরাসম্যুস আর রাবেলে স্নেহময় শৃঙ্খলাবিধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য চর্চার কথাও অনুমোদন করেন ; মঁতাইন পণ্ডিতদের কচকচি নিবৃত্ত করে ছেলেমেয়েদের মনে যুক্তি সমন্বিত সূক্ষ্মবিচার বোধ সৃষ্টি করতে বলেন। এরাসম্যুস যদিও গ্রীক ভাষা এবং প্রাচীনত্বের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তবু তিনিই দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'আমরা যাদের ভালবাসি তাদের কাছ থেকেই গভীর আগ্রহে শিক্ষাকে গ্রহণ করি।' তাঁর মধ্যে চরিত্রগঠনের শিক্ষাটিই প্রধান স্থান পেল। চতুর্দশ শতকে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা-এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল ; এ বিষয়ে একজন নাইট্—শ্যভালিয়ে দ্য লা তুর-লঁদ্রি (Chevalier de la Tour-Landry)—সাপের পাঁচ পা দেখে, মেয়েদের একেবারে পুরুষের ঘরোয়া

হ্লাদিনীশক্তি এবং পুরুষের যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করবার মতো ক'রে গড়বার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এরাসমুস এই তত্ত্বেও জোর আঘাত ক'রে প্রচার করলেন, পুরুষদের মতো তাদেরও সবকিছুর সমান অধিকার দিতে হবে। তিনি বললেন, "সভ্য মেয়েদের প্রচলিত আচরণ শুনুন; তারা শিখেছে শুধু মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করা, দু' হাত জুড়ে হাত দুটিকে শায়েস্তা রাখা, হাসির সময় ঠোঁট কামড়িয়ে হাসির ভাণ করা, খেতে দিলে আহার এবং পানীয় 'কণিকামাত্রেণ' ক'রে গ্রহণ করা; অথচ বাড়ী গিয়ে লোকের আড়ালে 'গোগ্রাসে' এবং শুশুকের মতো ঐগুলি দিয়ে উদর থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত পূর্তি করা! এগুলো কী অসভ্যতা মশাই! এর চেয়ে তাদের লেখাপড়া শিখতে দিন, পণ্ডিতদের আলোচনা শুনতে দিন, তাদের উপর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার ছেড়ে দিন।" অবশ্য এরাসমুস মানবিকতার এত বড় প্রচারক হ'লেও মাতৃভাষার শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভালো ছিল না। তিনি ভাবতেন মাতৃভাষা শিক্ষা কঠিন নয়, এগুলি এমনিতেই হয়ে যায়।

রাবেলেকেই বলা যায় শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রথম বস্তুতন্ত্রবাদী। তিনিও পণ্ডিতদের কচকচির বিরুদ্ধে। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞান চর্চার কথা বলেন। আশে-পাশের জিনিসগুলো দেখ হে ছাত্রবন্ধু, পুরুষোচিত গুণ নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে ফের, দেখবে তোমার নিজের মনোবিকাশ কেমন সুষমভাবে ঘটবে। 'পাতালপুরীর বন্দিনীধাতু মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল'—এমনি কথার মতো। তাঁর নতুন শিক্ষায় শিক্ষক ছাত্রকে বেশ ক'রে পর্যবেক্ষণ করবেন, তার মনের গতি-নির্ণয় করবেন; তার মনের ইচ্ছা জেনে পাঠনা সুরু করবেন। তাঁর শিক্ষককে জানতে হবে, 'প্রকৃতি কখনও বৈপ্লবিক কাণ্ড না বাধিয়ে হঠাৎ কোন পরিবর্তনকে সহ্য করে না।' অর্থাৎ 'ধীরে, রজনী, ধীরে।' এমনি ক'রে রাবেলের কল্পিত শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক শিক্ষা দিয়ে পূর্ণ মানুষ ক'রে তুলে থাকেন। তবে রাবেলেও গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি প্রাচীনভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী। কাজেই গ্রীকশিক্ষার প্রভাব তাঁর মধ্যে বেশী মাত্রায়। এমন কি

"তাস খেলতে খেলতে অঙ্ক শিখবে ছাত্র," "খেতে খেতে গল্প করতে করতে শিক্ষাগ্রহণের কাজ সমাধা হবে।" ইত্যাদি।

রাবেলে আর এরাসম্যুস-কে যদি দুই প্রান্তে রাখা যায় – মানবিকতা এবং বস্তুতান্ত্রিকতা—তবে মঁতাইনকে স্থান দিতে হয় এই দুইয়ের মাঝখানে। রাবেলে সমস্ত রকমের শিক্ষা, ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান স্বাস্থ্যচর্চা, সব একসঙ্গে একই রকমের প্রাধান্য দিয়ে শরীর-মন-নীতি-ধর্মের বিকাশ সাধন করতে বলেন; কিন্তু মঁতাইন ঐসব বিষয়বস্তুকে এবং মনোগত প্রবণতাকে এমনভাবে নির্বাচন ক'রে নেওয়ার পক্ষপাতী যাতে শিক্ষার্থীর বিচার-বোধ জন্মে, সুস্থমন-টুকুরই বিকাশ-সাধন করা যায়। তাঁর ধারণা বহু বিষয় মাথায় পূরে দেওয়ার চেয়ে সুন্দর ক'রে মাথাটিকে তৈরী করাই বিধেয়। অনেক বিষয় জানানোর চেয়ে এমন বিষয়গুলি জানানো ভালো যাতে তার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ হজমশক্তি নষ্ট না ক'রে খেতে দিতে হবে। মঁতাইন সংযম এবং নিয়ন্ত্রণকে শিক্ষা-বিষয়বস্তু নির্বাচনে গ্রহণ করলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি 'সুজন' সৃষ্টি করতে চান, 'জন' নয়। এইজন্য তিনি 'বিশেষ' (Special) বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে 'সর্বগ' (general) শিক্ষার পক্ষপাতী। কাউকে বিশেষজ্ঞ তৈরী করার চেয়ে কাউকে সুন্দর ক'রে তৈরী করা ভালো। বৈষয়িকতার চেয়ে ব্যবহারিকবাদ তাঁর কাছে বড়। রাবেলে শিক্ষায় হয়ত চান 'সংবাদ জানা', কিন্তু মঁতাইন চাইছেন 'এই বিষয় প'ড়ে আমি কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, কেন পড়লাম' এইটিই বুঝতে শেখা। কাজেই মঁতাইন পুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষা বিশেষ পছন্দ করতেন না, তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে নিজের কাজে লাগানো। কিন্তু এত সত্ত্বেও মঁতাইন যেন শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব সাহসী ছিলেন না; কোথায় যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। তারই জন্য তিনি মেয়েদের শিক্ষাব্যাপারে খুব সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন, এরাসম্যুসের মতো অতখানি এগিয়ে যাওয়ার কথাই নেই, বরং মেয়েদের অজ্ঞতার মধ্যে রাখা উচিত এইরকমই একটা সুর পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, মেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই কতগুলি গুণ থাকে, সেইগুলিই কার্যকালে প্রকাশিত হয়; কাজেই এই স্বভাব-গুণটিকে পুস্তক-গত গুণ দিয়ে চাপা দেওয়া

উচিত নয়। মেয়েদের কেন, সবার ভেতরই এই সহজাত গুণকে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ সব সময়েই আছে, প্রয়োজন বোধে স্যুইচটা টেপ, দেখবে আলো এসে গেছে, আবার অন্যটি টেপ হাওয়া পেলে, তৃতীয়টি রেডিওতে গান গেয়ে উঠল। চতুর্থটা টিপেছ নাকি? ঐ দেখ স্টোভ জ্বলছে। ভাবছি বিদ্যুৎসরবরাহ কেন্দ্রের পাওনা দেওয়ার মতো যদি ক্ষমতা না থাকে তবে ম'তাইনের মতো ভদ্রলোকেরা কি করবেন।

যাই হোক ফ্রান্সের শিক্ষারাজ্যে এইরকম নানা তরঙ্গ এসে ধাক্কা দিচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষাব্যাপারে রাষ্ট্র উদাসীন থাকতে পারে না। তাছাড়া জার্মানীতে লুথার এবং অন্যান্য দেশের প্রোটেস্টাণ্টেরা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তীব্র আন্দোলন করছেন। এ অবস্থায় ফ্রান্সের কি করা উচিত?

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে অর্‌ল্যাঁ স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের (The states General of Orleans) একটা প্রস্তাব পাওয়া গেল "চার্চের আয়ের উপর একটা কর ধার্য করা হোক, যাতে প্রত্যেক সহর এবং গ্রামে দেশের অভাবগ্রস্ত ছেলেদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ নিয়োগ করা যায়; এবং সমস্ত অভিভাবককে নির্দেশ দেওয়া হোক যে তাদের ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাতে হবে, অন্যথায় তাদের আইন সম্মত জরিমানা দিতে হবে; এবং রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে অভিভাবকদের এই আইন পালন করতে তারা বাধ্য ক'রে।" এ ছাড়াও একটা দাবী করা হ'ল যে, ধর্মসম্পর্কীয় যে সব বক্তৃতা হয়, তা যেন মাতৃভাষাতেই দেওয়া হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রোটোস্টাণ্টদের এই গণতন্ত্রী দাবী এবং প্রস্তাব রোমান-ক্যাথলিক অধ্যুষিত ফ্রান্স স্বীকার করল না। তারপর প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদ এদেশে ব্যর্থ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপার সাত হাত জলের তলাতে চলে গেল। ভাবতে বিস্ময় লাগে এই ষোড়শ শতাব্দীতেই ফ্রান্সে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক আন্দোলন উঠতে পেরেছিল। দিদেরো (Diderot) এই আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে একটা কারণ খুঁজে বলেছিলেন, ফ্রান্সের অভিজাতদের মুখে প্রায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায়; বোধ হয় তাদের প্রধান আক্ষেপ এই যে, পড়তে না-জানা চাষীর চাইতে পড়তে জানা চাষীকে প্রবঞ্চিত এবং

নিপীড়িত করা কঠিন! এই ভারতবর্ষেও গোখেল 'বিল' নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে আপত্তির এই কারণটির কথাই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু এ ব্যাপারে ধর্ম-জগত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। উপাসক-সম্প্রদায়ের উপর আঘাতটি আরও প্রবল বিক্রমে না আসে তার জন্য জেস্যুইট এবং জ্যানসেনিস্ট (Jesuits & Jansenists) সম্প্রদায় শিক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। জে. বি. ড. লা সাল (১৬৫১-১৭১৯) খৃষ্টসম্প্রদায়ের জন্য ইস্কুল খুললেন। কিন্তু এই ধার্মিকতার শিক্ষায় জনসাধারণের মধ্যে খুব সাড়া পাওয়া গেল না। ১৯০৪ সালের ৭ই জুলাইয়ের আইনে পরবর্তীকালে এই সব সম্প্রদায়গত শিক্ষাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সব সম্প্রদায়গত শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালালেন ফ্রান্সের জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ ফেনলোঁ (১৬৫১-১৭১৫)। মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মঠের শিক্ষাকে তিনি নাকচ করেন। তাঁর মতে খৃষ্টধর্মে শিশুর মনোবৃত্তিকে দুভাবে চিত্রিত করা হয়; (১) শিশুরা স্বভাবতই পাপের দিকে ধাবিত হয়, এবং (২) স্বভাবতই শিশুরা সুন্দর এবং কোন একটা বিষয়ে তাদের লিপ্ততা নেই অর্থাৎ সচল। এ অবস্থায় প্রথমটিকেই আঁকড়িয়ে শিক্ষা দেওয়ার কোন হেতু নেই। ফেনলোঁ (Fenelon) তাই দ্বিতীয় চিত্রটি সামনে রেখে শিশুকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু শিশুরা বড় ক্ষীণজীবী, শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল, কাজেই জন্মের প্রথম অবস্থা থেকে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা উচিত। তিনি বলতেন, "শিশুর মন কেমন জান? খোলা হাওয়ায় সলতে জ্বালালে যেমন তার শিখা কখনও স্থির থাকে না, তেমনি।' কাজেই ওদের মনঃসংযোগ বাড়িয়ে দিতে পারলেই ওরা বুদ্ধিমান হবে। প্রকৃতি-অনুসারী শিক্ষা দাও সব ঠিক হয়ে যাবে, প্রকৃতির উপর জোর ক'র না। তাদের মনঃসংযোগের অভাব আছে? ভয় নেই, তাদের সেই সঙ্গে ঔৎসুক্যও আছে; ঔৎসুক্যই মনোযোগের অভাবকে কাটিয়ে নেবে; শিক্ষা কখনও চাপিয়ে দিও না, শিক্ষা দিয়ে তাকে উসকিয়ে দাও; কোন নীতি দিওনা, বিধান দিওনা, তাকে 'আদর্শ' (model) দেখাও।' আরও বলেছেন, 'সমস্ত শিক্ষাকার্যই যাতে মনোজ্ঞ হয়, সেই দিকটা নজরে রেখ; তাদের মনের একটু

স্বাধীনতা দাও না কেন; ওদের রুচি অনুযায়ী পড়িয়ে দেখনা কেন কোন ফল পাওয়া যায় কি না।' এইজন্যই ফেনলোঁর শিক্ষা পাঠক্রমে বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হ'ত; কোনটি যদি কোন শিক্ষার্থীর ভালো না লাগে তবে অন্যটির দিকে তাকে নিয়ে যেতেন। এইভাবে ফেনলোঁর পরিশ্রমে তৎকালে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বড় বড় শিক্ষাবিদ দেখা যেতে লাগল। মেয়েদের জন্যও ইস্কুল খোলা হ'তে লাগল।

কিন্তু এসময়ের ইস্কুল স্থাপনার মধ্যে কোন একটা পরিকল্পনা ছিল না; প্যারিসের আশেপাশের সহরে এবং সহরতলীতে হয়ত অনেক ইস্কুল, কিন্তু ব্রিটানী বা দেশের মধ্যভাগে কোন ইস্কুলই নেই। তাছাড়া ইস্কুলের শিক্ষায় খুব উন্নতি দেখা গেল না, কারণ শিক্ষকদের মধ্যে খুব ভালো শিক্ষক পাওয়া যেত না। ইস্কুল-শিক্ষকেরা আবার রুজি-রোজগারের জন্য অন্য কাজ করত। বেতন তো কম ছিলই, তা ছাড়া সবাই আবার বেতন না দিয়ে মূল্য হিসাবে জিনিষপত্র দিয়েই সারত। কাজেই তারা বিকল্প বৃত্তি হিসাবে কেউ তাঁত বুনত, কেউ কাঠের কাজ করত, কেউ মালী কেউ বা কারিগরী। গির্জার ইস্কুলের শিক্ষককে পড়ানোর কাজের চাইতে গির্জার কাজে—এই যেমন উপাসনার সময় ঘণ্টা দেওয়া, মোমবাতি ধরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকলেই চলে যেত। তবে তাদের উপর বিধিনিষেধ ছিল অনেক, যেমন: চুল তারা ছোট ক'রে ছাঁটবে, যে-অঞ্চলে কাজ করে সে-অঞ্চলের কোন রেস্তোরাঁয় তারা আহার পানীয়ের জন্য যাবে না, প্রকাশ্যে বেহালা বা বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না, প্রকাশ্যে কোন নৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না, সন্ধ্যাবেলাকার কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবে না। আর যদি যাও, চাকরী যাবে, ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো হবে। কাজেই কেইবা পড়াবে আর কেইবা পড়তে যাবে। ছাত্র সংখ্যাও কম, শিক্ষকও খরগোষের মতো উৎকর্ণ, কিন্তু ছুঁচোর মতো চটপটে; তাদের মধ্যে কেবল পিঁপড়েগুলো মারা পড়ত। গাঁজা টানলেই যেমন সাধু হওয়া যায় না, তেমনি শিক্ষকের "যোগ্যতাবলী" থাকলেই শিক্ষক তৈরী হয় না।

এই সময় দেকার্তের দর্শন শিক্ষাজগতেও আলোড়ন আনল। দেকার্ত (Descartes) ছিলেন জেস্যুইট সম্প্রদায়ের লা ফ্লেশ (La Fleche)

কলেজের ছাত্র। দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) শিক্ষা সমস্যা নিয়েও অনেক ভেবেছেন। জেস্যুইটদের বন্ধ্যা শিক্ষা-প্রণালীই তাঁকে এইদিকে মনোযোগী ক'রে তোলে। তিনি প্রাচীনভাষা শিক্ষার বিরোধী নন। তবু তিনি স্বীকার করেন না যে, লাতিন বা গ্রীক শিখলেই বুদ্ধির উৎকর্ষতা সাধন হয়। জীবন-যাত্রা আর চিন্তার মৌলিকতার জন্য তিনি শিক্ষাকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, সুস্থ এবং জ্ঞানগর্ভ মন তৈরী হ'লেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় না, তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা দিতে হবে ; মানুষের সহজাত বোধই সব নয়, তাকে ঠিক পথে পরিচালনা করা দরকার। তিনি বলতেন, তুমি 'জানিনা' বলেই কোন কিছুকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিও না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে তবে স্বীকার করবে ; এবং যা পরিষ্কার ভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে দেখানো হ'ল, যার বিরুদ্ধে তোমার আর কোন সন্দেহ নেই, তাকে মনের অহমিকার দরুণ পরিবর্জন ক'রো না।

কেবল দেকার্ত নয়, ইংল্যাণ্ডের ল'কের (১৬৩২-১৭০৪) প্রভাবও এই সময় এদেশে এসে পড়ল। আবার ফেন্‌লোঁর কাল থেকে মেয়েরাও শিক্ষা ব্যাপারে বেশ নেমে আসছেন ; মাদাম দ্য লাফ.য়েৎ (Madame de Lafayette) মাদাম্ দাসিয়ে (Madame Dacier), মাদাম স্য সেভিনে (Sevigne) শিক্ষা-ব্যাপারে বেশ একটা সাড়া জাগালেন।

আর আছেন রোলঁ্যা (১৬৬১-১৭৪১)। রোলঁ্যা (Rollin) অবিবাহিত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কম। কাজেই কুইন্টিয়ান আর ফেন্‌লোঁর লেখা থেকে তিনি শিশু এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নির্দেশ নিয়েছেন। তবে তাঁর কীর্তি হচ্ছে, ফরাসী ভাষা, মাতৃভাষার দিকে শিক্ষার মোড়-কে ফেরানো। প্রধানত তিনি প্রাচীনভাষা চর্চা নিয়েই থাকতেন। তবু তিনিই বললেন, বড় লজ্জার কথা যে, আমরা আমাদের ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞ ; আর সত্য ফঁাস করতে হ'লে বলতে হয়, আমরা সরবে স্বীকার ক'রে থাকি, 'উচ্চ মাতৃভাষা আমরা পড়ি নি'।

এরই মধ্যে এল রুশোর 'এমিল্' (১৭৬২) ; শিক্ষা সম্পর্কে একটা বিপ্লববাদ নিয়ে যেন প্রকাশিত হ'ল এমিল্ (Emile)। রুশো কতখানি পূর্ববর্তী

লেখকদের অনুকরণ করেছেন, কতখানি পরের কথা নিজের ব'লে চালিয়ে দিয়েছেন, কতখানি প্রভাব লক, দেকার্ত, ফেন্‌লোঁ তাঁর মধ্যে ফেলেছে, আবে দ্য সাঁ পিয়ের (Abbe de Saint Pierre) বা ক্রুজা (Crousaz) তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার নেই; আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি জোরালো ভাষা, শিশুর সদ্‌বৃত্তি, সমাজের অন্ধতামসিকতা পরিবর্জন, প্রকৃতি-অনুসৃতি এবং নেতি-অভ্যাসগঠনের মধ্য দিয়ে রুশো তাঁর শিক্ষাদর্শনকে দেশের সামনে যেভাবে তুলে ধরলেন, তাতে কেবল ফ্রান্সেই নয় ইয়োরোপের সর্বত্রই একটা বিপ্লব ঘটে গেল। আর ফ্রান্সের সমাজ জাতীয়-শিক্ষা, গীর্জা-বর্জিত শিক্ষা, লৌকিক শিক্ষার জন্য যেন ফেটে পড়ল। এর পর ১৭৮৯ এর বিপ্লব। কিন্তু তার আগে আমরা রুশোর শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করে নিই। কারণ পরবর্তীকালের শিক্ষাবিদদের উপর এঁর প্রভাব অসীম।

আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক না বলা গেলেও রুশোকে (১৭১২-১৭৭৮) আধুনিক শিক্ষার প্রবক্তা হিসাবে নিশ্চয়ই গণ্য করা যায়। তিনি তদানীন্তন কালের শিক্ষার রুদ্ধপ্রবাহকে মুক্ত ক'রে দিলেন। ইয়োরোপে ঠিক এত বড় একটি বিপ্লবীরই প্রয়োজন ছিল। রুশোকে শিক্ষার বিপ্লব-সাধকই বলা যায়, কারণ বিপ্লবী তিনিই হ'তে পারেন যিনি কোন সমস্যার সর্বদিক না ভেবে সেই সমস্যার মূলকেই সবশুদ্ধ উৎপাটিত করতে চান। রুশো, প্রাচীন শিক্ষার মূল ধ'রে নাড়িয়ে গেছেন, তার ভালোর দিকে তাকান নি; কারণ, তিনি জানতেন প্রাচীনত্বের একটি বড় যুক্তিই হচ্ছে, সে কিছু না কিছু গুণের অধিকারী হয়; আর সেই গুণটিই সমাজের মনে একেবারে চেপে বসে। এই জন্যই রুশোর বক্তব্য আজকে কতখানি মানব আর কতখানি মানব না, তা ভেবে দিশেহারা হ'তে হয়। এইজন্যই তাঁর মধ্যে আপাতবিরোধী যুক্তি বহুলাংশেই দেখা যায়।

রুশোর সময়ে শিক্ষার রীতি কি কি ছিল, তা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে তিনি কোন্ কোন্ দিকে আঘাত হানতে চান। মূলত তখন দুটো দিক স্পষ্ট ছিল: (১) পণ্ডিতদের বা বুদ্ধিজীবীদের একটা আন্দোলন—এই আন্দোলনের ফলেই গ্রীক এবং লাতিন সাহিত্য সংস্কৃতির একটি বড় উৎস হ'য়ে

পড়ল ; এই জন্যই বুঝি নীতিশিক্ষা আর হেতুবিদ্যার স্থান অনেকাংশে থাকল, (২) সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু সংবাদ মুখস্থ করবার প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। প্রচলিত ধারণা ছিল, মানুষ মন্দ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। রুশো ঠিক উলটো বললেন ; সৃষ্টিকর্তার হাত থেকে যা আসে তাই-ই ভালো, মানুষের হাতে এসেই সেগুলো খারাপ দাঁড়িয়ে যায়, (Everything is good as it comes from the hands of the Creator ; everything degenerates in the hands of man)। শারীরিক দিক দিয়ে ছেলেদের কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হ'ত না ; আর রুশো বলেন, দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেই তারা সুস্থভাবে বাড়তে শেখে। নীতিশিক্ষার অস্ত্র ছিল--শাস্তিপ্রদান আর উপদেশ বর্ষণ ; রুশোর মতে, ও দুটিই ছেলেদের চরিত্রকে নষ্ট ক'রে দেয়। তারা শব্দ শিখত, চিন্তা করতে শিখত না, তারা অনেক জ্ঞান আয়ত্ত করত কিন্তু তা ব্যবহার করতে জানত না।

এই ভাবে শিক্ষার স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে গেল ; শিক্ষায় উন্নতি ঘটানোর কোন সম্ভাবনা ছিল ব'লে যেন কেউ ভাবতে পারত না ; রুশো একটি গতি সংযোজন করলেন, আশা পোষণ করবার একটা প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দিলেন।

কিন্তু রুশো এমন ক'রে ভাবতে শিখলেন কি ক'রে ? প্রথম উপায় হচ্ছে, তাঁর মনোগঠন ; রাজনীতি আর শিক্ষানীতিকে তিনি 'সমগ্র-এক' হিসাবে দেখেছেন। তাছাড়া, ঐযে যৌবনে তাঁকে 'নানাস্থানী' হ'তে হয়েছে—ওতেই তিনি ফরাসী কিষাণদের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশবার সুযোগ পেয়েছেন, আর তখনই বুঝতে পেরেছেন—ফরাসী সমাজ যেন পাপাচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'শিক্ষা'-কেও পেয়ে গেলেন। তাঁর ধারণাই ছিল তৎকালীন সভ্যতার গলদ হঠাৎ বা দৈবক্রমে ঘটেনি, ঘটেছে তার মজ্জাগত এবং চারিত্রিক ত্রুটির জন্য। এই থেকেই তিনি উন্মত্তের মতো সমাজকে আঘাত করতে লাগলেন, সেখানে তিনি কোন বাধা মনেন নি, তাঁর উক্তিকে মোলায়েম করতে চাননি। এমনি ক'রেই সমাজবর্জিত প্রকৃতির কথা ভাবতে সুরু করলেন। মানুষ তো স্বভাবত রাজনীতি-করিয়ে নয়, তাকে রাজনীতি

করতে হয় তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে, সেই তাগিদেই সে সামাজিক জীব ; কাজেই তার সন্তানও তেমনি জন্ম থেকেই অ-সামাজিক ; তবে যেসব প্রবণতা আপাত দৃষ্টিতে সমাজীয় ব'লে মনে হয় ওগুলো রুশোর মতে, আত্ম-পূজারই নামান্তর ; আর এই সন্তানই সামাজিক হবে—তার পূর্ব-পুরুষ যে কারণে হয়েছে ঠিক সেই কারণেই। কাজেই শিশুর প্রকৃতি কি? সমাজ-ব্যক্তির প্রকৃতি কি? এখান থেকেই রুশোর প্রকৃতি-বাদের একটা সূত্র পাওয়া যায়।

রুশোর মনোবিদ্যার জ্ঞান আরিস্ততলের ধারাকে অতিক্রম করতে পারে নি। কতগুলো ফ্যাকালটি (Faculty) বা মানসিক শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন ; তবে এই শক্তি বয়সের বিভিন্ন সময়ে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এইটিকেই অগ্রাহ্য করবার এক প্রবণতা দেখা গেল। বোধহয় তৎকালে মনকে এই সরল শক্তি-গোষ্ঠীতে ভাগ করে দেখাই সহজ ছিল। রুশো এইখান থেকেই বলতে চাইলেন, যুক্তি আর প্রক্ষোভের দিক (Reason & emotions) বয়সের বিশেষ বিশেষ সময়ে উদ্ভব হয় ; যেমন বার বৎসর বয়সে প্রক্ষোভ, আর পনেরা বছরে যুক্তির দিক দেখা যায়। তাঁর মতে, ছেলেদের এই বয়স না হওয়া পর্যন্ত ঐ দুটো দিকের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে না। এই জন্যই তিনি 'এমিলের' পাঁচ থেকে বার বছরের শিক্ষায় সাধারণ গ্রন্থ-অধ্যয়ন বাদ দিতে বলেছেন।

কিন্তু এখানে বোধহয় তাঁর ভুল ঘটে গেল। কারণ এমিলের ১২ থেকে ১৫ বছরের শিক্ষায় তিনি বলেছেন, এখন থেকে সে নৈতিক আদর্শের কথা ভাববে, এই নীতির দিকই তার ভালো-মন্দ বাছাই করতে শেখাবে ; তারপর আসবে প্রয়োজন থেকে প্রয়োজনীয়তাবাদ। অর্থাৎ তাঁর মতে, শিশুরা প্রথম অবস্থায় যেমন মোটর-শক্তি অর্থাৎ কাজের উৎস রূপ, তারপর কৌতূহল-রূপী, আর এই কৌতূহলকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে, এই ১২ থেকে ১৫ বছরে বিচারশক্তি আর সমাজ-শক্তির কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারবে। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, মানুষ যুক্তি-কে ব্যবহার করেই যুক্তিবাদী ; সমাজের প্রতি অনুভবশক্তি বাড়িয়েই সমাজীয় কাজের হয়! তা যদি হয়, তবে কি তারা ঐ বয়সে ঐ দুটো একেবারে হঠাৎ-পাওয়া গোছের ক'রে ব্যবহার করবে!

এইভাবেই রুশো প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, শিশুদের বয়োবৃদ্ধি এবং সেই বয়সের উপযুক্ত মানসিকশক্তিকে বিকশিত হওয়ার অপেক্ষা না ক'রে তার মনের উপর কর্তা সেজে কতগুলো চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর ; ওতে আলোকপাত তো হয়ই না, বরং কৃত্রিম আলোর তাপে তারা কুঁকড়ে যায়। ঐভাবেই কুসংস্কার আসে, ঐভাবেই 'বেদে যা বলেছে' ভাবটি এসে পড়ে। এই জন্যই এমিলের প্রথম-শিক্ষায় তিনি বলেন, "তার রাজ্য থেকে 'আদেশ' 'পালন কর' প্রভৃতি কথার নির্বাসন ঘটাও ; শুধু তাই কেন, 'কর্তব্য' এবং 'বাধ্যতামূলক' কথা দুটিও ; ওর বদলে বরং ব্যবহার কর 'প্রয়োজন' 'অসম্ভব' 'অক্ষমতা' প্রভৃতি কথা। আর যদি এ না করা যায়, তবে তাদের যুক্তি-শক্তি পরবর্তীকালে ব্যাহত হবে। সেই কথাই পনেরো বছরের পরের এমিলের শিক্ষায় বলেছেন। তিনি বলেন, শৈশবে বই চাপিয়ে তাদের আমরা মৃতবৎ ক'রে রাখি, আর তাই তারা উদ্বিগ্নতাকে বিসর্জন না দিয়ে পড়াশুনা করে। শিশুদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপরই শিক্ষাকে ছেড়ে দিতে বলেছেন। প্রথম শিক্ষায়, তা হ'লে, কোন ধর্ম বা পুণ্য বা ভালোবৃত্তি অনুশীলন করতে না ব'লে, তাদের মধ্যে যাতে কোন অন্যায় না আসতে পারে তার দিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই-ই বোধ হয় রুশোর নেতিবাদের মূল মন্ত্র। তাঁর মতে, তাই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবে নেতি-শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ কোন ধর্ম-নীতি বা সত্যকে শিখিয়ে নয়, অন্যায় কর্ম থেকে তাদের মুক্ত ক'রে। 'শিশুর শরীর চর্চা করাও, তার ইন্দ্রিয়-কে শাণিত কর, তার মানসিক শক্তিকে জাগাও ; কিন্তু মন-কে ক'রে দাও নিষ্ক্রিয়, বিমুক্ত, যতটা এবং যতক্ষণ সম্ভব।' শিশুর মনোগঠনকে জেনে শিক্ষা-পরিচালনা করাই রুশোর অভিমত। শিশুদের কোন কিছু করবার দিকে আদেশ দেওয়া উচিত নয়। তাকে শুধু বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে দুর্বল আর বয়স্কসমাজ সবল ; বয়স্কের অনুকম্পার উপর নির্ভরই তাকে করতে হবে ব'লে সে বুঝতে শিখুক ; এই ভাবেই, রুশোর মতে, শিশু ধৈর্যশীল হবে, খোশ-মেজাজী হবে, সদাচারী হবে। তাকে প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তাকে বাঁচানো উচিত নয়, ওতে সে বাঁচতে শেখেনা। রুশো বলেন, কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সে দায়িত্ব

নিতে শেখে না, সে দায়িত্ব নিতে শেখে অবস্থা-বিপাকে। 'প্রাণ রাখিতে তার প্রাণান্ত' ক'রো না।

এ ছাড়া, রুশো শিশু-শিক্ষায় কর্মেন্দ্রিয়কে সজাগ করার কথা বললেন। তিনি বললেন, শিক্ষা সুরু হয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, কথা বলার আগে, বুঝবার আগে। আর সেই যে অভিজ্ঞতা তাই হচ্ছে শিক্ষার প্রাক্-স্তর। যে মুহূর্তে মা-কে চিনতে পারল সেই মুহূর্তেই তো তার শিক্ষা ঘটে গেল। তাদের প্রথম শিক্ষা আসে প্রক্ষোভের দিক থেকে; সুখ আর দুঃখ অনুভূতিই তারা প্রথম প্রত্যক্ষ করে। এই অনুভূতি-প্রত্যক্ষই সাহায্য করে তাকে বাইরের বস্তু প্রত্যক্ষ করতে। যখন বস্তু দেখতে শিখল, তখনই তার কৌতূহল বাড়ল। নতুন বস্তুর প্রতি তার কৌতূহল বেড়ে চলে। আর ভয় বাড়বে যদি সেই বস্তুকে সে চিনতে না পারে; কাজেই বস্তুর সান্নিধ্যে এনে তার অপরিচয়ের এলেকাকে সঙ্কীর্ণ করে দিতে হবে। সুন্দর, কুৎসিত, অভাবনীয়—সব বস্তুই সে দেখুক। মনে রাখতে হবে, অতি-শৈশবে স্মৃতি এবং কল্পনা তার আসে নি, তাই সে মনোযোগ দেয় সেই জিনিসের প্রতি যা তার সুখ-দুঃখ প্রক্ষোভকে জাগাতে পারে। আর, এই সংবেদন-জ্ঞানই তার ভাব-বস্তুর উপাদান। কাজেই যে-বস্তুকে আশ্রয় ক'রে তার সংবেদন জ্ঞান জন্মাবে তা বে-নিয়মিত হ'লে চলবে না, তাকে বেশ নিয়মিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবার যা দেখে সে তাই-ই স্পর্শ করতে চায়, শুঁকতে চায়। অমনি ক'রেই সে বিষয়ের ভার, বর্ণ, ধর্ম, উত্তাপ, শৈত্য বুঝতে শিখবে।

পরবর্তীকালে এই ইন্দ্রিয়-শক্তির কেবল অনুশীলন করলেই চলবে না, ঠিক ঠিক ভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করবার ব্যাপারে এগুলি নিয়োগ করতে জানা চাই। অঙ্কনবিদ্যায় শিক্ষার ব্যাপারে এই ক্ষমতার অনুশীলন করা ভালোভাবে যায় ব'লে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

এমনি করে রুশো শিশু-কালের শিক্ষার কতগুলি নীতি জানালেন, যা পরবর্তী কালে ইয়োরোপের শিক্ষাব্রতীদের ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা রুশোর কর্ম-মাধ্যমের শিক্ষাকে (শরীর এবং মনের কর্মচাঞ্চল্যের দিক) অনেকেই গ্রহণ করলেন। এই নীতিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়: (১) মন যখন বুদ্ধি-

সম্পন্ন জ্ঞানের কাজ করতে সক্ষম তখনই বুদ্ধি-প্রধান জ্ঞানের শিক্ষা চলে ; (২) বুদ্ধি-সম্পন্ন জ্ঞানের শিক্ষা পুষ্ট হয় ব্যবহারিক ভাবে তার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে ; (৩) হস্তশিল্প বিজ্ঞান-শিক্ষার বিরোধী হয়েও বুদ্ধি-প্রধান কাজের সহায়ক ; (৪) শরীর-চর্চা, খেলাধূলা এবং হস্তশিল্প কর্মেন্দ্রিয়কে শাণিত করে, আবার তাই বুদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয় ; (৫) প্রথম থেকেই যদি ফল-টা কি হবে তা দেখানো যায় তবে ছেলেরা হাতের কাজে আনন্দ পাবে, তারপর সেই কাজের কলা-কৌশল ধীরে ধীরে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শেখাতে হবে ; (৬) শ্রমের কাজে চিন্তা-অভ্যাস জন্মায়, জগতের সমস্যা বুঝতে পারা যায়, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা তেমন শিক্ষা পায় না।

এই নীতিগুলো ছাড়াও রুশোর শিশুর-প্রতি-সহৃদয় হওয়ার নীতিও গৃহীত হ'ল ; গৃহীত হ'ল স্বভাব অনুযায়ী শৃঙ্খলা বিধানে।

তবে একটা কথা জিজ্ঞাস্য থাকে ; রুশো সব শিশুকেই নিজের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন আর নিজের মতো সমাজ-পরিবেশে মানুষ ব'লে মনে ক'রে এসব নীতি নির্ধারণ করেন নি তো ! তিনি যে-ভাবে জোর দিয়ে এই নীতির সাফল্যের কথা ঘোষণা ক'রেছেন তাতে মনে হয়, শুধু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই এখানে বড় হয়ে গেছে ; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিক্ষানীতি কখনও সার্বিক হ'তে পারে না, বৈজ্ঞানিক হ'তে পারে না। বোধহয় এই জন্যই স্বয়ং হার্বার্ট-ও তাঁর শিক্ষানীতির অনেকাংশ পরিবর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাক, রুশোর প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা আবার ফ্রান্সের শিক্ষা প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এই বিপ্লবের পর শিক্ষা সম্পর্কে এতকালকার চাপা-মনোভাব এবং আবেদন দাবীতে মর্যাদা পেল। সমস্ত সহরে এবং গ্রামে, (৪০০ অধিবাসী থাকলেই এক-একটি) ইস্কুল খুলতে হবে ; শিক্ষা হবে রাষ্ট্রের কাজ ; খাওয়ার পরই শিক্ষার প্রয়োজন ; অর্থসংস্থান, যুদ্ধ এবং শিক্ষা হচ্ছে অবিরাম এবং আবশ্যিক কাজ ; ইস্কুলে সবারই অধিকার থাকবে ; ইস্কুল অবৈতনিক হবে ; ছেলে-মেয়ে উভয়কেই পড়ানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করতে হবে ; গীর্জা-বর্জিত হবে এইসব ইস্কুল ; কোন ধর্মনীতি শিক্ষাদান ইস্কুলে চলবে না ;

শিক্ষা হচ্ছে জাতির জন্মগত অধিকার—ইত্যাদি রকমের দাবী, আর সে দাবী মেটানোর জন্য রাষ্ট্র অনেকটা এগিয়ে এল। সমস্ত শিক্ষাকে কেন্দ্রায়িত আর ঐক্যের বাঁধনে আনতে মনস্থ করলেন তাঁরা। রোবস্‌পিয়ের (Robespierre) তো স্থিরই করলেন যে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়ে সবাইকে 'ন্যাশনাল এডুকেশন ইনষ্টিটিউসন' অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আবাসিক ছাত্রছাত্রী হিসাবে শিক্ষা নিতে হবে ; সবাইকে সমান এবং একরকম পোষাক পরতে হবে, একই রকমের আহার এবং শিক্ষা যোগাতে হবে ; ছেলেদের ১৫ এবং মেয়েদের পক্ষে ১১ বছর পর্যন্ত এই শিক্ষাকাল চলবে।

কিন্তু রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে এর কোন কিছুই সফল হ'ল না। সম্রাট নেপোলিয়ঁা এসে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কথায় মন দিলেন না। তবে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে স্ট্রাসবুর্গে একটা শিক্ষকশিক্ষণ ইস্কুল খোলা হ'ল। ব্যক্তিগতভাবে ইংল্যণ্ডের 'বেল' এবং 'ল্যাঙ্কাস্টারের' অনুসরণে কিছু কিছু ইস্কুল খোলা হ'ল বটে। তবে নানা কারণে সেগুলো খুব সুফল দিল না।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গিজো (Guizot) প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার জন্য নিয়ম করলেন : প্রত্যেকটি কম্যুনের (Commune) জন্য একটি ক'রে ইস্কুল থাকবে, আর সহরে প্রত্যেক ৬০০০ বাসিন্দাদের জন্য একটি ক'রে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইকোল্‌ প্রাইমের সুপিরিয়ের (ecoles primaires Superieures) ; আর প্রত্যেক বিভাগে একটি ক'রে শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় ; যারা বেতন দিতে পারে না তাদের জন্য শিক্ষা হবে অবৈতনিক। পরিদর্শকও সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু চার্চ বাধা দিল। কাজেই কাজ খুব এগোল না। বরং ১৮৫০ সালের মার্চ মাসের লোয়া ফ্যালো (Loi Falloux) আইন ক'রে সমস্ত ইস্কুলকে চার্চের অধীনে আনবার বন্দোবস্ত করলেন। ১৮৬৭ অব্দে এপ্রিল মাসে দ্যুরে (Duruy) পুনরায় গিজোর আইনকে বলবৎ করতে চাইলেন ; আবার জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপিত হ'ল। পাঠক্রমেও ইতিহাস ভূগোল স্থান পেল। ১৮৮১ এর জুন মাসের আইনে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক করবার চেষ্টা হ'ল ; চেষ্টা হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার ;

তবে ১৮৮২-এর মার্চ মাসের আইনে জুল্ ফেরি (Jules Ferry) অসাধ্য সাধন করলেন। প্রাথমিক শিক্ষা এখন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং আবশ্যিক হিসাবে পরিগণিত হ'ল। আর ১৯০৪ সনের জুলাই মাসের আইনে সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করা হ'ল ; সম্প্রদায়গত ইস্কুলকে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এইবার থেকে চলল সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা। ১৯৪৬ সনের আইন অবধি এসে দেখা গেল, ছেলেমেয়ে উভয়ের পক্ষেই ৬ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক। এই আইনের অন্যথা হ'লে অভিভাবকদের দণ্ডপ্রদান করা হয়। দণ্ড-ও যেমন তেমন নয়, তাঁদের কারাভোগ পর্যন্ত হতে পারে, এমন কি ছেলেমেয়েকে ওঁদের কাছ থেকে কেড়ে পর্যন্ত নেওয়া চলবে। কে-একজন বলেছিলেন, ফ্রান্সের তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে তারিফ করতে হয়—তারা পাথর কাটতেও তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করে অর্থাৎ ক্ষুর ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় দেখা গেল, ফরাসীরা ঠিক বস্তুতে ঠিক আঘাত করতেই পারে। পাথরকে চুরমার করতে হ'লে পাথুরে আইন ধর।

১৮০৬-৮ আইনে মাধ্যমিক শিক্ষা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিছুদিন শিল্প-কারিগরী এবং সাহিত্যকে একত্র ক'রে শিক্ষাদান করছিল, কিন্তু নেপোলিয়ঁা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা লিসে এবং কলেজকে (Lycees &Colleges) একত্র ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে চালু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারেই এই ইস্কুল থাকল ; আধুনিক ভাষাও স্থান পেল। তবু ১৯১০ এর আগে লাতিন আর অঙ্ক ছাড়া মন দিয়ে কিছু শেখানো হ'ত না। প্রথম সাম্রাজ্যের পতনের পর এগুলি রাজার কলেজে (Royal College) রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে আবার লিসে (Lycee) নাম গ্রহণ করে ; বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পৃথক-পৃথক ভাবে দ্বিধারায় পড়ানো হ'ত ; তৃতীয় সাম্রাজ্য থেকে গ্রীক আর লাতিন বাদ দেওয়া হয়।

কিন্তু এমন উদাসীন ভাবে তো চলতে পারে না। মধ্যবিত্তের শিক্ষা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবার জন্য ১৯০২-এ একটি আইন করা হয়। এবার হ'ল সাত বছরের পাঠক্রম। ১০ বা ১১ বছর থেকে শিক্ষাকাল সুরু—১৭ বা ১৮

বছরে সমাপ্তি। বিষয় অনুযায়ী দুটি বৃত্ত করা হ'ল ; প্রথমে চার বছরের পরবর্তী কাল তিন বছরের। পাঠক্রমের দুটো ভাগ ক'রে প্রথম-বৃত্তের শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়। প্রথম বিভাগে আছে—আবশ্যিকভাবে লাতিন, ওরই ৩য় বছরে ঐচ্ছিক পাঠ গ্রীক ; আর দ্বিতীয় ভাগে আছে লাতিন-গ্রীক বর্জন কিন্তু ফরাসীভাষা এবং বিজ্ঞান বিষয় ; এই দুইটি বিশেষ-পড়া হিসাবে। এ ছাড়া, ফরাসী, ইংরাজী অথবা জার্মানী, গণিত, অন্যান্য অঙ্ক বিষয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্কন বিদ্যা উভয় বিভাগেই আবশ্যিক পাঠ। তা ছাড়া একঘণ্টা ক'রে নীতিপাঠ শোনা এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয় আলোচনা করা।

আর, দ্বিতীয় বৃত্তটিকে চার শাখায় ভাগ করা হল : (১) আবশ্যিক পাঠক্রম-অতিরিক্ত গ্রীক এবং লাতিন, (২) লাতিন এবং আধুনিক ভাষা (ইংরাজী বা জার্মান), লাতিন ৩ ঘণ্টা আর অন্যটি ৭ ঘণ্টা, (৩) লাতিন এবং বিজ্ঞান বিষয় ; বিজ্ঞানই এখানে প্রধান বিষয়, (৪) বিজ্ঞান এবং আধুনিক ভাষা।

এছাড়া কোন কোন ইস্কুলে সমরবিদ্যা শিক্ষাও দেওয়া হয়। এসব ইস্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক ইস্কুলও অনেক সময় যুক্ত থাকে। এমনি ক'রে ফরাসীদেশে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য এবং রুচি অনুযায়ী পাঠক্রম নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠিত হ'ল।

কিন্তু সমস্যা এখানেই মিটল না। প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাধ্যমিকের মধ্যে আরও বিচিত্র ধরণের ইস্কুল আছে ; উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বা কুর্ কঁপ্লেমঁতেইর্ (Cours Complementaires) কথা বলছি। প্রাথমিক ইস্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে অনেকে নর্মাল ইস্কুল বা অন্য ধরণের ইস্কুলে যেতে চায়। তাদের জন্যই এই বিভাগ। এখানে বৃত্তিগত আর সাধারণ বিষয় আরও কিছুকাল প'ড়ে নেয়। বহু বিষয় আছে : কৃষিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্যবিষয়ক এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। ১৯০৯ এর পর থেকে আরও বিষয় সন্নিবিষ্ট হ'ল,—সাহিত্যপাঠ, দেশের সাধারণ আইনকানুন, অর্থনীতি এবং রাজনীতি, বীজগণিত এবং জ্যামিতি, হিসাব-রক্ষণ বিদ্যা ; ছেলেদের জন্য বিশেষ করে—দোকান-পসার কি-ভাবে চালাতে হয় সে বিষয়, বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগার

পরিচালনা, কৃষিবিদ্যা ; মেয়েদের জন্য বিশেষ ক'রে শিশু-সেবা ইত্যাদি বহু বিষয় অন্তর্গত হ'ল।

যারা প্রাথমিক বা উচ্চপ্রাথমিক উত্তীর্ণ হ'তে পারেনা, তাদের বয়স পনের উত্তীর্ণ হ'লে, সান্ধ্য-শ্রেণীতে যোগ দিতে দেওয়া হয়—এখানেও তারা বৃত্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে এদের হচ্ছে শিক্ষানবিশীতে ঢুকবার আগেকার শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার নিচের দিকে আছে শিশুশ্রেণী, বা ইকোল্ মাতারনেল (Ecoles Maternelles), শিক্ষাকাল ২ বছর বয়স থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত। এগুলোকে ইস্কুল বলা যায় না, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র বলতে হয়। তবে এখানে লেখা আর পড়ার প্রামমিক অবস্থাটা শেখানো হয়।

রবিবার-বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে ৬ ঘণ্টা ক'রে ইস্কুলের কাল। প্রথমবার ৮-৩০টা থেকে ১১-৩০টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত। সারা বছরেই ইস্কুল চলেনা, ছুটিছাটা আমাদের দেশের মতোই অনেকটা। তবে এদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ইস্কুলই করে, কোন কোন ইস্কুলে বিনামূল্যে, কোথায় স্বল্প মূল্য নেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলে ছুটির পরও ইস্কুলে থেকে বাড়ীর পড়ার সাহায্য হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে পারে ; অর্থাৎ এতুদ্ স্যুরভেই (Etudes Surveilles) ; কোন কোন ইস্কুলে এই সাহায্য-ইস্কুল অবৈতনিক ও আছে।

যাই হোক, এমনি ক'রে বহু দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে ফরাসী জাতি তাদের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ পেল। এই নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ কি হবে জানি না।

॥ আয়র্ল্যণ্ডে ॥

ধর্মকে মানুষ গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক কারণে, বস্তুগত কারণেও বটে। কিন্তু ধর্মের উন্মাদনাও আছে। ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠানগত হয়ে পড়ে তখনই এই উন্মাদনা আসে। আবার ধর্মের রজোগুণও আছে; এই রাজসিকতাই রাজকীয়তা আনে। রাজাদের জিঘাংসা প্রবৃত্তির মতোই এ তখন সহস্র হাত মেলে একটা অন্ধকার বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। খৃষ্ট ধর্মও এককালে ইয়োরোপে এমনি আঁধারের অন্ধবিপ্লব ঘটিয়েছিল, তা আমরা জানি। শিক্ষাক্ষেত্রে আয়র্ল্যণ্ডেও এর প্রভাব কেমন পড়েছিল দেখা যাক।

ভৌগোলিক কারণের জন্যই আয়র্ল্যণ্ড ইয়োরোপের অনেক ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পারেনি। রোমের পোপের হস্তক্ষেপ এরাজ্যে অনেকদিন পড়তে পায়নি, বহিরাগত জাতির হাত থেকেও সে অনেকদিন মুক্ত ছিল। সেই সময় আইরিশ জাতির শিক্ষাকার্য এক বিচিত্র উপায়ে সাধিত হ'ত।

খৃষ্ট পূর্বাব্দের আইরিশ শিক্ষকেরা ছিলেন যাযাবর বা ভ্রাম্যমান। দু' দলের হাতে ছিল শিক্ষা, ড্রুইড এবং ফিলির্ধ (Filidh) বা কবি বা চারণ কবি (Bard)। সময় সময় এক দলই দু' দলের কাজ এবং গুণ নিয়ে। এঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতেন, বক্তৃতা দিতেন, খোলা যায়গায় পড়াতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও চলত। এঁদের আবার 'সেতুয়া' থাকত; আমাদের দেশে পাণ্ডাঠাকুরের শিষ্য যোগাড় করে যেমন সেতুয়া, তেমনি এই সহকর্মীরা তাঁদের ছাত্র যোগাড় করতেন। ধীরে ধীরে শিক্ষকতা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাতো। এঁদের পোষণ করতেন কে? আমাদের দেশের রাজা-বাদশা যেমন সভা গুলজার করবার জন্য বড় বড় কবিকে আশ্রয় দিতেন, ওদেশেও তেমনি রাজারাই। কবি, ড্রুইড, ঐতিহাসিক, আইনজ্ঞ এবং সঙ্গীতজ্ঞ এঁদের স্থায়ী পোষ্য। শিক্ষিতদের এই রাজ-সম্মান দেখে দরিদ্রদেশের সবাই উষ্ণীষ পরবার জন্য শিক্ষা নিতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। কোনোর ম্যাকনেসার (Conor

Macnessa) সময়ে আয়র্ল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ লোকই কবি বা কথক হ'য়ে পড়ল (Filidh বা Ollamh)। রাজার কোষাগার এঁদের জন্য উন্মুক্ত; কেবল 'এঁরাই' তো নয় সঙ্গে শিষ্য-প্রশিষ্য সেতুয়া-সাঙ্গ সবাই থাকত। খাবে-দাবে শোবে আর কবিতা বলবে। কোষাগারে অর্থ আসবে কোত্থেকে? জনসাধারণ। অতএব একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে লাগল। আর ওঁরা রেগে চললেন স্কটল্যাণ্ড। পেটে ভাত না থাকলে শিক্ষিতও দেশদ্রোহী হয়ে পড়ে। আবার ম্যাকনেসা তাঁদের সাধ্যসাধনা ক'রে আনলেন; 'আপনাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ঘটবে না, যতদিন ইচ্ছা থাকুন, যেমন ইচ্ছা খেয়ে যান।' এমনি ক'রে শিক্ষিতেরা চাষীদের খাবারে ভাগ বসিয়ে চললেন। ছাত্রদেরও সমান আপ্যায়ন হচ্ছে কিনা তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরও রাখতেন। ছাত্রদের প্রতি এতখানি প্রীতির কারণ ছিল। শিক্ষকদের বুড়োবয়সে ছাত্রদের কর্তব্য ছিল এঁদের আর্থিক সাহায্য করা, ভরণপোষণ করা। শুনেছি আমাদের দেশের ওস্তাদদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই পারস্পরিক দেনা-পাওনার মধ্য দিয়ে ছাত্র-শিক্ষকে একটা ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হ'ল। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিত কবিতার মাধ্যমে, মুখে-মুখে; লেখার রেওয়াজ ছিলনা এই শিক্ষায়। তবে এঁদের লিখিত পুস্তকও যে না ছিল তা নয়, লেখার উপকরণ এবং কৌশল জানতেন। কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে এ-রীতিটা বিশেষ ছিল না।

এ রকম অবস্থা চিরকাল থাকতে পারেনা। শিক্ষকেরা কেউ কেউ স্থায়ী হ'লেন। কোনোর ম্যাক আর্ট (Conor Mac Art)-এর আমলে তিনটি ইস্কুলের কথা জানা যায় (খৃষ্টাব্দ ২৫৪-২৭৭)—(১) সামরিক ইস্কুল, (২) আইনের ইস্কুল এবং (৩) সাহিত্যের ইস্কুল।

এই চারণ-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দেশে বহুবার আপত্তি উঠেছে। 'ওরা স্কটল্যাণ্ডেই যাক চলে।' কিন্তু সেণ্ট কলাম্বিয়া (St. Columbia) এ আন্দোলনকে থামিয়ে দিলেন। হাজার হ'লেও তিনি নিজেও তো এঁদের কাছেই পড়েছেন। শিক্ষার অবস্থা যাই হোক, শিক্ষক যেমনই হ'ন, প্রতিষ্ঠা-বান ছাত্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝি শিক্ষককে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে যায়ই।

সব দেশের শিক্ষকদেরই এই অভিজ্ঞতা। তাই বুঝি এত মধুর সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রে চিরকাল। কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করবার দরুণ এই চারণ কবিরা একটু অভিজাত শ্রেণীতেই উন্নীত হ'ল। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান কবি ডালান ফরগেইল (Dallan Forgail) তাঁদের ইস্কুল স্থাপনার অনুমোদন করলেন। তখন আয়র্ল্যাণ্ড পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি ক'রে প্রধান ইস্কুল বা কলেজ, এবং তাদের অধীনে অন্যান্য নিম্নস্তরের ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। স্থানীয় ভূস্বামীরা এগুলিকে সাহায্য করতেন। পড়ানো হ'ত—সাহিত্য, ইতিহাস এবং কাব্য। পরবর্তীকালে বদলে হ'ল আইন, প্রাচীনশাস্ত্র এবং মাতৃভাষার সাহিত্য। শিক্ষকেরা অশিক্ষণপ্রাপ্ত বটে। প্রধান শিক্ষককে বলা হ'ত ড্রাম্‌শ্‌লি (Drumchli)। এঁকে সমগ্র আইরিশ সাহিত্যের গদ্য এবং পদ্যে, লাতিন এবং বাইবেলে বিশেষ পণ্ডিত হ'তে হ'ত (অবশ্য একথা ৪০৫ খৃঃ অব্দের ইস্কুল ব্যবস্থা থেকে বলছি)। শিক্ষকদের স্তরভেদে বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল।

যিনি দেড়শ প্রার্থনা সঙ্গীত পড়াবেন তিনি ক্যাওগডাশ (Caogdach), এঁর স্থান সবার নিচে। যিনি কলেজের পাঠক্রমের দেশজ সাহিত্যের বারোখানার মধ্যে দশখানা পড়াবেন তিনি ফোঘ্‌লানটিঢ (Foghlantidh), যিনি ইতিহাস এবং ত্রিশটি ধর্মগ্রন্থের কাহিনী পড়াবেন তিনি স্তরাইঢ (Staraidh), যিনি ব্যাকরণ, বীক্ষণশাস্ত্র প্রভৃতি পড়াবেন তিনি ফয়েরকেট্‌লাইঢ (Foirceetlaidh). আর যিনি ধর্মগ্রন্থ পড়াবেন তিনি সঞ্রৈ ক্যানইন্‌ (Saoi Canoine)। এঁদের সবার উপরে প্রধান শিক্ষক। দ্বাদশ বৎসর লাগত এই ইস্কুলের পাঠসমাপন করতে, আর সাতটি পরীক্ষা তরণী পার হ'তে হ'ত সফলকাম হ'তে।

শিক্ষায় শ্রেণীভেদও ছিল। আইন ক'রে এই শ্রেণীভেদ করা হ'য়েছিল। ভদ্রলোক বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা এর সঙ্গে শিক্ষা নেবে, অশ্বারোহণ, খেলাধূলা, সন্তরণ এবং রণবিদ্যা। এঁদের মেয়েরা সেলাই শিখবে, নকসা বুনন শিখবে। আর রায়তদের ছেলে মেয়েরা এসব নয়। এঁদের ছেলে-মেয়েরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মতো পোষাকও পরতে পারবে না।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের শিক্ষায় অনেককাল আগে এমনি পাঠক্রমভেদ ছিল, পোষাকে এবং পৈতেতেও ছিল।

নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও একটা কথা সবাই স্বীকার করেন, পরবর্তী-কালে যে আইরিশদের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি, গাথা-কাহিনী বেঁচে ছিল তা এদেরই শিক্ষাগুণে। উত্তরাধিকার সূত্রে সংস্কৃতিকে এমনি ক'রে যে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেজন্য আইরিশমাত্রই গর্ব অনুভব করে। পরবর্তীকালে ইংরেজশাসক এবং ধর্মযাজকেরা এই শিক্ষাকে নানাভাবে নিন্দা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদেরই খৃষ্ট-ধর্ম শিক্ষার দিকে তাকিয়ে বিচার করতেন, তা হ'লে বুঝতে পারতেন, আইরিশ শিক্ষায় এই ধারণ শক্তিই পরিশেষে খৃষ্ট-ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তখন প্রভুত্ব করবার বাসনায় ইংরাজ রাজাদের এসেছে উৎকট নীতিজ্ঞান এবং ধর্মোন্মাদনা।

অষ্টম হেনরী এই ইস্কুল উঠিয়ে দিলেন। কারণ? কারণ এরাই জাতীয়তাবাদ দেশের মধ্যে ছড়ায়, এরাই ইংরাজীবিরোধী মনোভাব জাগায়। তাঁর কন্যা এলিজাবেথও কম গেলেন না। অথচ এই আইরিশ-কবিদের চিন্তাধারা এবং শিক্ষার ধারা কত প্রকৃষ্ট ছিল তা পরবর্তী কালে মনীষীরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আইরিশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে পরিপোষণ করতেন, জাতীয়তার গন্ধ তাঁদের মধ্যে পাওয়া গেছে, তাই তাঁদের উপর ইংরেজ সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর রক্তচক্ষু পড়ল, তাঁদের উৎখাত করা হ'ল। অথচ পরিবর্তে যে শিক্ষাব্যবস্থা রাখতে হবে তার চেষ্টা হ'ল না। অশিক্ষার মধ্যে দেশটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। ক্রমওয়েলের সময়ে পুরোহিত-পরিচালিত কিছু কিছু ইস্কুল প্রবর্তনের চেষ্টা হ'ল বটে, কিন্তু সে সব ইস্কুল দেশের সংস্কৃতির বিরোধী; সাম্রাজ্যবাদের একটা নয়া অস্ত্র মাত্র। অষ্টাদশ শতকে গাছতলার ইস্কুল বা হেজ-ইস্কুল (Hedge School) ব'লে যে নতুন ধরণের ইস্কুল দেখা দিয়েছিল তারই গোড়াপত্তন হ'ল এই প্যারিশ বা পুরোহিত চালিত (Parish School) ইস্কুলে। ইংরাজশাসকদের তখন যেমন আইরিশ জাতীয়তাবিরোধী প্রতিষ্ঠানের উপর আগ্রহ, তেমনই আগ্রহ হ'ল আয়ারে যাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তৃত এবং উৎসাহিত না হয়। প্রোটেস্টাণ্টের

সঙ্গে ক্যাথলিকদের তখন প্রবল বিরোধ। আর আয়ার হচ্ছে ক্যাথলিক পন্থী। কাজেই ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় কড়া নজর রাখলেন এইদিকে। তাঁরা বুঝেছিলেন, ধর্মের সঙ্গে কেমন যেন জাতীয়তা আয়ারে সম্পর্ক রেখে চলেছে। কাজেই অনেক পীড়নমূলক আইনকানুন চালু হ'ল, আর ক্যাথলিকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত করা হ'ল ; জনসাধারণকে ব'লে দেওয়া হ'ল ক্যাথলিকদের যদি কেউ শিক্ষক নিয়োগ করে কিংবা এই শিক্ষায় যদি ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয় তা হ'লে তাদের সাধ্যাতীত জরিমানা দিতে হ'বে এবং শাস্তি পেতে হবে। এ অবস্থায় দুটো পথ খোলা, হয় শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের বিদেশ পাড়ি দিতে হবে, না হয় গোপনে এই দেশে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কিন্তু শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়াও যে বে-আইনী ক'রে দেওয়া হ'ল। অতএব ঐ একটি পথ, গোপন শিক্ষার পথই সাধারণের মধ্যে থাকে। আবার চারণ-শিক্ষক বেরিয়ে পড়লেন ; ঝোপেঝাড়ে, গাছতলায় তাঁদের ইস্কুল বসল, চারধারে লোক রাখা হ'ত, সরকারের গুপ্তচর যাতে টের না পায়। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কিন্তু ভারতবর্ষের পাঠশালার মতো অবস্থা তাদের দেখা যায়, অর্থাৎ বৃষ্টি হ'লেই ছুটি, রাজার নিদর্শন দেখলে ছুটি, অথবা নিকটস্থ কৃষকের ঘরে সে সময় আশ্রয় গ্রহণ। তারপর আইনের কড়াকড়ি যখন থেকে কমে গেল তখন এই সব ইস্কুলই বসল গোলাবাড়িতে বা কারও সদর দেউড়ীতে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এসব ইস্কুল ভালো ভাবে ভালো বাড়ীতে পরিচালিত হ'তে পায় নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দিল তখন কিন্তু এই সব ইস্কুলই বিশেষ সাহায্য করল। চার্চ এই সব ইস্কুলের সাহায্য নিল। এরাই গ্রীক-লাতিন শিক্ষা বাঁচিয়ে রেখেছিল, আর অঙ্কের দিক দিয়ে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির দরুণই অঙ্কে জাতি হিসাবেই আইরিশ বিশেষ সম্মান লাভ করে। কপার্নিকাসের পাঁচশত বছর পূর্বে ভের্জিল (Vergil) যে বলেছিলেন পৃথিবীর আকৃতি গোল, এবং এরই জন্য তিনি মিশনারীদের যে বিরাগভাজন হয়েছিলেন—তার কারণ আইরিশের এই গাণিতিক আগ্রহ এবং মেধা। গণিতে বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ড বিশেষ স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে

লাতিন এবং গ্রীক পণ্ডিত পাওয়া গেছে; কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, তাঁরা কিন্তু আদৌ ইংরেজি শিখতেন না। বোধহয় দমন নীতিরই পরিণাম।

এইসব গাছতলার ইস্কুলের পাঠক্রম অনুযায়ী বেতনের প্রভেদ ছিল। যেমন বানান শিখতে হলে ১ শিলিং ৮ পেন্স লাগবে, লাতিনে ১১ শিলিঙ, পড়তে ২ শিলিঙ, অঙ্কে ৪½ শিলিঙ ইত্যাদি। অনেকটা বর্তমানে আমাদের দেশে বাণিজ্যিক শিক্ষার ইস্কুলগুলোর যে রীতি তেমনি। তবে এই ইস্কুলের শিক্ষকের বেতন যে খুব একটা বেশি হ'ত তা নয়, বছরে ৫ পাউণ্ডও ছিল। তাঁরা থাকা-খাওয়া অবশ্য বিনাখরচাতেই পেতেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই এই সব ইস্কুলের মর্যাদা বাড়ল, কারণ এরা প্যারিশ-ইস্কুলের অঙ্গ হ'য়ে গেল। শিক্ষকেরা পুরোহিতের ডান হাত-বাঁ হাত হলেন। শিক্ষা থেকে সুরু ক'রে বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের অবাধ কর্তৃত্ব। সে সময়কার একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হেজ-ইস্কুল মাস্টারেরা যেমন শিক্ষা-দীক্ষায় সাধারণ লোকের থেকে অতি উন্নত তেমনি তাদের থেকে এই মাস্টারেরা ধর্ম এবং সমাজনীতির দিক দিয়েও অনেক নিচে।" তাঁদের এই নৈতিক অধঃপতনের কারণ নাকি ঐ ভালো ভালো মদের প্রতি আসক্তি। ঐতিহাসিকেরা একে খুব ভালো চোখে দেখেন নি, কিন্তু তৎকালের কৃষকেরা এই মদ্যাসক্তিকে খুব অনুমোদন করেছিল; তারা দাবী তুলল—'তারাও মদ খাবে, কারণ ভালো কর্মী, ভালো ব্যবসায়ী হ'তে হলেই মদ খেতে হয়; এ বিষয়ে যারা যত বেশি পাঁড় তারা ব্যবসায়ে তত বড় পাণ্ডা।' শোনা যায় ভারতের নাইট-ক্লাবের যাত্রীরাও এই কথা বলতেন; তবে স্বাধীন ভারতে হয়ত এই মনোবিকার নেই।

হেজ-ইস্কুলের শিক্ষকদের সাফল্যের প্রথম সোপান তো এই রকম চারিত্রিক নীতি; কিন্তু শিক্ষাগত গুণ কি ছিল? পাঠ্যাবস্থাতেই কোন ছাত্র জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে সে শিক্ষকতা করবে। তাকে নজরে রাখা হ'ল। এই ছাত্রটির মনে একটা বিশ্বাস এল বর্তমান শিক্ষক থেকে সে অনেক বেশি জানে। বেশ। সেই শিক্ষককে সে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে। একটা রবিবার বেছে

বিতর্কযুদ্ধের দিন স্থির করা হল। একজন পুরোহিত বা খ্যাতনামা ইস্কুল মাস্টার সভাপতি হলেন। ছেলেটি জিতেছে? বেশ, এর পর তার অন্য এক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিতে হবে। এখানেও আবার এক সময় তর্কযুদ্ধের ব্যবস্থা। এমনি ক'রে দিগ্বিজয়ী ছাত্রটি পরিশেষে শিক্ষকতা করার অনুমোদন পেল। শিক্ষককে হারিয়ে শিক্ষক হ'তে হবে; অর্থাৎ পরীক্ষার ঘরে পরীক্ষকের কাছে খাতা পাঠিয়ে নয়, শিক্ষককে পরীক্ষা ক'রে ছাত্র উত্তীর্ণ হ'ল। এমনি ক'রে এই ভাবী শিক্ষক প্রথম থেকেই শিক্ষকের বিরোধী মন নিয়ে তৈরী হ'ত। আর তাই দেখতে পাওয়া গেল, জাতীয় আন্দোলনে এই সব ছাত্রনেতা বিপ্লবের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। দেশের বিরোধী ছিল এই হেজ-ইস্কুল মাস্টার, আর ভাবী শিক্ষক দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করতে ব্যগ্র। হবেনা কেন? এই সব ইস্কুলে আইরিশ ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হ'ত। কে বাড়ীতে ক'বার মাতৃভাষা ব্যবহার করেছে তার হিসাব গলায় ঝোলানো স্লেটে লিখে রাখত তারা, আর ইস্কুলে এসে শিক্ষকের হাতে সেই ক'বার বেত খেত; একদিকে আছে মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ, অন্য দিকে আছে উন্নতি করবার জন্য ইংরেজি-শিক্ষার বাধ্যবাধকতা। দেশের মর্মমূলে একটা অন্তঃস্রোত ঢুকে পড়ল। অভিভাবকেরা সাধারণত ইংরেজি শিক্ষাই অনুমোদন করতেন; কারণ ঐ লব্ধ-মর্যাদা প্রাপ্তির নেশা। কাজেই হেজ-ইস্কুলের নিষ্ঠুর শাস্তিবিধানের অনুমোদন তারা করতেন। কিন্তু অন্তর থেকে কি আর চাইতেন? হেজ-ইস্কুলে আর একটা দুর্নীতিও ছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের বেলায় আদুরে ব্যবস্থা আর গরীবের ছেলেমেয়েদের উপর সতীনের শত্রুতা তবে তাঁরাই যে সাগ্নিকের মতো শিক্ষার আলোক এই অন্ধকার যুগে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সেকথা স্বীকার করতেই হবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার আর রাজনৈতিক ডামাডোলের যুগে এই হেজ-ইস্কুলই তো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে চালু রেখেছিলেন, এঁদের মধ্যে দু'-চারজন স্বার্থত্যাগী শিক্ষক যে ছিলেন না এমন তো নয়। কাজেই এ যুগে এঁদের দান স্বীকৃত হয়ে আছে। আইরিশের এই যুগ দিয়েছে, জোর ক'রে মাতৃভাষাকে দাবিয়ে অন্যভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাওয়ার বিপদ। এই বিপ্লবকে তারা কোনদিন

ভোলে নি। ইংরাজ বিদ্বেষের মূল কারণের মধ্যে এ-ও একটি। ঐক্য সৃষ্টি করতে গিয়ে চিরন্তন অনৈক্যের জন্ম হ'ল।

এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আয়ারে খৃষ্টধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। একে আমরা মঠ-ইস্কুল (monastic school) ব'লে থাকি। ধর্মের শিক্ষার দিক দিয়ে আয়ারের মঠ-শিক্ষায়তনের এক গৌরবজনক অধ্যায় ছিল। এমন কি দশম-একাদশ শতাব্দীর আয়ারের মঠের শিক্ষাব্যবস্থাকে খৃষ্টধর্মের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হিসাবে সমগ্র ইয়োরোপে পরিগণিত হ'ত। এখানকার ইতিহাসেও আইরিশদের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং দৃপ্তশিক্ষকতার পরিচয় দেয়। রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক কারণে এরও অবসান ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্মশিক্ষায় এই দেশ যে কীর্তি রেখে গেছে তা বোধহয় খৃষ্টানজগৎ কোন কালেও ভুলতে পারবে না।

পশ্চিমের খৃষ্টধর্ম আন্দোলন পূর্বাঞ্চলের থেকে অনেকখানি পৃথকও বটে, বিরোধীও বটে ; এ কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। গ্রীক সাহিত্যের প্রতি রোমক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ একটা কুসংস্কারের স্তরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই বিদ্বেষের পরিণাম ভুগে আবার তাকেই আবাহন করতে হ'ল। গ্রীকদের সভ্যতার যুগে যেহেতু তারা অখৃষ্টান ছিল সেই হেতু তাদের দর্শন সাহিত্য পড়াব না এ খুব সুস্থ মনের পরিচয় নয়। আর তার দরুণ রোমক সম্প্রদায়ের যাজকদের মধ্যে নিরক্ষরতা খুঁটি গেড়ে বসেছিল। শার্লেম্যানের প্রচেষ্টায় এর শুদ্ধিকরণ হয়। কিন্তু এই সময়ই আইরিশ শিক্ষক তাঁকে সাহায্য করেন, শুধু তাঁকে কেন সমগ্র ইয়োরোপের খৃষ্টান সম্প্রদায়ই বেঁচে গেল! আইরিশেরা গ্রীকসাহিত্যকে কখনও ছাড়ে নি, পোপের হুঙ্কারেও নয়। গ্রীক ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের সঠিক কারণ বলতে পারা না গেলেও একটা কারণ অনুমান করা যায়, মার্সেইলসের সঙ্গে আয়ারের বাণিজ্যিক যোগ ছিল ; এই মার্সেইলসে খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকে গ্রীকের প্রভাব ছিল। হয়ত এইভাবে আয়ারল্যাণ্ডে গ্রীকভাষার চর্চা এসেছিল। তাছাড়া, গথ-ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের ধর্মযাজক, শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন। কারণ আয়ারল্যাণ্ডই

তখন ছিল বিপদমুক্ত স্থান। বহিরাগত শত্রুও এখানে আসতে পারে নি। পোপের রক্তচক্ষুও এখানে খাটেনি, যদিও আইরিশেরা খৃষ্টসম্প্রদায়েরই ছিল। এখান থেকেই শিক্ষা পান আলকুইন (Alcuin), এখানকারই সংস্কৃতি নিয়ে গেলেন এরিজেনা (John Scotus Erigena)। শার্লেম্যানে এঁদেরই সহায়তায় চার্চের অভ্যন্তরে নিরক্ষরতাকে দূরীভূত করতে চেষ্টা করেন।

এই সব ইস্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে ছিল গ্রীক, লাতিন (ব্যাকরণ ও সাহিত্য) এবং ধর্ম-পুস্তক ; গণিত বা বিজ্ঞান-শিক্ষা বিশেষ স্থান পায় নি, বোধহয় ধর্মের সঙ্গে এর যোগ নেই ব'লে। তবে এই সময়েই ভূগোলবিদ ডিকুইল (Decuil) এবং জ্যামিতি-পণ্ডিত ভের্জিল (Vergil)-কে পাওয়া যায়। তাছাড়া আর একটা বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় ; ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার আগে তাদের হাতে-লেখা গ্রন্থ প্রণয়ন প্রচেষ্টা ইয়োরোপের সর্বত্রই প্রশংসিত হয়েছে ; এঁরা আবার বিচিত্র পন্থায় লিখতেন, ভাষা লাতিন বটে, কিন্তু হরফ গ্রীকের। এই ভাবে তাঁরা তাঁদের দেশীয় বর্ণমালা ওগাম (Ogam)-কে অনেক সংস্কৃত ক'রে তোলেন। তা ছাড়া সঙ্গীত-শিক্ষার স্থানও এখানে ছিল। প্রথমদিকে কারা এখানকার ইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন জানা যায় না, তবে অষ্টমশতাব্দীতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে পণ্ডিতদেরই রাখা হ'ত বলে জানা যায় ; এঁদের পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ্‌দের মতোই বহুমুখী ছিল।

মঠের এই ইস্কুলের মধ্যে আর্মাঘ (Armagh)-এর খ্যাতিই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ; ইস্কুলটি প্রাচীনও বটে, স্থাপিত হয় ৪৫০ অব্দে। এই ইস্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেণ্ট বিনাইনাস (Benignus) ; সেণ্ট প্যাট্রিক (St Patrick) এই ইস্কুলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। সংস্কার আন্দোলনের সময় (দ্বাদশ শতাব্দী) একমাত্র এই ইস্কুলটিই টিকে ছিল। ১১৬২-এর আইনে এমনও বিধান করা হ'ল যে, আয়র্ল্যাণ্ডে আর্মাঘের পুরাতন ছাত্র ছাড়া কেউ শিক্ষকতা করতে পারবে না। এই সময় এখানকার শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর কথাও জানা যায়।

তারপর এল ইঙ্গ-নর্মানদের আধিপত্য। এরা জাতিতে খৃষ্টান হ'লেও, আইরিশ জাতীয়তার বিরোধী। কাজেই মঠের ইস্কুলের গায়ে প্রথমে হাত

পড়ে নি। কিন্তু এতেও বাধা এল। এরা দেখল, অধিকৃত এলেকায় ইংরেজি কথন সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু অনধিকৃত এলেকায় যেন জিদের সঙ্গে মাতৃভাষা চর্চা করতে লেগে গেছে। এমনকি এখানকার আগন্তুক ইঙ্গ-নর্মান জমিদারেরা পর্যন্ত আইরিশ চর্চা করতে লেগে গেছে ; এমনও হ'ল, ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা গেল, এদের প্রায় সবাই ইংরেজি একেবারেই বুঝতে পারে না। এতে ইংরাজ অধিবাসী অনেকেই প্রমাদ গণলেন। অষ্টম হেনরী তাই আইরিশ ভাষার প্রতি কালাপাহাড়ী নীতি চালালেন। ইতিহাসই বলবে এতে জাতিগত হিসেবে ইংরাজের কি লাভ হয়েছিল। কিন্তু সাময়িকভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডে এল অন্ধকার যুগ। তারপর থেকেই মঠের ইস্কুলের যে-অধঃপতন ঘ'টে আজও বোধহয় সে দুর্যোগ সামলিয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু পোপের সঙ্গে রাজার সহযোগ চিরকাল থাকবার কথা নয়। স্বার্থে স্বার্থে যেখানে মিল ঘটে সেখানে আবার স্বার্থই এসে চিড় ধরিয়ে দেয়। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বিপজ্জনক এলেকা বস্তু-জগৎ, ভৌতিক জগৎ। একদা বলা হয়েছিল, আইরিশ হচ্ছে পোপের বিদ্রোহী সন্তান, এর কবর দিয়ে দাও হে সম্রাট। সম্রাট্ অষ্টম হেনরী তখন বিধান দিয়েছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে ছেলে-বুড়ো সবাইকে ইংরেজি শিখতে হবে। আর আইরিশেরা তার প্রতিবাদে আবহমান কাল ধ'রে চেষ্টা করছে, কি ক'রে দেশ থেকে ইংরেজি তাড়াবে, প্রোটেস্টাণ্টদের তাড়াবে। কিন্তু তারপরই বাধল পোপের সঙ্গে ইংরাজজাতি ও সম্রাজ্ঞীর বিরোধ। পোপের তত্ত্বাবধানে জেস্যুইটরা আসতে লাগল আয়ার্ল্যাণ্ডে আর তারাই ইংরাজ-বিদ্বেষ ছড়াতে লাগল দেশে। এলিজাবেথের পালটা আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তারা খুলতে চলল। এলিজাবেথেরও শাসনযন্ত্র ঘূর্ণিজাল সৃষ্টি ক'রে চলল শিক্ষাজগতে। জেস্যুইটদের ধ'রে ধ'রে কোতল করবার জন্য দিকে দিকে চর পাঠালেন।

তিনি আইরিশের ধর্মযাজক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিজের দিকে টানবার জন্য এক চাল চাললেন: "এখন থেকে অঞ্চলে অঞ্চলে চার্চের তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক ইস্কুল খোলা হবে। তবে এখানকার শিক্ষক হবেন ইংরাজ অথবা ইংরেজের বংশধর।" আর্মাঘ, ডাবলিন প্রভৃতি স্থানেও এই ইস্কুল খোলা হবে।

শিক্ষকদের মাইনে পত্তর আসবে চার্চের আয় থেকে। সর্বনাশ! ধার্মিকেরা প্রমাদ গণলেন। কাজেই এ কৌশল সফল হ'ল না। ডাবলিনের কর্তৃপক্ষ (ইংরাজ শাসকের প্রতিনিধি) আরও আইন করলেন : (১) দুটো বিশ্ববিদ্যালয় হবে - লিমেরিক এবং আর্মাঘে, ২) সমস্ত দেশীয় শিক্ষক, মঠাধ্যক্ষ, জেস্যুইটদের সামরিক আইনে নিহত করা হবে, (৩) সবাইকে ইংরেজি শিখতে হবে। পারিষদবর্গ চিরকালই বেশী বলে। কিন্তু আইরিশদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর বিপ্লব-সংগঠনের কাছে কোন আইনই বলবতী হ'ল না।

প্রথম জেমস্ রাজনীতির সূক্ষ্মদর্শন নিয়ে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে আলস্টারে স্কচদের নিয়ে এসে বসালেন। আর প্রবর্তন করলেন রাজ-ইস্কুল (Royal School)। ছেলেদের পড়াশুনার জন্য প্রতি চার্চীয় অঞ্চলে একটি ক'রে অবৈতনিক ইস্কুল খোলা হবে। ৬টি ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সব ইস্কুলে জমি বিতরণ করা হ'ল, সেখান থেকে আয় হবে। আর্মাঘ তো ৭০০ একর জমি পেল। অথচ এসব ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকই নানা কারণে নিযুক্ত হ'তে পারল না! নাবিকহীন তরী। এই রাজ-ইস্কুলের যে-কাজ হ'য়ে দাঁড়াল তাতে ১৬৪২-এর বিপ্লবে তদানীন্তন কালের আর্মাঘের প্রধান শিক্ষক জন স্টার্কিকে সপরিবারে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হ'ল। সপ্তদশ শতাব্দীর এই বিদ্রোহ আয়ার্ল্যাণ্ডকে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে ফেলে। আর বয়েনের যুদ্ধ এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রোটেস্টাণ্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই-যে ধর্ম এবং রাজার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ, এই সঙ্ঘর্ষই সূচিত করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার। যাই হোক, রাজ-ইস্কুল বা রয়াল ইস্কুলগুলো এই সময় স্থানান্তরিত হয়। নতুন-নতুন আইনে এই সব ইস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়। রাজার সমর্থনে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এই ইস্কুলগুলো দেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিল। কিন্তু দেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে ইস্কুল খুব সাড়া পেয়েছিল তা মনে হয় না। ছ'টি ইস্কুলে সর্বসাকুল্যে আড়াইশত ছাত্রের বেশী কোনদিন হয় নি। এই ইস্কুল আবাসিকও ছিল, আবার বাইরের ছাত্রও পড়ত। রাজ-ইস্কুলগুলির মধ্যে আর্মাঘ, বানাঘের, ক্যাভান, ডানগানন, এনিসকিলেন, রাফো— এই ছ'টিরই

খ্যাতি ছিল, তাদেরই এই অবস্থা। বড়লোকের ছেলেরাই এখানে পড়ত বেশী। এসব ইস্কুলের লক্ষ্য ছিল, এলিজাবেথের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবার উপযোগী ক'রে ছাত্র তৈরী করা। পাঠক্রমের মধ্যে ছিল প্রাচীন ভাষা। এই সময় আয়ার্ল্যণ্ড ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। দেশের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের সংশোধন করার দাবী অনেকবার করা হয়। কিন্তু রাজার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি দেশের উদ্দেশ্য না মেলে তবে কর্তৃপক্ষ হয় বধির হয়ে থাকেন, নতুবা ঘণ্টাকর্ণ সাজেন। কাজেই পাঠক্রমের কোন রদবদল হ'ল না। এই শতাব্দীর রজকীয় অভিযান দুইদিকে—(১) কোন ছাত্রকে বিদেশের শিক্ষা দেওয়া হবে না, (২) ইংরেজি ভাষা শিখতেই হবে। আর দেশের লোক এই দু'টি বিধিনিষেধেরই বিদ্রোহী-সুলভ বিরোধী। দেশের সাধারণ লোককে মুগ্ধ করবার জন্য তাই আবার নতুন রকমের ইস্কুল খোলা হ'ল, খয়রাতী ইস্কুল (Charity School) ; প্রাথমিক দিকে ধনী-পোষিত হ'লেও, পরে রাষ্ট্রীয় সাহায্য-প্রাপ্ত হিসাবেই এসব ইস্কুল পরিগণিত হয়। ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় এখানে পড়ানো হ'ত না, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্ট উভয় শ্রেণীর ছেলেরাই এখানে পড়ত। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালিত হওয়ার পর থেকে ইংরেজি ভাষার উপর এখানে আবার জোর দেওয়া হ'ল ; প্রাথমিক ইস্কুলের পাঠক্রম ছিল এই সব ইস্কুলে ; লেখা, পড়া, অঙ্ককসা, আর হিসাব শিক্ষা (book keeping) ; মেয়েদের জন্য—পড়া, সেলাই করা, বুনন করা। এ ছাড়া চার্চ সংক্রান্ত কিছু বিষয়। কিন্তু এবারও দেশের লোকের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। কাজেই ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এসব ইস্কুলের রাষ্ট্র-সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রশাসনিক উপায়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপনা নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক এবং কিছু কিছু কাজ চলল। ধর্ম এখন জাতির পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই ইংরাজ এবং আইরিশ প্রোটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক ধর্ম নিয়ে সমস্যা তুলে বসে, ইস্কুলে ধর্মশাস্ত্র পড়ানো হবে কিনা। যদি পড়ানো হয়, তবে কোন্ মতকে অবলম্বন ক'রে পড়ানো হবে। দ্বিতীয়ত, আইরিশ সমাজে তখন জাতি-গঠনের প্রবণতা

দেখা দিয়েছে; কাজেই তারা প্রাথমিক ইস্কুলের চাইতে মাধ্যমিক ইস্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় গঠনেরই বেশী পক্ষপাতী। এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই রকম মত প্রতিপাদন করলেন যে, শিক্ষা উপর থেকে ক্রমে নীচে নামবে; কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিকে আসবে, বিপরীতটা নয়। এই মত প্রতিষ্ঠার দুটো কারণ পাওয়া যায়; (১) সাধারণ লোকের পড়বার ব্যবস্থা কিছুটা হয়ে এসেছে, অভিজাতদের সন্তানেরাও বিদেশে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোক কোনটাই পারছেনা। সেইজন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে উন্নত করবার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষালয় এবং দেশে দেশে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এঁরা বলেছেন। সেই লব্ধ-মর্যাদার গতিবেগ। তা ছাড়া জাতীয় আন্দোলন মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রশাসনিক বিপ্লবে মধ্যবিত্তদেরই প্রধান স্থান থাকে। চাকরী-বাকরী, পদমর্যাদার প্রলোভনও আছে। এই সময়ে বহু ভাষাবিদ্ এবং বহুদর্শী টমাস্ ওয়াইজ (Thomas Wyse) আইরিশের শিক্ষা নিয়ে অবিরত যুদ্ধ করেছেন। তাঁরই খসড়াকে অবলম্বন ক'রে স্ট্যানলী (১৮৩১-এর আইরিশ সেক্রেটারী, পরবর্তী কালে প্রধানমন্ত্রী) বোর্ড অব ন্যাশনাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

যাই হোক, এই সময় থেকে ধীরে ধীরে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টের বিরোধ কমে আসছিল, অবশ্য বাইরের দিক দিয়ে। ভিতরে ভিতরে সঙ্ঘর্ষ জিইয়ে রাখা হচ্ছিল, কারণ নতুন অধিকার নিয়ে সেখানে দ্বন্দ্ব, আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব নয়, বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব। এই সময় ঝগড়ার মোড় কেমন ভাবে ফিরছে, আর কেমন ক'রে নতুন শিক্ষার রূপ নিচ্ছে তা বুঝবার জন্য আমরা কয়েকটা বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব উদ্ধৃত করছি।

প্রোটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিকেরা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বালিনাসোলে যে যুক্ত প্রস্তাব এনেছিল তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে—

(১) সরকার নিরপেক্ষ থাকবেন; কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কে অনুমোদন করবেন না।

(২) যে কোন ধর্মেই মুক্তি আছে যদি লোকে সেই ধর্মকে নিষ্ঠা আর সত্যের সঙ্গে প্রতিপালন করে।

(৩) কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার দিতে যদি লোক-শিক্ষাকে আক্রমণ করা হয়, তবে সমাজের শৃঙ্খলাকেই প্রত্যক্ষ আঘাত করা হয়।

এই প্রস্তাবের মধ্যেই আমরা মানুষের দ্বন্দ্ব-ক্লান্তি প্রসূত সহজ এবং সত্য দর্শনের প্রবণতা পাচ্ছি। তবে আঘাতটি ঐ দ্বিতীয় প্রস্তাবেই। বোধ হয় ঐটিই মূল কথা। যাই হোক, বোর্ডকে ভালো ক'রে কাজ করতে হ'লে অর্থ সংস্থান চাই, পরিদর্শক চাই, শিক্ষক নিযুক্ত করা চাই, আর ধর্ম নিয়ে যখন মতবিরোধ আছে তখন নিরপেক্ষ ভাবে পুস্তক প্রকাশ করা চাই। এমনি ক'রে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গঠনমূলক প্রস্তাব এবং আইন প্রণয়ন হ'তে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সাহায্যও বৃদ্ধি পেতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও হওয়ার আশা করা গেল,প্রাথমিকের দিকে তো সরকার বিশেষ নজর দিয়েছেনই। টমাস ওয়াইজ এই সময় শিক্ষা-সংস্কার (Education Reform) প্রণয়ন করলেন। বহু দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে আরও কয়েকটা সম্ভাবনা সূচিত করলেন; কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞানশিক্ষা, সহশিক্ষা এবং বিভিন্ন মতাবলম্বীদের শিক্ষায়তনে সহ-অবস্থিতি। এইসব ব্যাপারে তিনি জার্মান থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন। এখন থেকেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে ঐক্যের সৃষ্টি হতে লাগল; অবশ্য এই ঐক্যটুকু শুধু শিক্ষা জগতেই থাকল।

কিন্তু তিনটে সম্প্রদায়ের মধ্যে (রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট, প্রেস-বাইটেরিয়ান) সজ্ঘর্ষ কমলেও, এখন সজ্ঘর্ষ আসছে বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের। সরকার চান ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয় ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে। সম্প্রদায় চায় ধর্মীয় ইস্কুল। এই নিয়ে ঝগড়া চলল এমন যে, সরকারকে পৃথক ভাবে আদর্শ ইস্কুল (Model School) স্থাপন করতে হ'ল।

বোর্ডের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম বিরোধ বাধল কিলডার প্লেস সোসাইটীর (Kildare Place Society) সঙ্গে। বোর্ডের তখন দরকার শিক্ষকদের তৈরী করবার জন্য শিক্ষণ ইস্কুল। উপরে ঐ ইস্কুলটিতেই তখন ডাবলিনে শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। তারা যখন রাজি হ'ল না তখন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তারা পাণ্টা আর

একটি ইস্কুল খুলল ; তিন মাসের পাঠক্রম থাকল এই ব্যবস্থায়। তারপর এই ইস্কুলটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে শুধু পুরুষ শিক্ষকদেরই পড়ানো হ'ত। পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেয়েদের জন্য টাইরন হাউস-এ পড়ানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৭টি শিক্ষণ-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তার মধ্যে ৫টি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জন্য, ১টি প্রোটেস্টাণ্ট এবং ১টি ধর্মনিরপেক্ষ। এই সময় দশমাসের শিক্ষা কাল নির্ধারিত হ'ল। তা ছাড়া বিদ্যালয়গুলিও শিক্ষক শিক্ষণ-বিভাগ খুলল। দেশের অবস্থা দেখে বোর্ড ক্রমেই বুঝতে পারল, এ দেশের মাটিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। শিক্ষকদের বেতন কিন্তু ছাত্রদের সাফল্য অঙ্কের উপর নির্ভর করত।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে সরকার এখন পর্যন্ত বিশেষ নজর দেন নি। যে ক'টি সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল ছিল তারা কার্য-পরিচালনায় বা শিক্ষকতা কার্যে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। অথচ বেসরকারী ইস্কুলগুলো খুব উন্নতি করছে। তবে এই বেসরকারী ইস্কুলে ব্যবসায়িক দিকটিই বড় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং দায়িত্বশীল মহল থেকে ক্রমাগত অভিযোগ আসতে লাগল, শিক্ষার মান বড় নেমে যাচ্ছে, বিশেষ ক'রে গ্রীক-লাতিন সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞানে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সরকার আইরিশ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বোর্ড গঠন করলেন ; এঁদের কাজ সরকারের অর্থ ইস্কুলে হিসাব মতো বিতরণ করা। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এদের পরিদর্শক ব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিক ইস্কুলে যেমন এখানেও তেমনি ফল দেখে বেতন স্থিরীকৃত হ'তে থাকল। শিক্ষকদের দুরবস্থার সীমা থাকল না, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আবার অধঃপতন ঘটতে থাকে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিরেল (Birrell)-এর চেষ্টায় শিক্ষকদের গুণপনা দেখে বেতন নির্ধারণের জন্য সরকার থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক প্রদত্ত অর্থ-পরিমাণ ৪০,০০০ পাউণ্ডে তুলে আনলেন। এমনি ক'রে কারিগরী বিদ্যালয়েও সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হ'ল।

আর একটি দিকে আইরিশের জয়লাভ হ'ল। সরকার আইরিশ ভাষাকে ইংরাজীর সমান মর্যাদা দিতে সুরু করলেন। এমন কি, আইরিশ ভাষা শিক্ষা প্রাথমিক ইস্কুলে এবং সরকারী কাজে-কর্মে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। কিন্তু

এই ভাষায় বিশেষজ্ঞ লোক তখন বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না, শিক্ষকদেরও অভাব, সেইজন্য সরকার গ্রীষ্মকালীন বিশেষ শিক্ষণকেন্দ্র খুললেন যাতে শিক্ষকেরা এ ভাষা শিখতে পায়। যে সব পরিবার আইরিশ ভাষার চর্চা করত তাদের ছেলেদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন। কিন্তু এই অত্যুৎসাহিতার দরুণ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা পেছিয়ে যেতে থাকে। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিপদ তো একদিকে নয়। ১৯২১ সালে আয়ার্ল্যণ্ড বিভক্ত করার পর থেকে আইরিশ ফ্রী স্টেট তাদের নিজস্ব নিয়মে শিক্ষার এই বিবিধ সংস্কার ক'রে জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করে।

এর পরবর্তী অধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলবার খুব প্রয়োজন নেই। আইরিশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই বৈচিত্র্য আর নানা সঙ্ঘর্ষ আমাদের ভারতবর্ষেরই কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু একথা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন জাতির নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে, দুর্নিবার দেশপ্রীতি এবং সংস্কৃতি থাকলে—জগতের কোন সমাজের সাধ্য থাকে না তাকে বঞ্চিত করে। আর একটা কথাও ভাববার, মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে আইরিশেরা সুখীই বা কেন হয়, আর ইংরাজ ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করতে গিয়ে দেশের লোকের উপর অভিশাপ আর অত্যাচার বর্ষণ ক'রে পরাজয়ই বা বরণ ক'রে কেন।

ভাষা-বিরোধের এই রহস্যটি যদি আমরা বুঝতে পারি, তবে মানব-সভ্যতার শিক্ষা-ইতিহাসের অনেক জট-ই আমরা খুলতে সক্ষম হব।

মানুষের অভিজ্ঞতা তথা ইতিহাস থেকে একটা কথা আমরা জানতে পাই, যে-ভাষার জন্য আজ আমাদের এত মোহ আর মমতা, সেই ভাষাই কালক্রমে আমরা এমনভাবে প্রীতির সঙ্গে বদলে ফেলি যে, আমাদের উত্তর-পুরুষ তা গবেষণা ক'রে পড়তে পারলেও, বলতে পারে না। প্রাচীন মিশরের ভাষা, হিট্টাইটের ভাষা, সুমেরীয় ভাষার পরিণামের কথা আমাদের তো অজানা নয়! অশোক-লিপির কথাও আমরা জানি। অথচ এদেরই মধ্যে ইস্কুলের শিক্ষা, লেখা আর পড়া-র ব্যবস্থা ছিল; তা ছাড়া, ভাষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এমন ছিল যে, লিপি ভুলে গেলেও—কথা ভোলার কথা নয়। আবার, এ-ও জানি ভাষা-সমস্যায় মনের মিল গঠনে অসুবিধা হয় নি, অথবা ভাষা এক হ'লেও

জাতির ঐক্যসাধন করা যায় নি। মানুষ আর কিছু না জানুক, শুদ্ধমাত্র যুদ্ধ করবার জন্যই ইতিহাস জানতে বাধ্য হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। নতুবা, হিক্‌সস্ বা কাসিট্-দের কাছে মিশর হেরে গিয়ে ভাবতে বসত না কেন তারা হারল; আর রথ নিয়ে যুদ্ধ করা শিখে তারা নতুন ভাবে মিশর-সাম্রাজ্য গঠন করতে পারত না। সে কোন্ কালের কথা। তার হাজার দুই বছর পরেও কি মানুষের শিক্ষা এগোয় নি! এগিয়েছে বলেই সে এখন ভাষা-বিরোধ ঘটায়।

ভাষা নিয়ে এই সব দুর্ঘটনার কারণ মানুষের মনে নয়, মানুষের কারসাজি-তে। যে-যুগ থেকে মানুষ সভ্য হ'ল অর্থাৎ লড়াই করতে শিখল, সেই যুগ থেকেই সে বুঝতে পেরেছে—লড়াই করা মানে কেড়ে নেওয়া; কেড়ে নিলে ভোগ করা যায়, কেড়ে নিতে গেলে ভয় দেখাতে হয়। কেড়ে নেওয়া, ভোগ করা আর ভয় দেখানোর সঙ্গে 'আপ্‌সে' জড়িয়ে আছে—অন্যকে ধ্বংস করা, নিজকে সম্প্রসারিত করা। তাই সে কেড়ে নিয়েছিল পিরামিডের জন্য পাথর, হারেমের জন্য অন্যের স্ত্রী-কন্যা, চাষের জন্য লোকজন আর উর্বরা জমি, আর খ্যাতিবৃদ্ধির জন্য অন্যের দেবতা। আর, ভয় দেখাত মন্দির ভেঙে দিয়ে, মানুষের হাত-পা-ঘাড় ভেঙে দিয়ে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েও বটে।

এইভাবে গণিতের নিয়মে, লড়াই সমান হ'ল সভ্যতার। আর, সভ্যতা একান্তভাবে নির্ভর করত বর্তমান সম্পদকে নিয়ে। খৃষ্টপর্বের কিছু পূর্ব থেকেই ভাষাকে ধরা হ'ল মানবজাতির একটি বর্তমান-সম্পদ হিসেবে। তাই শাসকেরা যখনই ভাষা সংস্কার করতে গেছেন, তখনই কিছু একটা ধ্বংস করতে চাইছেন। কিন্তু ভাষা ধ্বংস হয় স্বাভাবিক নিয়মে—যে-নিয়মে সাগর স'রে যায়, যে-নিয়মে মাটি পাথর হয়। ভাষাকে যে জোর ক'রে ধ্বংস করা যায় না, তা বিজয়ীরা জানে। তবে কি ভাষার মাধ্যমে জাতির চিন্তাশক্তিকে খর্ব করতে চায়? তাও নয়। কারণ মানুষ জানে, চিন্তা গতিরুদ্ধ হয়েই শক্তি-সংগ্রহ করে। তা ছাড়া, 'চিন্তা' হচ্ছে ভবিষ্যতের ব্যাপার। ভবিষ্যৎ নিয়ে শাসকবর্গ ভাবে না, সে চায় বর্তমানকে ধ্বংস করতে, কেড়ে নিতে।

ভাষা-য় সেই বর্তমানের দিক আছে। ভাষার অতীত আছে, অতীতের অতীত আছে, বর্তমান আছে, বর্তমানের ভবিষ্যৎ আছে, আবার নিতান্তই ভবিষ্যৎ আছে। এই কালের দুই প্রান্ত সংস্কৃতিতে; কিন্তু বর্তমান হচ্ছে ভাষার ব্যবহারিক দিক। সেই ব্যবহারিক দিককেই সে কেড়ে নিতে চায়। কেন?

অতীত কালে বিজয়ী রাজ্য দখল করেছে, সেখানে বাস বড় একটা করতে চায় নি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কালে সে অপ্রত্যক্ষ ভাবে বাস-ও করতে চায়। আমলা-তান্ত্রিকতা সেই শিক্ষাই তাকে দিয়েছে। অথচ, বিজিত জাতি সেই আমলা-তন্ত্রকে অধিকার করতে চায়, শাসনতন্ত্রকে অধিকার করতে চায়। কাজেই সনাতন প্রবঞ্চনারীতি এল শাসকবর্গের। অধীনরাজ্যের অধিবাসীকে অনুপযুক্ত ক'রে রাখ যাতে সে কখনও সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে না পারে, উচ্চ রাজপদে না আসতে পারে, চাকরীবাকরীতে অংশীদার না হ'তে পারে। অনুপযুক্ততার পাথর গলায় বেঁধে সে ডুবে মরুক।

রাজায়-প্রজায় যখন যুদ্ধ হয়, তখন সংস্কৃতি বা দেশের ঐতিহ্য নিয়ে যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধ হয় ঐক্য নিয়ে। ঐক্য গঠনের যে-যে উপায় সেইগুলির উপর আঘাত করাই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য। মানুষ তো কখনও 'মন' নিয়ে সভ্যতার লড়াই করল না; করল শরীর, পাথর আর আগুন নিয়ে। কাজেই, মাতৃভাষা বা রাজভাষা অর্থ, সংস্কৃতি বিপর্যয় নয়, সংস্কৃতি-প্রীতি নয়, এ ভাষার লড়াই অর্থ রুটির লড়াই, ভাষার ব্যবহারিক দিকের লড়াই। সেইজন্য এই ইংরেজই একদিন তার দেশে মাতৃভাষা নিয়ে লড়াই করেছিল, আয়ার্ল্যাণ্ডেও সেই লড়াই-ই হ'ল। এই লড়াই শেষ হয়, যখন বিজিতের বর্তমান সম্পদ অন্যভাবে কেড়ে নেওয়া যায়।

ইংল্যাণ্ডে

ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা কিছুই জানা যায় না। ব্রিটনদের কি রকম ইস্কুল ছিল কে জানে? হয়ত বা আদিবাসীদের মতোই অবস্থা। তবে স্যাক্সনদের আমল থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে নানা কথার অবতারণা চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ্যাংলো-স্যাক্সনেরা নাকি বর্বরের মতো যুদ্ধপ্রিয় ছিল, লুঠতরাজ ভালো-বাসত। প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর কথা সে। ৬ষ্ঠ শতকেই তারা ব্রিটনদের পশ্চিমদিকে হঠিয়ে দিয়ে বসবাস সুরু করল; দেশটারও নাম হল ইংল্যাণ্ড। এরাও পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই পরিবার আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ বৃহৎ গোষ্ঠী হয়ে গ্রাম নির্মাণ ক'রে বাস করতে থাকে। পরিবারের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হ'ল। কাজেই শিক্ষা ব্যাপারটি রোমকদের মতো পরিবার-নির্ভর হতে বাধ্য। যেহেতু শিক্ষা চলে সমাজের জীবনযাত্রাকে নির্ভর ক'রে, তাই স্যাক্সনদের গ্রামীন সভ্যতার সঙ্গে কিছু পরিচয় ক'রে নেওয়া দরকার।

তারা একক জীবনযাপন করতে সাহস পেত না। দিনকাল ছিল খারাপ। তা ছাড়া বনে আকীর্ণ। কাজেই সমবেত শক্তির উপর নির্ভর ক'রে তাদের শক্তি সঞ্চারিত হ'ত। গায়ে গায়ে লাগোয়া বাড়ী; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অচ্ছেদ্য বন্ধন, মিতালী। গৃহাবলীকে ঘিরে মাটীর প্রাচীর তোলা হ'ত, তাতে বৃক্ষ-চারা পুঁতে বেশ ঝোপঝাড়ের মতো ক'রে গ্রামকে বহিঃশত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখা হ'ত। ঐ বৃক্ষসারির পরে থাকবে নালা আর নালা-ভর্তি জল। কাজেই পারাপারের জন্য সাঁকো থাকবে নিশ্চয়ই, আবার এই সাঁকো সময়ে সরিয়েও রাখতে হ'বে। এই যে পূর্ত কাজ—এগুলি সম্পন্ন করা প্রত্যেক গ্রামবাসীরই ছিল প্রাথমিক কর্তব্য। তারপর থাকবে কর্ষণযোগ্য জমি। প্রত্যেক লোকই বৎসর অন্তে নতুন নতুন জমি-চষবার ভার পেত। তারপর হবে পশুচারণ-ক্ষেত্র। তারপর অকর্ষিত ভূমিখণ্ড—এইখানেই গ্রামের সীমা শেষ। এমনি ক'রে প্রত্যেকটি গ্রাম তৈরী হ'ত। বাইরের লোককে এই

সীমার মধ্যে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। আগন্তুক মাত্রেই শত্রু। পাহারাদারেরা আগন্তুক দেখলে শিঙা বাজিয়ে গ্রামবাসীকে বিপদ-বার্তা জানিয়ে দিত।

বাড়ী-ঘরের অবস্থা? মাটির আর কাঠের; খ'ড়ো চাল; ছাদের দিকে একটা ছিদ্র চিমনীর কাজ করত; দেওয়ালের ছিদ্র জানালার জন্য। কাঠের বাড়ী সম্পন্ন গৃহস্থদের। মোড়লকে বলত ইয়র্ল (Eorl), বংশগতির উপর নির্ভর ক'রে এই ভূস্বামী সামাজিক সম্মান পেতেন। তারপর আছে কেয়র্ল (Ceorl) বা স্বাধীন গ্রামবাসী অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলার অধিকার ছিল; চুল বড় বড়, হলুদ রঙের কেশগুচ্ছ কখনও নোয়াবেনা, কারণ কারও বশ্য তারা নয়। তারপর আছে দাস—যুদ্ধে হেরে যাওয়া দুর্ভাগা মানুষ। এরা চিত্র-বিচিত্র পোষাক পছন্দ করত; বিশেষ ক'রে লাল আর নীল। অভিজাতরা নীল রঙের ঢিলে জামা পরত।

আর ছিল বৃক্ষদেবতা। এই গাছের তলাতে বসত গ্রামবাসীদের সভা, টাউন-মুট, হাণ্ড্রেড-মুট, ফোক্-মুট (Town-moot, hundred-moot, folk-moot) প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের সভা। ফোক্-মুট বা গণ-সভা সমগ্র স্যাক্সনদের আইন-সভা। যুদ্ধ করা সম্পর্কে, শান্তি স্থাপন সম্পর্কে—সব রকমের নিয়ম-কানুনই তারা বাঁধত। বছরে দু'বার এই সভা বসত। পনের বছর বয়সে এই ছুরিধারী জাতির (স্যাক্সন কথাটির উৎপত্তি—তাদের কোমরে-বাঁধা ছুরির নামকরণ থেকে) যুবকেরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হ'ত। ধর্মে তখনও তারা পৌত্তলিক। বহু দেবদেবীর উপাসনা করত। যেমন যুদ্ধ-দেবতা ওডিন (Woden—Odin)। ইনি সমস্ত দেবতার চেয়ে প্রাজ্ঞ, কিন্তু একচক্ষু—দ্বিতীয় চক্ষুটি তিনি অন্য দেবতাকে দান করেছিলেন শুধু মাত্র ত্রিকাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য। রণদেব ত্রিকাল সম্পর্কে জ্ঞান আজও লাভ করেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু সে সময়ে শারীরিক শক্তিতেই যে তিনটি কালকে বেঁধে ফেলা যেত তা বোধহয় অনেকটা সত্য।

ক্যাণ্টারবেরীর প্রথম আর্চবিশপ অগাস্টিন (Augustine) ৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম পদার্পণ করেন। আর, একশ বছরের মধ্যেই সমগ্র ইংল্যাণ্ড

নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। জমি খুবই উর্বরা ছিল ব'লে মনে হয়; তার প্রমাণ সমাজের সর্বাঙ্গেই ছিল, সেকথা সেকালের সমাজের ইতিহাস নিশ্চয়ই বলবে। আর একটা পরিবর্তন এই সময় দেখা গেল, তারা ইয়র্লদের উপরে একজন রাজাকে পেল; এবার থেকে সবার উপরে রাজা-ই সত্য তাহার উপর নাই—মতবাদ গঠিত হয়ে গেল। ইংরাজ এখন একটা জাতি। এখান থেকে সুরু হ'ল শ্রেণীবৈষম্য; শাসন কার্যে এবং অপরাধের গুরুত্বে। ধরা যাক কেউ যদি রাজাকে হত্যা করে তবে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে ৭২০০ শিলিঙ, ইয়র্লকে হত্যা করলে ২৪০০ শিলিঙ, রাজার পার্শ্বচরকে—১২০০, সাধারণ লোককে—৬০০ শিলিঙ। এই শিলিঙের সংখ্যার উপর মানুষের মর্যাদাকে বেঁধে দেওয়া হ'ল, ওয়ের-গিল্ড (Wer-gild) ব'লে। আর জমিজমাও এই হারে বণ্টন করা হ'ত। রাজার নীচে থাকল থেন্ (thane), তার নীচে ইয়র্ল (অবশ্য অভিজাত বংশের হওয়া চাই), তার নীচে কেয়র্ল—সাধারণ মুক্ত নাগরিক; তারপর? তারপর ন'টেগাছ অর্থাৎ চাষী, দাস প্রভৃতি সম্প্রদায়, শুধু হুকুমেই যাদের মুড়িয়ে দেওয়া যায়। অপরাধ নির্ণয়ের জন্য ছিল নানা পরীক্ষা ব্যবস্থা—আজকালকার ভালো ইস্কুলে ভর্তি হ'তে চাইলে ছেলেদের যে রকম দুর্বিষহ পরীক্ষা দিতে হয় সেই রকমই প্রায় রামায়ণী সমাজের—অর্থাৎ অগ্নিপরীক্ষা (সীতার পরীক্ষা স্মরণীয়), জলপরীক্ষা, মন্ত্র-পড়া রুটি, তরবারি, আগুনেপোড়া শিক—কত কি!

ধীরে ধীরে খৃষ্টান-পুরোহিতেরা এই সব পাপক্ষালন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে থাকেন। যখন ঘরের কাছে খৃষ্টধর্মের বিরোধ, তখন এতদূর দেশে তাঁরা সত্যকার ধর্মের আলোক নিক্ষেপ করতে মনোযোগী হ'ন। প্রত্যেক ধর্মেরই এই এক গুণ। যেখানে অধিকার এখনও স্থাপিত হয় নি—সেখানে মানুষ সত্যকার মনুষ্যত্ব আর ধার্মিকতাই দেখাতে পারে। ধর্ম যখন লোহার মতো সুদৃঢ় হয়ে পড়ে তখনই আসে ধর্মে অনাচার। কেবল লক্ষ্মীই চঞ্চলা নয়, ধর্মরাজও। তিনি কখনও দেবতা, কখনও বক, কখনও বা কুকুরের রূপ পরিগ্রহ করেন। ধর্মও মানুষের মনের বৈচিত্র্য থেকে নিরপেক্ষ নয়। ধর্মেরও চরিত্র সময় এবং স্থানের উপর নির্ভর করে। ইংল্যাণ্ডের মানুষ তখন খৃষ্টধর্মে সত্যিই

স্নিগ্ধ হয়ে পড়ল, ধর্ম তাদের হৃদয়ে এসে পৌঁছল। এর অনেককাল পরে সুরু হয় ধর্মরাজ্যেই কলহ। 'মরমে পশিতে' হ'লে 'কানের ভিতর দিয়ে' পৌঁছতে হবে। কিন্তু কোন্ ভাষা কর্ণকুহরে ঢালব? গ্রীক্ না লাতিন? আর যার কান সে বলল মাতৃভাষা অর্থাৎ ইংরাজি। ধর্মে পরবর্তী কালে জমিজমা জড়িয়ে পড়েছিল, ধার্মিক অর্থ জমিদার। এইখানকার আঘাতই সর্বনেশে ধর্মবিরোধ ডেকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে নয়। গোড়ার দিকে ধর্ম-যাজকেরাই ছিলেন সত্যিকারের সমাজ শিক্ষক, ইস্কুলের শিক্ষকও।

৬৬৮ খৃষ্টাব্দে থিওডোর (আর্চবিশপ) এবং মঠাধ্যক্ষ আদ্রিয়ান (Adrian) শিক্ষার উপকরণ এবং পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় বড় বড় মঠ ইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই সময়কার সেণ্ট পিটার মঠ-সংলগ্ন ক্যাণ্টারবেরীর ইস্কুল ছিল প্রসিদ্ধ। এখানে বিখ্যাত বীড (Bede)-এর শিক্ষাগুরু অলডহেলম (Aldhelm) পাঠগ্রহণ করেন। ৭৩২ খৃষ্টাব্দেও এখানে গ্রীক, লাতিন এবং মাতৃভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল ব'লে বীড বলেছেন। বীড অবশ্য 'লাতিন'-কেই মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজি যে ছিল, এবং অনেকেই লাতিন গ্রীক জানত না, তার প্রমাণ বীড-ই রেখে গেছেন, কারণ তিনি ধর্মশাস্ত্রের অনেক অংশ তাদের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। আলকুইন (Alcuin) এখানকার ইস্কুল সম্পর্কে অনেক প্রশংসা সূচক কথা রেখে গেছেন, শার্লেম্যানও তো অনেক শিক্ষককে এখান থেকে ইয়োরোপের বড় বড় ইস্কুলে টেনে নিয়ে গেছেন। কাজেই এ সময় আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপীয় শিক্ষার উৎসক্ষেত্র ছিল। কিন্তু ধর্মযাজকদের এই উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এল, তাছাড়া ডেনদের আক্রমণে এইসব ইস্কুলের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেল। আলফ্রেডের আমলেই (রাজ্যারোহণ ৮৭১ খৃষ্টাব্দে) ইংল্যাণ্ডের ইস্কুলগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল। আলফ্রেড এই নিয়ে অনেক পরিতাপ ক'রে গেছেন। পরিতাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু কিছু প্রতিবিধানের চেষ্টাও করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যাদের ধনরত্নাদি আছে এবং যারা স্বাধীন নাগরিক সেই সব ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষিত না হলে তাদের কাজকর্মের উপযুক্ত মনে করা হবে না; ইংরেজী পড়তে জানা

তাদের যোগ্যতা নিরূপণের প্রথম মাপকাঠি; তবে যারা আরও পড়াশোনা করতে চায় কিংবা উচ্চতর পদে যেতে চায়,তারা পরবর্তীকালে লাতিন শিখবে।' চার্চ থেকে রাজার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাকে নিয়ে আসার এই-ই প্রথম প্রচেষ্টা ইংল্যাণ্ডে। তবে আলফ্রেডও সম্পন্ন অধিবাসীদেরই শিক্ষা অধিকার দিলেন বলে মনে হয়। অভিজাতদের ইস্কুল স্থাপনার উদ্দেশ্যে তিনি রাজস্বের কিছু অংশও প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু ৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা এথেলস্টান (Ethelstan) শিক্ষাকে ধীরে ধীরে পুরোহিতদের আওতায় এনে ফেলতে চেষ্টা করেন। তাঁর আইনে শিক্ষিতদের পুরোহিত হওয়ার যোগ্যতা হ'ল ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। ৯৬০ খৃষ্টাব্দে এডগার (Edgar)-এর অনুশাসনে দেখা যায়, প্রধানত চার্চকেই পরিপুষ্ট করবার জন্য লোকের শিক্ষা, আর সে শিক্ষার দুটো ধারা—প্রাথমিক এবং কারিগরী—মর্যাদা পেল।

তাঁর অনুশাসনে ছিল, 'যুবকদের শিক্ষা দেবেন পুরোহিতেরা নিষ্ঠার সঙ্গে, এই শিক্ষার সঙ্গে তাঁরা ব্যবসায়িক শিক্ষা দেবেন যাতে তারা চার্চকে আর্থিক দিক দিয়ে পরিপোষণ করতে পারে।' আর একটা নিয়ম দেখা যায়, 'পূর্বে যদি কারও কাছে তারা শিক্ষা নিয়ে থাকে তবে তাঁর ছাড়পত্র না পেলে কোন পুরোহিতই কোন ছাত্রকে গ্রহণ করতে পারবেন না।' আজকাল এক ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে যেতে হ'লেও বোধহয় এই নিয়ম। এই নিয়ম থেকে বুঝতে পারা যায়, শিক্ষাদান ব্যাপারটি নিতান্ত অবৈতনিক ছিল না; আর, শিক্ষা পুরোহিতের কবলে সম্পূর্ণভাবে পড়ে গেল। তবু বলতে হয়, এই আমলে চার্চের মহানুভব ধর্মযাজকেরা সাগ্নিকের মত শিক্ষাকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। মঠাধ্যক্ষ ডানস্টান শিক্ষা-ব্যাপারে সত্যকার শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। তাঁর আশ্রমে তিনি আদর্শ শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন, সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-কারিগরী শিক্ষাও গ্রহণ করতে হ'ত। তিনি গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত পুরোহিত যেমন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি যুদ্ধ-শান্তির সময়ে লোকে যাতে প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা নিয়ে সমাজের আর্থিক উন্নতিতে কাজে লাগাতে পারে তার চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর কথাই ছিল, সমস্ত পুরোহিতকে শিল্প-

কারিগরী শিক্ষা আবশ্যিক ভাবে গ্রহণ করতে হবে। হাতেলেখা পুঁথি, চিত্র দিয়ে পুঁথিকে সজ্জিত করা, ধাতুর উপর কর্মকারের হাতুড়ী নিক্ষেপ, গায়কের বীণা বাদ্য, ছুতোরের কাঠের কাজ, ঘণ্টা তৈরী, বা জানালা চিত্রিত করা প্রভৃতি নানা কাজকর্মে তাঁর ইস্কুল তখন সরগরম থাকত। এ ছাড়া ছিল, বাগানের কাজকর্ম, অতিথি-অভ্যাগতকে খাওয়ানো পরানো।

এই সময়ে ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যের চর্চাও সুরু হয়। তিন সহস্রাধিক পংক্তির বেওউলফ্ কাব্য (Beowolf), মঠাধ্যক্ষা হিলডার সামনে সেই ক্যায়েডমন (Caedmon)-এর ধর্ম-সঙ্গীত ইংরাজ জাতির অনেকেরই প্রিয় ছিল; আর গদ্য সাহিত্য সুরু করেন বীড (Bede)। আলফ্রেড নিজেও অনেক পুস্তক লাতিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন; এ ছাড়া প্রসিদ্ধ ইংরেজি-গদ্য সাহিত্য স্যাক্সন-পঞ্জী (Saxon Chronicle) এই সময়ে নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় রচিত হ'তে থাকে।

এর পরই সুরু হ'ল নর্মানদের আমল (১০৬৬ থেকে)। বিজয়ী উইলিয়ম যে কেবল সামন্ততন্ত্র প্রথাই এখানে প্রবর্তিত করলেন তা নয়, স্যাক্সনদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একেবারে হুকুমের গোলাম ক'রে ছাড়লেন। তাদের মধ্যে এতদিন যারা স্বাধীন নাগরিক হয়ে তরোয়াল ধ'রে পথে পথে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করত, তারাও আজ এক-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ল। কালের কপোলতলে স্বাধীনতার যে একবিন্দু নয়নের জল থাকল তা শুভ্র নয়, বহু বেদনায় কৃষ্ণ। তাদের আহারের ব্যবস্থা? তাদের আমলে ব্রিটনদের যে ব্যবস্থা ছিল তাই-ই। তাদের নাম হ'ল ভিলেইন (Villeins) অর্থাৎ গরীব চাষী; খাজনা দিয়ে জমি চ'ষ রে বাপু! আর, বেগার খাটুনীও দিতে হবে। বিদ্রোহ করবে? ঐক্য আছে? নেই? তবে সমূলে বিনষ্ট হও, তোমার গ্রামকে মরুভূমি ক'রে দেওয়া গেল। ১০৬৯-এর বিদ্রোহের পর থেকে সব ঠাণ্ডা। ভাষাকেও পরিবর্তন ক'রে দিল এই নর্মানেরা। নর্মান-ফ্রেঞ্চ ভাষাকেই গ্রহণ করতে হ'ল কাজেকর্মে। ইংরেজি বলবে স্যাক্সনেরা নিজদের মধ্যে। ভাষা পরিবর্তনে বেশ মজা ঘটল; জীবজন্তু যতক্ষণ জীবিত ততক্ষণ তাদের নাম থাকল স্যাক্সনে, কিন্তু মরলেই বেশ সুস্বাদু হয়ে যখন খাবারের টেবিলে এল তখন তারা

নাম নিল নর্মানের। নর্মানেরা উৎসবের মধ্যে তাদের দিল ক্রীড়া-উৎসব (Tournament)।

কিন্তু এ ছাড়াও পুরনো অধিবাসীদের শক্তি এমন একটা দিকে অব্যাহত ভাবে ব'য়ে চলছিল যে-স্রোত শিক্ষাক্ষেত্রে এসে নতুন দিকের সম্ভাবনা জাগায়; কারিগরেরা যে গিল্ড-ব্যবস্থা বা সমবায় সমিতি গড়ে তুলছিল, তাতেই এল মিউনিসিপ্যাল সহর। তাদের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা ভিন্ন ধরণের ইস্কুল গড়তে যায়। আর সেখানে আসে ধর্মযাজকদের বাধা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা যায়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সে-বাধা আপাতত কার্যকরী হ'লেও পরিণামে কার্যকরী হয়নি। এই গিল্ড-ইস্কুলে অবসর বিনোদনের জন্য নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা হ'ত। তারা নিজদের শিক্ষিত লোক দিয়ে নাটক লিখিয়ে নিত। নাটকের আর একটা ক্ষেত্রও সমাজে ছিল। সেই ক্ষেত্রকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলল চার্চ। ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে সংলাপের আকারে মঞ্চস্থ করলে দেখা যায় মানুষের মনে বেশ ছাপ রাখে। চার্চের পুরোহিত এই দিক লক্ষ্য করতে ভোলেন নি। আর সেই থেকে মিরাক্‌ল-প্লে নামে বিশেষ ধরণের নাটক রচিত হ'তে থাকে। প্রথম-প্রথম গির্জার-প্রাঙ্গণেই এসব নাটক মঞ্চস্থ হ'ত। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকের সমাগম এত বেশি হ'তে থাকল যে, গির্জার প্রাঙ্গণ আর যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া গির্জার কবরখানা জনতার-ভীড় দলিত মথিত ক'রে দিত। এই জন্য গির্জার আওতার বাইরে একটু ফাঁকা যায়গায় এই মঞ্চ স্থানান্তরিত হয়। মানুষের উৎসাহ এতেও কমল না। এরা তখন তীর্থ-যাত্রা উৎসবের সঙ্গে এই সব নাটক জুড়ে দিত। লোকে আর এখন নাটক দেখতে আসে না, নাটকই লোকের দুয়োরে দুয়োরে যায়। আমাদের দেশের যাত্রা কবিগান এবং সঙ্‌ প্রভৃতির ইতিহাসের মতো। এই রকম এক তীর্থযাত্রা উৎসব নিয়েই কবি চসার (১৩৩৯-১৪০১) ক্যাণ্টারবেরী টেলস লেখেন। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা একেবারে জনসভায় এসে উপস্থিত হ'ল। মধ্যযুগে তাহ'লে ইংল্যণ্ডে শিক্ষার চারটি ধারা দেখতে পাচ্ছি: (১) সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা, (২) ধর্মীয় শিক্ষা, (৩) ব্যবসায়িক সমিতির শিক্ষা, (৪) জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা।

কিন্তু নর্মানদের আমলে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের খুব সুবিধে হয়ে গেল। নর্মানেরা ইস্কুলের শিক্ষাকে এ্যাংগলো-নর্মানের ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়। কাজেই এ ব্যাপারে শিক্ষা পুরোহিতদের একচেটিয়া হয়ে উঠল। এই যে অধিকার পেয়ে গেল, এ অধিকার চার্চ আর কখনও ছেড়ে দিতে রাজি হয় নি। ১১৩৮এর অনুশাসনে বিধিবদ্ধ হল, "যদি কোন ইস্কুলমাস্টার তার ইস্কুলে এই পুরোহিত ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করে, তবে তাকে ধর্মসম্মত শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।" অর্থাৎ ধর্ম থেকে বে'র ক'রে দেওয়া হবে। ১২০০ খৃষ্টাব্দের অনুশাসনে বেশ পরিষ্কারভাবে চার্চের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হ'ল : 'এই অনুশাসনের বলে, চার্চের কর্তব্য যেমন হবে শিক্ষার প্রসার ঘটানো, তেমনি চার্চের অনুমোদন না পেলে কেউই ইস্কুল চালাতে পারবে না—একথাও জানিয়ে দেওয়া হ'ল।' এর বিরুদ্ধেই ললার্ড আন্দোলন দেখা দেয়। তবে সে একটু পরের কথা। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চার্চ বেশ কড়াহাতে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কত মামলা! বেভার্লিগ্রামার ইস্কুলের মামলা (১৩০৪)—যে মামলায় ডাণ্টনের রবার্টকে নাকে খৎ দিতে হয়েছিল; ১৩০৫এ গার্টনের স্টিফেনেরও সেই দুর্দশা! চার্চের লাইসেন্স না নিয়ে কোন ইস্কুল চালানো যাবে না—ব্যস্ সাফ কথা। যাই হোক, এ সব গোলমালের মূল কারণ বোধ হয় আর্থিক-কথা প্রসঙ্গ। কারণ, এই সময়ে ইস্কুল-চালানো বেশ লাভের ব্যবসায় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু ১৪০৬ থেকে ১৪১০ মধ্যে তৃতীয় এডোয়ার্ড চার্চের এই অধিকারে বাধ সাধলেন। তাঁর নিয়মে দাঁড়াল, ইংল্যাণ্ডের মিউনিসিপ্যাল আইনে কেবল যে সবাই পড়বার অধিকার পেল, এবং গুণী হলেই শিক্ষক হওয়ার অধিকার অর্জন করবে তা-ই নয়, উপরন্তু এই পৌর সভাই ইস্কুলকে পরিচালনা করবে। গ্লস্টার গ্রামার ইস্কুল নিয়েই চার্চ এই ধমক খেল। তারপর জন্ ওয়াইক্লিফ্ (১৩২৪—১৪৮৫) রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে বরবাদ ক'রে প্রোটেস্টান্টের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এলেন। অকস-ফোর্ডে তাঁর চেষ্টা ফলবতীও হ'ল। ধর্মজগতে সাধারণ মানুষের মতামতকে তিনি স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা চার্চকে অনুসরণ করেই শিক্ষাকে কবলিত করলেন। এই সময় প্রায় পঁচিশটি গ্রামার ইস্কুল নতুন খোলা হ'ল।

এই সময়ে আর একটি দুর্বিপাক এল—কৃষ্ণ মহামারী (১৩৪৮—৪৯)। ডরস্টশায়ার, নরউইচ, লণ্ডনের তো কথাই নেই, সমগ্র ইংল্যণ্ডই এই ব্যাধিতে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। শ্রমিকেরা ধ্বংস হয়ে গেল, দেশে শ্রমিকের অভাব হ'ল—শ্রমিকের মজুরীও রূপকথার মতো বেড়ে চলল। তবু শ্রমিক নেই, কৃষক নেই। কত আইন, কত কানুন, কিছুতেই দুর্দশাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কৃষ্ণ মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠরোগ। চার্চ প'ড়ে থাকল, যাজক নেই। কেউ পালিয়েছে, বহু মরেছে। শিক্ষা দেবে কে? যারা থাকল তারা বিদেশী যাজক নয়, দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যারা যাজকত্ব নিয়েছিল তারাই। কাজেই তাদের ইংরেজি ভাষা এখন গির্জাতে আশ্রয় পেল। এইখান থেকেই প্রকৃত ইংরাজী শিক্ষার সুরু। মহামারী তাদের নিজের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে গেল। ১৩২৭ এ-ও ইংরাজ শিশুকে মাতৃভাষা বর্জন ক'রে ফরাসী ভাষা ইস্কুলে শিখতে হ'ত; কিন্তু ১৩৮৫-তেই পাল্লা ঘুরে গেল, এখন থেকে তারা ইংরেজিও পড়তে সুরু করে। পেনক্রিজ্ গ্রামার ইস্কুলের (Penkridge Gramar School) বর্ণনায় দেখা যায়, সেখানে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন হয়েছে; এবং কেবল যে অভিজাতেরাই এই সব ইস্কুলে পড়তে এল তা নয়, কৃষক সম্প্রদায়ও (Villein) বেশ ভীড় ক'রে এল। দ্বিতীয় রিচার্ডের আমলে (১৩৯১) অনেক রকমের দরখাস্তের মধ্যে একটা বিচিত্র দরখাস্ত এল এই মর্মে যে, 'এখন থেকে কৃষকদের বা নিম্নশ্রেণীকে (neif or villein) ইস্কুলে যেতে নিষেধ করা হোক, যাতে তারা তাঁদের শ্রেণীস্তরকে অতিক্রম ক'রে যাজক সম্প্রদায়ে এসে উঠতে না পারে।' কিন্তু রাজা এ দরখাস্ত অনুমোদন করতে চান নি। বরং ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে আইন করলেন, "সমস্ত সম্প্রদায়ের নর-নারীরই স্বাধীনতা থাকবে, যে-ইস্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েকে পড়াতে চায় সেই ইস্কুলে পাঠানোর। তবে এই যুগে লেখাপড়া শিখেই যে-একমাত্র নিজদের মর্যাদা-ক্রমকে উত্তীর্ণ হ'তে পারত তা নয়। ব্যবসায়িক মহলে নিজের কারিগরী কাজ দেখিয়েও তারা মর্যাদার উন্নতি ঘটাতে পারত; কিন্তু শিক্ষায় সম্ভ্রান্ত হওয়া সহজ। তবে ক্রীতদাসদের বোধহয় শিক্ষার অধিকার এ আইনেও আসে নি। যাই হোক সমাজে এই শিক্ষার প্রসারে বাধা বর্তমান থাকলই; কারণ তারা মনে ভাবছে—এই

শিক্ষার সুযোগে দেশে কৃষক সম্প্রদায় আর চাষবাস করতে চাইবে না। সামন্ততন্ত্র ভেঙে যাবে, এবং লর্ডদের প্রভাব বেড়ে যাবে। তবু বলতে হবে আইন হিসাবে ১৪০৬-এর আইনই প্রথম সমগ্র অধিবাসীকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দিল।

এ পর্যন্ত শিক্ষার উপযোগিতা যে সমাজের সর্বস্তরের লোকে উপলব্ধি করছে তা দেখতে পেয়েছি। অবশ্য এই উপলব্ধির কারণ ছিল ভিন্ন প্রকারের। চার্চ তাদের 'বেনিফিট অব্ ক্লার্জি' (অর্থাৎ অপরাধ করবার বিশেষ অধিকার) রাখতে চায়, লর্ডরা অন্য উদ্দেশ্যে, সামন্তদের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক (যার জন্য তারা চাষী বা দাসদের এ অধিকার দিতে চায় না), বণিকদের উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকারের—দেশের রাজা রক্তকরবীর রাজার মতো কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু মূলত যুদ্ধ বাধছে—পুরোহিত, বণিক আর রাজার সঙ্গে। এই তিন শক্তি জনসাধারণের সমর্থনের আশায় তাদের দিকে কিছু কিছু এগিয়ে আসছে। মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ইতিহাসের এই-ই হচ্ছে নিষ্কর্ষ।

কিন্তু রাজাকে কেন পুরোহিতের হাত থেকে ছিটকে এসে বণিকদের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে? সে কথা শ্রম-বিপ্লবের ইতিহাসই বলবে। রাজা যে হয় তার চিরকালই দ্বিধাগ্রস্ত মন, কারণ ধারালো তরবারিটি তার নিজের কাছেই থাকে! আর এই দ্বিধা-বিভক্ত মনের জন্যই দেশকে যেভাবে এগোন উচিত তার গতি হয় যে মন্থর। কিন্তু মন্থর গতির ভালো দিকও আছে। বেশ কিছু ভেবে নেওয়া যায়। বর্তমানে সে প্রসঙ্গ রেখে আমরা মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডের ইস্কুলের অবস্থার কথা একটু আলোচনা করি।

উইলিয়াম ফিটজস্টিফেন (মৃত ১১৯০) রচিত একখানি গ্রন্থ থেকে সেকালের ইংল্যাণ্ডের ইস্কুলের একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

লণ্ডনে তিনটি প্রধান চার্চ সংলগ্ন তিনটি বিখ্যাত ইস্কুল ছিল। চার্চের মর্যাদা আর সুযোগ অনুযায়ী এই ইস্কুলগুলি পরিচালিত হ'ত। শিক্ষকেরাও বেশ নামকরা। ছুটির দিনে ইস্কুলের সবাই চার্চে এসে সমবেত হ'ত। এইখানে ধর্ম সম্পর্কে নানারকম আলোচনা-চক্র ছিল, চার্চে এসে পণ্ডিতেরা বহু তর্কে অবতীর্ণ হ'তেন। বেশ একটা 'টুলো' অবস্থা আর কি। এখানে ইস্কুলের

ছেলেরা ধর্মকাব্য রচনা করত, বিতর্কে নামত ; যেন শিক্ষার মেলা। অতীতকাল, পুরাবৃত্ত অতীতকাল নিয়েই বা তাদের মধ্যে কত তর্ক !

কেবল যে এই তিনটি ইস্কুলই ছিল তা নয়, আরও অনেক ইস্কুলের অস্তিত্বের খবরও পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি ইস্কুল ছিল—সেণ্টপল ক্যাথেড্রাল চার্চ, ওয়েস্টমিনিস্টার, সেণ্টপিটার, এবং সাউথ্ ওয়ার্ক সেণ্ট সেভিয়ারের সঙ্গে সংলগ্ন।

কিন্তু আরও যে বাইরের ইস্কুল থাকল, সেগুলো সম্পর্কে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দের দিকে চার্চের এল ভীতি। অতএব কর দরখাস্ত। 'সব ইস্কুল উঠিয়ে দিয়ে তিনটি মাত্র ইস্কুল রাখা হোক—সেণ্টপল, দি আর্চেস এবং সেণ্ট মার্টিন।'

ষষ্ঠ হেনরী ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনটির বদলে পাঁচটি গ্রামার ইস্কুলের অনুমোদন করলেন। চার্চ বেশ টাকা-পয়সা রোজগার করতে লাগল এই ইস্কুলের মারফৎ। কারণ তখন দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। অতএব ভাগ বসাও। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদ এল এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে। অতএব রাজা অনুমোদন করলেন আরও ইস্কুলের। কাজেই চতুর্দশ-পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের ইস্কুলগুলো লণ্ডনের কোন কোন মহলে বেশ কামধেনু গোছের হ'য়ে পড়ল। এই সময়ে গ্রামার ইস্কুল যে শিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্র তা অনেকটা স্বীকৃত হয়ে যায় ; স্বীকৃত হ'ল বলেই ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক নিয়োগ ক'রে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে পড়ানো বুদ্ধিজীবী মহলে নীতি-বিরোধী ব'লে গণ্য হ'ল ('If a man retain a master in his house to teach his children he damages the common master of the town, yet I believe that he has no action."—Hankeford, Justice of the Common Pleas)। মোট কথা, এই সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রামার ইস্কুল নিয়ে বেশ আন্দোলন চলতে থাকে। এলিজাবেথের যুগে এসে এই আন্দোলন অনেকটা শমতা লাভ করে।

অষ্টম হেনরীর সময়ে ইস্কুলের অনেক ক্ষতি ঘটে গেল ; পুনরুজ্জীবিত গ্রামার ইস্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্বের মতো ততটা কার্যকরী হ'ল না। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চার্চ-অনুশাসিত লেখাপড়ার অবনতি ঘটে

যাবেও। অবশ্য অষ্টম হেনরীর চার্চ-অনুশাসিত শিক্ষার প্রতি ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষ যে ছিল এমন নয়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রস্টারের সঙ্গে সঙ্গে চ্যারিটি শিক্ষার অনেকাংশে অপহ্নব ঘটে গেল। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড এই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু যুগ তখন বদলে গেছে। নানা কারণে সংস্কার আন্দোলনের পূর্ববর্তী অবস্থা এবং পরবর্তী অবস্থার একটা তুলনামূলক আলোচনা এসে পড়ে। কৃষ্ণ মহামারীর যুগ থেকে এলিজাবেথের যুগ পর্যন্ত জনসংখ্যার খুব যে একটা বৃদ্ধি ঘটেছিল এমন নয়। সংস্কার আন্দোলনের পূর্বে জনসংখ্যার অনুপাতে ইস্কুলের সংখ্যা বেশি ছিল। এ বিষয়ে লীচ্ (Leach)-সাহেব তাঁর পুস্তকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। কিন্তু ঐ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার কথাও মনে রাখতে হবে। সমাজ কেন বদলে যাচ্ছে? কোন্ কোন্ আবিক্রিয়া সমাজের এই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে? ইংল্যাণ্ডের সমাজ বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় তার বৃত্তির কতখানি সম্প্রসারণ ঘটছে? যুগের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার কি নতুন দর্শন সৃষ্টি হচ্ছে?

তবু বলা যায়, রাজ্ঞী প্রথম মেরীর সময়েও (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের দিকে) চার্চের অনুশাসন শিক্ষাক্ষেত্রে বলবৎ ছিল। বিশপেরা সমস্ত শিক্ষককে পরীক্ষা করতেন; তাঁদেরই মতামতের উপর শিক্ষাদানের যোগ্যতা নিরূপিত হ'ত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলতে থাকল।

এলিজাবেথ (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ) কিন্তু প্রথম থেকেই জাতির শিক্ষার কথা ভেবেছেন (National Education)। তিনি একটি অনুশাসনে বললেন, "অষ্টম হেনরীর কাল থেকে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময় পর্যন্ত যে-সব গ্রামার চালু ছিল, প্রত্যেক ইস্কুল মাস্টারকে সেই গ্রামারই পড়াতে হবে।" চার্চের নিয়ন্ত্রণের বাইরের ইস্কুলের পড়ানো-শোনানোতে যাতে কোন বাধা না আসে তার দিকেও নজর রাখলেন তিনি। এই সময় থেকেই আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষদের (Local autho-rites) উপর শিক্ষাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। লেখাপড়ার খরচ-খরচা এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে ব'লে তাঁর নির্দেশ-নামায় পাওয়া যায়। ইস্কুলের শিক্ষকদেরও নানা দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধে দেওয়া

হল। ইস্কুলের তত্ত্বাবধানের জন্ত বিশেষ নিয়মেরও প্রবর্তন করা হ'ল। তাঁর সময় থেকেই কারুকর্ম, শিল্পকলা শিক্ষার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে বিশেষভাবে দেখা গেল।

এই প্রসঙ্গে গ্রামার-ইস্কুলের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম আলোচনাই আসে গ্রীক ভাষা সম্পর্কে। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ইস্কুলে গ্রীকভাষার কোন স্থান ছিল না। প্লেতো-আরিস্ততলের লেখার সঙ্গে পরিচয় তাদের ঘটত লাতিনের মারফৎ; অথচ গ্রীকভাষার চর্চা ছিল না জন্ত এমন মনে করবারও হেতু নেই যে, সেখানে দর্শন-স্থায় প্রভৃতি বুদ্ধি-প্রধান বিষয়ের চর্চা হ'ত না। ইংল্যাণ্ডের এই অবস্থা থেকেই প্রমাণিত হয়, বুদ্ধি বা বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ বা চিন্তার উদ্দীপক কোন বিশেষ ভাষাকে আশ্রয় ক'রেই গড়ে ওঠে না। ভাষা চিন্তা-করবার সহায়ক বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তি ভাষাকে রূপায়িতও ক'রে তোলে। লণ্ডনের ইস্কুলে লাতিনের মারফৎ তারা দর্শনশাস্ত্র হেতুবিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন করত—বলতে গেলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। এই ধারাটি সেখানে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেবল ষোড়শ শতাব্দী কেন, আধুনিক যুগের অনেকখানি অংশ পর্যন্তই এই প্রথা ছিল। স্থায়বিদ্যার অনুশীলনে ছাত্রদের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতাও ছিল। ভালো বক্তাকে তারা পুরস্কৃত করত। আমাদের দেশে একটা উপহাসের বস্তু হয়ে পড়েছে যে আমরা এক সময় "তাল পড়িয়া ঢিপ করিল কি ঢিপ করিয়া তাল পড়িল" ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে অত্যন্ত মত্ত ছিলাম। এই উপহাস যে নিতান্ত অযথা তা আমরা অন্যান্য দেশের খবরে জানতে পারব; বৈষয়িকতা এবং রণশাস্ত্র এক ব্যাপার, আর সংস্কৃতির ধারক হওয়া অন্ত ব্যাপার। আজও আমরা বুদ্ধির (Intelligence) সংজ্ঞা নিয়ে ওদেশে যে কি মাতামাতি হচ্ছে তা জানতে পারছি; আলোচনায় মত্ততা যথেষ্টই আছে, বুদ্ধিকেও তাঁরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বটে; কিন্তু তাঁদের সেই অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা নিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করবার যে কায়দা-কানুন পাচ্ছি তাকেই আমরা 'বাহা, বাহা' ব'লে সাদরে বরণ করছি। তাঁরা বলছেন, 'নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (Objective Test) প্রবর্তন কর' আমরা বলছি, 'করলাম ব'লে', তাঁরা বলছেন, 'উঁহু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সব পরিমাপ করা

যায় না', আমরা বলছি, 'যায়-ই না তো!' তাঁরা বলছেন, 'অস্মিতা (Personality) মাপা যায়', আমরা বলছি, 'যাচ্ছি তোমাদের দেশে, একটু শিখিয়ে দাও'; তাঁরা বলছেন, 'অস্মিতার নির্ভরযোগ্য পরিমাপ কিন্তু নেই', আমরা বলছি, 'না থাকলেও ঐ বিষয়ে পারদর্শী হ'তে পেরেছি তার একটা প্রশংসাপত্র দাও।'—ইত্যাদি। এক সময় আমরা সূক্ষ্ম বিচার করতে পারতাম, সবদিক ভেবে দেখে কোন কিছু গ্রহণ করতাম; এখন আমরা সেই অসহিষ্ণু উপহাস শুনে শুনে বুদ্ধিভীরু হয়ে গেছি—সব কিছুই বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করছি। তবু আমরা ঐতিহ্যের কথা বলি, কারণ, আমাদের ঐতিহ্য সবই অতীতের, সে সম্পর্কে কিছু চিন্তা না করলেও সে ইতিহাস সত্য হয়ে থাকবেই। প্রসঙ্গান্তরে একথা বলতে হ'ল এই কারণেই যে, বিচার-ক্ষমতার অনুশীলন করাতে যে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সেই কথাটি এখন আবার বুঝতে হবে।

চতুর্দশ শতকে গ্রামার ইস্কুলে ঐতিহাসিক কারণে ফরাসী ভাষার চর্চা হ'ত, আবার সেই ঐতিহাসিক কারণেই সেই সময়ে ধীরে ধীরে ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন হ'য়ে গেল। কিন্তু ঐ সঙ্গে ভূমিব্যবস্থা জানবার জন্য সামাজিক মর্যাদার জন্য এবং সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য লাতিন শিক্ষা করতই। লাতিনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি শিক্ষা (Theology) বিশেষ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এ সময়ে গ্রামার ইস্কুলের পড়ানোর বড় উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করতে সাহায্য করা। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্র-সংখ্যা সঙ্কোচন নীতি এসে পড়ল—তখন গ্রামার ইস্কুলেরও দুর্দশা ঘটে গেল।

এ ছাড়া ছিল হাতের লেখা। চতুর্দশ শতকের আগে কাগজ আসেনি এদেশে। কাজেই হাতের-লেখা করা বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। ছাপাখানাও তো ছিল না। হাতের-লেখার আদর্শ নিয়ে বেশ গোলমাল ছিল। কঠোর পরিশ্রম ক'রে ছেলেদের তাই হাতের-লেখা শিখতে হ'ত। আজকে যন্ত্রের কল্যাণে (Type Writing machine) সেই হাতের লেখা যে বিশেষ শিল্প তা আর কেউ মনে রাখেনা, কাজেই ভালো হাতের-লেখা একরকম দুর্লভ হ'তে বসেছে।

লাতিনভাষা শিক্ষা তখন সামাজিক প্রয়োজন ছিল। ধর্মের ভাষাও বটে। এই লাতিন ভাষাতেই 'ম্যানর'-এর হিসাবনিকাশ রাখা হ'ত, ধর্মযাজকেরা এই ভাষাকেই পৃথিবীর সমস্ত চার্চের কাজকারবার চালাবার একমাত্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কাজেই সামাজিক মর্যাদা-স্তর অতিক্রম করবার জন্য এ ভাষা শেখা দরকার। তা ছাড়া ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন-গ্রন্থ আবশ্যিক পাঠ ছিল—কি বিজ্ঞান চর্চায়, কি সাহিত্য শিক্ষায়।

এইখানে মানসিক উন্নতিবিধায়িনী সেই সপ্তপদী শিক্ষা কার্যক্রম (Seven Liberal Arts) সম্পর্কে কিছু ব'লে নিই। ইতিহাসের একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কার্যক্রম বিশেষ রক্ষণশীলতার সঙ্গে অনুসরণ করা হ'ত। শেষের দিকে স্থিতিস্থাপক মনের দরুণই নিতান্ত একগুঁয়েমীর সঙ্গে এই নীতি প্রতিপালিত হ'ত বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে এই কার্যক্রমের উদ্ভব অন্য কারণে ঘটেছিল।

মধ্যযুগে সপ্তপদী কার্যক্রমের মধ্যে ছিল—গ্রামার, রেটরিক, ডায়ালেকটিক, এরিথমেটিক, জিওমেট্রি, এস্ট্রোনমি এবং মিউজিক—অর্থাৎ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যামিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সঙ্গীত।

প্লেতো বলেছিলেন, তাকেই আদর্শজীবন বলা যায় যে-জীবন যুক্তি-গর্ভ চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যুক্তিগর্ভ চিন্তাকে প্লেতো দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ এবং অন্যান্য আবেগ বা মনের রস থেকে উর্ধে স্থান দিলেন। গভীর মনোনিবেশ বা 'যোগ'কেই তিনি বললেন—সবচেয়ে সুস্থ এবং আদর্শ চিন্তা। অতএব তাঁর ব্যাখ্যায় ভালো বা আদর্শকে তিনি ব্যবহারবাদ বা প্রয়োজনবাদ থেকে পৃথক ক'রে দিলেন। আরিস্ততলও এর বিশেষ বিরুদ্ধে যান নি, তবে তিনি জীবের নিজস্ব কৌম বা শ্রেণী উপযোগী কর্তব্য কর্মকে এর মধ্যে স্থান দিলেন। যুক্তি দিয়ে কাজ করার চেয়ে যুক্তিধর্মের অনুশীলনকেই তিনি আদর্শ জীবন যাত্রার মান ব'লে ধ'রে নিলেন। কাজেই সমাজের কাজ-কর্মকে তাঁরা বেশ নীচু ক'রে দেখলেন। তাঁর মতে সমাজে দু' ধরণের লোক থাকবে—স্বাধীন নাগরিক যাঁরা কার্যক্রম নির্ধারণ ক'রে দেবেন, আর কর্মী

নাগরিক—যারা সেই কার্যক্রম বা আদেশ পালন ক'রে যাবে। অতএব শিক্ষা কার্যক্রমে পার্থক্য এল ; প্লেতো অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য অঙ্ক এবং দর্শন শাস্ত্র রাখলেন ; আরিস্ততল পাঠ্যতালিকায় কতগুলি মানসিক উন্নতিবিধানের বিষয় সন্নিবিষ্ট করলেন—এগুলি স্বাধীন নাগরিকদের জন্যই মাত্র। এই যে দু' ধরণের মানুষ শিক্ষায় এল—মাটির মানুষ আর চিন্তার মানুষ—এদের শ্রেণীবিভাগ সমাজ কোনকালেই মেনে নিতে পারে নি ; কিন্তু মেনে নিতে হ'য়েছিল। কাজেই মনকে উন্মুক্ত করবার মতো শিক্ষাকেই 'মুক্ত শিক্ষণকার্যক্রম' বলা যায় না, এ এমন একটি কার্যক্রম যাতে কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষ সংসারের দশজন থেকে নিজদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে। কিন্তু এ-কে মোহই বলব। হয়ত রবীন্দ্রনাথ একেই 'মরীচিকা' ব'লে লিখেছেন—

"এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন—
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।

এবং,

দেখো, ওই দূর হ'তে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা নির্মল অনলে।"

কিন্তু সমাজে তখনও সে-অবস্থা আসে নি। সমাজ মূকমুখে যে বিদ্রোহ করে তা সমাজের কোন একটা কোণকে ধ্বংস ক'রেই করে। সমাজের বিদ্রোহ নটরাজের নৃত্য যেন। এই ধারাই বিশেষ জোর পেল রোমকদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। ভায়রো (Varro) নয়টি বিষয় সন্নিবিষ্ট করলেন ; পূর্বের সঙ্গে আর দু'টি বিষয় যোগ করলেন—চিকিৎসাশাস্ত্র এবং স্থাপত্যবিদ্যা। এই দু'টি শাস্ত্রই রোমকদের সমাজের এবং রাজনীতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কুইন্টিলিয়ান—সপ্ত শাস্ত্রই রাখলেন। তবে ইতিহাস, আইন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রকেও তিনি অনুমোদন করলেন। বোয়েথিয়ুস (৪৮১-৫২৫ খৃঃ) চারটি বিষয় সন্নিবিষ্ট করলেন (Quadrivium)—অঙ্ক, জ্যামিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান, এবং সঙ্গীত। এইবার বিষয়ের দুটি শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল—ত্রয়ী শিক্ষা

যা ছিল (Trivium) তা ভাষা-সাহিত্যের প্রাথমিক শিক্ষা, আর চারটি হ'ল বিজ্ঞান চর্চার বিষয়সমূহ হিসাবে পারগণিত। হয়ত এই বিজ্ঞান বিষয়ে ভিট্রুভিয়াসের (Vitruvius) বিশেষ প্রভাব ছিল রোমে। কারণ তিনি স্থাপত্য বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন প্রথম খৃষ্টাব্দের দিকে। তাঁর বক্তব্য ছিল—প্রত্যেকটি শিক্ষাশাস্ত্র দুইটি ধারায় চলে—ব্যাবহারিক দিক এবং তাত্ত্বিক দিক। বহু বিষয়ের স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়; শিক্ষার কার্যক্রম থেকে এবং শিক্ষার্থীর চরিত্র সৃষ্টিতে জগতের কোন বিষয়কেই তিনি বাদ দিতে চান নি।

বোয়েথিয়ুস (Boethius) আনুমানিক ৪৮১—৫২৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি অস্ট্রোগথের রাজা থিওডোরিকের মন্ত্রী। কিন্তু দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেষের দিকে তিনি জেলে পচলেন—পরে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হ'ল। পদগৌরব যত দিন থাকে ততদিনই, তারপরই চরম অগৌরব। মানব সভ্যতার ঐ রাজনীতির দিকটা বুঝি কেবল ভাগ্যের দু'টি দিককেই স্বীকার করে। সব কালেই। তাঁর খ্যাতি ছিল—আরিস্ততল, প্রফাইরি, সিসেরো প্রভৃতি মনীষীর গ্রন্থ অনুবাদ করায়। তর্কশাস্ত্রের উপর তিনি যে বই লেখেন তা তো পশ্চিম ইয়োরোপে এই মধ্যযুগ পর্যন্ত অনুসৃত হ'ত। লাতিন শিক্ষায় তাঁর তর্কশাস্ত্র নীতিই এ যুগে ছিল বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তাঁর সঙ্গীত এবং অঙ্কশাস্ত্র নীতিও বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে ছিল। রেনেসাঁসের পরেও অকসফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজে তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্র পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরিগণিত ছিল। তা ছাড়া 'কনসোলেসন্‌স অব্‌ ফিলসফি' (Consolations of Philosophy) গ্রন্থে তিনি মানুষকে ঈশ্বরের নিকট উপনীত করবার বিষয় এমন গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন যে, পরবর্তীকালের পাদ্রীরা ও-তেই 'মিলেনিয়াম' পাওয়ার আশা রাখতেন। মহামতি আলফ্রেড এ্যাংলো স্যাকসনে এবং চসার ইংরেজিতে এর অনুবাদ ক'রেই বসলেন।

রোমক রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনেটর ফ্লাবিয়াস ম্যাগনাস ক্যাসিওডোরাস (৪৯০—৫৮৫) বোয়েথিয়ুসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ক্যাসিওডোরাস (Cassiodorus) আসলে সিরীয় অধিবাসী—তবে পুরুষানুক্রমে তাঁরা ইতালীতেই বাস

করতেন। জগৎতের সভ্যতায় সিরীয় অধিবাসীদের দান বড় কম নয়। মিশরের সভ্যতার পরিবর্তনের জন্ত দায়ী সম্রাট ইখ্‌নাতুনের সিরীয় স্ত্রী নোফ্রেত্তিত্‌ (মতান্তরে) ইখ্‌নাতুন মিশরের ধর্ম-আচরণ, ভাই-বোনে বিবাহবিধি সমস্ত পরিবর্তন ক'রে দিলেন। স্ত্রী জাতির প্রতি বিশিষ্ট সম্মান মানবসভ্যতার আদিতে নোফ্রেত্তিতের পরিচালনায় ইখনাতুনই প্রথম চালু করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্যাসিওডোরাসের প্রভাবও তেমনি অসামান্ত। ক্যাসিওডোরাসই বোয়েথিয়ুসের অনুভাবনাকে জাগ্রত করলেন। বিভিন্ন রাজার আমলে তিনি উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। ক্যাসিওডোরাস গথদের রোমক-সংস্কৃতি সভ্যতায় দীক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—যেন রোমের অগস্ত্য।

ক্যাসিওডোরাস গ্রামার এবং রেটোরিককে সাহিত্য-শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যক দুটি বিষয় বলে ধরেছিলেন, তা ছাড়া এই দুইটি বিষয় রোমক আভিজাত্যের যেন উপবীতস্বরূপ। তিনি রোমের সেনেটের কাছে এই বিষয় নিয়ে এক প্রস্তাব করে পাঠালেন যে, গ্রামার-শিক্ষকদের মাইনে বৃদ্ধি করা উচিত ; কারণ রাষ্ট্রের পক্ষে এই গ্রামার-শিক্ষকদের পোষণ করাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার একটি বড় অঙ্গ। শিক্ষকেরা যে রাষ্ট্র-নিরাপত্তার একটি প্রধান দিক, এ কথা পরবর্তীকালে একমাত্র হিটলার ছাড়া আর কেউ বোঝেন নি। শিক্ষকদের দুর্দশা কয়েকজন বিবেকী ব্যক্তিকে নাড়া দেওয়ায় শিক্ষকদের কিছু কিছু উন্নতি ঘটেছিল, কিন্তু শিক্ষকেরা যে রাষ্ট্রের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় অংশ তা কোন দেশ সহজে স্বীকার করেনি। শিক্ষকেরা সমাজের অংশ, কিন্তু রাষ্ট্রের নয়। রাষ্ট্রের অংশ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আরও কতিপয় বিভাগ। এই ভুলের দরুণই সভ্যরাষ্ট্র বারবার পেছিয়ে পড়েছে। এই ভুলের দরুণই সভ্যতা যতই বাড়ুক সংস্কৃতিতে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

ক্যাসিওডোরাস লাতিন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে গিয়ে গথদের হাতে বিপর্যস্ত হ'লেন। আরও অনেক রাষ্ট্রিক ব্যর্থতায় রাষ্ট্রের কাজ থেকে ক্যাসিওডোরাস স'রে এলেন। কিন্তু এই সময়েই তাঁর তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল। রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে যা সফল হ'ল না এবার সফল করতে চাইলেন তা চার্চের মধ্য দিয়ে। তিনি এই চার্চের সঙ্গে একটি বড় বিভাগ খুললেন—তার নাম

স্ক্রিপ্টোরিয়াম (Scriptorium)। এখানে বই নকল করা আর বাঁধাই করা হ'ত। কারণ 'নকল করতে করতে শিক্ষার্থী মহামানবের বাক্যাংশের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে ; মনোযোগ সহকারে পড়ে, চিন্তা ক'রে পড়ে।' মোনাস্টারি চরিত্র-গঠনের জন্য এক ভালো অস্ত্র পেল। ছাপাখানার আবিষ্কারের আগে এত বড় ধর্মীয় সামাজিক কাজ আর কি আছে ? চার্চের সংখ্যা বাড়লে পুস্তক সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

ক্যাসিওডোরাসের একটি পুস্তিকার নাম 'Institutes of Divine & Sacred Letters.' এই ইনস্টিটিউটস গ্রন্থের দুটি ভাগ—ধর্মশাস্ত্র আর পাঠ্যবিষয়ের ঐ সপ্তশাখা (Seven Liberal Arts)। ধর্মশাস্ত্র অবশ্য চার্চে ঢোকানো অনেক আগেই হয়েছিল ; কাজেই ক্যাসিওডোরাসের এ বিষয়ে খুব যে দান আছে তা নয় ; কিন্তু তাঁর বড় গুণ হচ্ছে—চার্চের মধ্যে ইস্কুলের সৃষ্টি আর ধীরে ধীরে পরিকল্পনা ক'রে আর শৃঙ্খলার সঙ্গে এইগুলির উপকারিতা দেখানো। এ ছাড়াও তিনি ইস্কুলের শিক্ষায় বেঁচে রইলেন, কারণ তিনি 'সেভেন লিবারেল আর্টস' বাক্যাংশটির উদ্ভাবক। তিনিই তাঁর গ্রন্থ 'De Artibus et Disciplinius Liberalium Literarum'-তে এই বাক্যাংশটি প্রথম ব্যবহার করেন ; বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে তিনি এই সপ্তধারার শিক্ষাকে শুদ্ধি করলেন তা হচ্ছে "Wisdom builded her house ; she has hewn-out her seven pillars." আর কথা নেই, শোধনমন্ত্র যখন প্রয়োগ করা গেল—তখন পুরোহিত সম্প্রদায় ঐ নিয়ে ছুটলেন দিক্ বিদিকে। ইয়োরোপে একক রোমক রাষ্ট্র হ'ল না বটে, কিন্তু একক ধর্মরাষ্ট্র হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল।

আভিজাত্য আর আভিজাত্য। নিজের সুযোগ সুবিধা বজায় রাখা আর অন্যকে প্রবঞ্চিত করা—এই দু'টি উপায় মানুষ যুগ যুগ ধ'রে শিখেছে। এক যুগের ভালো তাই অন্যযুগে খারাপ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই লাতিন-শিক্ষার আভিজাত্য ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডেও সাঁড়াশি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা এইটুকু বেশ বুঝতে পারি—মানুষ কথনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না, সমস্যাকে বাড়িয়ে

তোলে মাত্র। বিষয়কে জানার চেয়ে মানুষ জানতে চায় কে এই বিষয়টি এখনও জানে না তাকে খুঁজে বার কর—আর তাকেই মুনাফার শিকার হিসাবে ধর।

রবীন্দ্রনাথ 'আফ্রিকা' কবিতাতে যেখানে বর্ণনা করেছেন 'সভ্যের বর্বর লোভ' কেমন ক'রে 'নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা' সেখানেই সভ্যতার বিপরীত আচরণ উদ্ঘাটন ক'রে বলেছেন,

'সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা॥"

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা-ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। শিক্ষা-ইতিহাস বলে, তাদের নিজেদেরই দেশে তারা পাড়ায়-পাড়ায় 'আফ্রিকা'র সৃষ্টি ক'রে বসেছিল। সব শিশুরাই যে মায়ের কোলে খেলতে পেত তা নয়, উপরন্তু বাইরে ইস্কুলে পড়বার সুযোগও তাদের কম ছিল। ইংল্যাণ্ডের সভ্যতা একালে অনেকটা তালগাছের মতো। তালগাছের মাথায় পত্র আর ফলে সুশোভিত কিন্তু নিজের সমাজ একদম নগ্ন। যত কিছু রস সমাজে নীচু থেকে শোষণ ক'রে উপরে জমা করেছে। এই দৃশ্যের বড় প্রমাণ রেখে গেছেন শিল্পী উইলিয়াম হোগার্থ (১৭৫১)। তাঁর 'বিয়ার স্ট্রীট' আর 'জিন লেন' ছবি দু'টিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে 'সব বন্ধকী তমসুকী দাদা'-দের কল্যাণে মানুষকে কড়ি-কাঠে ঝুলে আত্মহত্যা করতে হয়, দরিদ্রা পানোন্মত্তা মাতার কোল থেকে শিশুটি সিঁড়ির নীচে পড়ে গিয়ে ভবলীলা সুরু হওয়ার আগেই সংবরণ করে, অথচ ওরই পাশে সেণ্ট জর্জেস চার্চ রয়েছে, আরও কত মন্দির-পুরোহিতের প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসছে।

এই দুর্দশা আরও ভিতরে প্রবেশ করেছে; ধর্মে-ধর্মে শ্রেণীভেদ আছে, স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা নিয়ে শ্রেণীভেদ আছে, ধনী-দরিদ্রের ইস্কুলে বৈষম্য আছে,

বড় ভাই ছোট ভাইয়ের শিক্ষা পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই জন্যই এ সময় যত মনীষীই থাকুন না কেন, শিক্ষা নিয়ে যত তোড়জোড়ই চলুক না কেন, শিক্ষা কিন্তু এগোচ্ছে না—চারিত্রিক শৃঙ্খলা-সম্পাদনের শিক্ষার চরিত্র 'জলবৎ তরলম্' হয়ে যাচ্ছে।

তখনকার দিনের গ্রামের ভদ্রলোকের জীবন-নির্বাহের খরচ সামান্যই ছিল, কিন্তু শিক্ষার খরচ তাদের যৎসামান্য—তা সে আয় তাদের যতই অসামান্য হোক না কেন। আভিজাত্য ইস্কুলের Seven Liberal Arts-এর মহিমা সত্ত্বেও, অভিজাত সম্প্রদায় ছেলেদের অভিজাত ইস্কুলে খরচ-পত্তর ক'রে পাঠাতে চাইতেন না। স্থানীয় গ্রামার ইস্কুলেই তাদের ছেলেরা পড়ত—সেখানে নীচু স্তরের মুদির ছেলে বা চাষীর ছেলের সঙ্গে পড়তেও তাঁরা আপত্তি করতেন না। অনেক বড় বড় ইস্কুলেই অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। সাধারণ লোকের পড়াশুনার জন্য এলিজাবেথ 'হ্যারো'র ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন আর তা প্রথম জর্জের আমলেই ফ্যাসানকামী লোকের ইস্কুলে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আবার ওদিকে দেখুন ইস্কুলের বোর্ডিং খরচা সমেত যদি বছরে পড়ে ২০ পাউণ্ড তবু ২০০০ পাউণ্ড আয়ের পিতার কাছে ঐ খরচা মনে হ'ত অত্যধিক বেশী; কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে ঢুকে সে যদি বছরে ২০০০ পাউণ্ডও খরচ করে তবু সে খরচা সত্যিকারের খরচ ব'লে সেই পিতা মনে করতেন। আর যাঁদের আয় এর চেয়ে কম তাঁরা চাইতেন কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে শিক্ষানবীশ থাকুক। পরিবারের বড় ছেলে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পেত, কিন্তু ছোট ছেলে সাধারণ লোকের কাজ-কারবারে যোগদান করতে বাধ্য হ'ত।

"The younger sons were willing···to mingle in the common avocations of mankind and not to stand upon their gentry. The fact that the younger son went out to make his fortune in the army or at the Bar, in industry or in commerce, was one of the general causes favouring the Whigs and their alliance with those interests as against the desire of the High Tories to keep the landed gentry an exclusive as well as a Dominant class.—Trevelyan.।"

উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ইস্কুলের ঐ লাতিন-গ্রীকের চাপে পড়াশোনা যা অগ্রসর হ'ত—তার সম্পর্কে সেকালের এক মন্তব্য আছে, 'A girl which is educated at home with her mother is wiser at twelve than a boy at sixteen who knows only Latin." অর্থাৎ বারো বছরের যে মেয়েটি কেবল গৃহে তার মায়ের কাছে শিক্ষা লাভ করত সে ষোল বছরের একটি ছেলে যে ইস্কুলে কেবল লাতিন পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাজ্ঞ। এত গ্রীক-লাতিন পড়িয়েও গ্রীক-লাতিনের ভালো পণ্ডিত দেশে পাওয়া যেত না। হবে না কেন—যে-ভাষা সহজে আসে না, নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার মিল নেই, শুধু তাই পড়াতেই একটি মাত্র পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়—তা হচ্ছে বেত, এই বেত আজীবন প্রয়োগ করলে তবে ছাত্র ভাষাটি শিখবে—তারপর পরবর্তী জীবনে সেই ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের একটি বিপদ এই যে, তারা পুনর্জন্মবাদ মানে না। আমরা ভারতবাসীরাও পুনর্জন্মবাদ একটু রকমফের ক'রে মানি—অর্থাৎ আমরা মানি গতজন্মবাদ। সেই জন্যই আমরাও ইংরেজিকে ভুলতে পারছিনে। এই বেতের বিরুদ্ধে হাত তুললেন লক্ আর স্টীল সাহেব। তাঁরা বললেন—জ্ঞানদান এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনবরত বেত্র প্রয়োগই একমাত্র উত্তম পন্থা নয় (perpetual flogging was not the best method of imparting Knowledge and maintaining discipline.)। তবে বেতের বিরুদ্ধে তাঁরাও খুব সাহস ক'রে বদনাম করতে পারেন নি। পারাও যায় না, হাজার হ'লেও বেত তো! ওটি দেখলেই চক্ষুকর্ণ নাসিকার বিবাদভঞ্জন এ যুগেও হামেসাই হয়।

যাই হোক, মাতলামি ক'রে, জুয়ো খেলে, টাকা দেখে মেয়েদের বিয়ে ক'রে, দিন কাটালেও বনেদিরা চ্যারিটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কিছু সে যুগেও করেছেন; আবার নয়া-সমাজ ইস্কুলের শিক্ষাকালকে পরিপূর্ণ করবার জন্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশের ব্যবস্থা করেছে—একথা সত্য।

নেপোলিয়ার যুদ্ধ সমগ্র ইয়োরোপকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে গেল। এ ঝাঁকানি, পরাণের সাথে মরণ-খেলা নয় যে জীবন-বেদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান

হবে। ইংল্যাণ্ড বহুপূর্ব থেকে অথর্ব-বেদের ক্রিয়া-কাণ্ড উদযাপন ক'রে আসছিল। ভোট আছে কিন্তু জনগণের সম্মতি সে-ভোটে নেই। ভূস্বামী আর নানান ধরণের স্বামীনীরা ভোটগুলো কায়দা ক'রে মেরে নিয়ে আইন-সভায় যোগদান করতেন; কাজেই দরিদ্রের সংখ্যা দেশে বেড়ে চলল। ক্যাসলরিয়া বা ওয়েলিংটন-এর মতো জর্জ ক্যানিং নন, অথচ জর্জ ক্যানিং তখন একজন বেশ হর্তাকর্তা হ'য়ে উঠেছেন। ইংল্যাণ্ডের সমাজ ফরাসী-বিপ্লব এবং শিল্প-বিপ্লবের যে-ঢেউয়ে নোংরা গলিতে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল জর্জ ক্যানিং বাক্যের তোড়ে আর স্বার্থের লোভে সে সমাজকে সেই নোংরামির একেবারে ভেতরে ঠেলে দিল। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত সাহস ক'রে বন্দুক নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে ভূত নেই প্রমাণ করতে, কিন্তু তার দিন কয়েক পর মহামারীগ্রস্ত দীর্ঘিকার ধার থেকে অদৃশ্য দেহধারীদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝটিকায় যে-মহাশ্মশানে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে সে উপস্থিত হ'ল, সেখান থেকেই জীবন-মৃত্যুর সম্যক জ্ঞান সে লাভ করে। ইংল্যাণ্ডেও হয়েছিল শ্রীকান্তের অবস্থা। ধনতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে যাওয়া অত সহজ নয়; আর গণতন্ত্র যে কি তা বোঝাও নিজের অহমিকা দিয়ে সম্ভব নয়; গণতন্ত্র সম্পর্কে উপলব্ধি আসে যখন দেশের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস রাষ্ট্রকে অস্ত্রশূন্য ক'রে দেয়, সমগ্র রাষ্ট্রের মনপ্রাণকে অবশ করে দেয়।

মধ্যযুগ থেকে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সমাজের পরিবর্তন আসতে সুরু করছে বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে। তার মধ্যে বড় পরিবর্তন এল—যৌথ ও সমবায় শক্তি থেকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিয়ে। মধ্যযুগের কৃষি-ব্যবস্থা, গিল্ড বা কারিগরী সঙ্ঘে ছিল সমবেত শক্তির উন্মেষ, সেখানে 'একাকী' বলে বস্তুটি লোপ পেয়েছিল। তবে ব্যক্তি-বিসর্জন ছিল না, ব্যক্তি ও ব্যষ্টিতে বেশ আদান-প্রদান চলত। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যষ্টির সঙ্ঘর্ষ কেবলমাত্র সুরু হয়েছে, তাই রাষ্ট্রর নিরপেক্ষতার জন্য এত চিৎকার। পরের যুগে অবাধ বাণিজ্য-নীতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির দম্ভ ফুটে বের হ'তে থাকে। পরবর্তীকালের পুলিসী-সমাজ যত ত্রুটিশূন্যই হোক মধ্যযুগের সে 'শান্তির নীড়'কে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। পুলিসে গোলমাল থামাতে পারে, কিন্তু গোলমাল যে হয়, এ তথ্যটি স্বীকার করে। মধ্যযুগে যার-যার কাজ সে-সে করত সমাজের প্রতি আস্থায়;

কিন্তু অনাস্থার ভাব আসার এই কাজকর্মের দিক দিয়ে পরবর্তী যুগ নেমে যেতে থাকে। টিউডর-এর আমল ব্যক্তিকে স্বাধীন ক'রে দিল এবং নিজের জন্যই নিজের কাজ করবার প্রেরণা দিল। সমাজে স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি করল। গিল্ড, ভূস্বামীদের হাত থেকে রাষ্ট্র বা রাজা সব কিছু করায়ত্ত করবার চেষ্টা করে ১৬২৯ থেকে, কিন্তু অবাধ বাণিজ্যনীতি বিশেষ ক'রে উৎপাদনকারী, উপস্বত্বভোগী এবং অর্থ-লেনদেনকারীদের কল্যাণে অনেক অংশে মেনে নিয়েছিল। এই সময়েই তো নানারকম কোম্পানীকে নানারকম সুবিধা দিয়ে 'গৃহছাড়া' ক'রে দিল, কিন্তু তারা লক্ষ্মীকে নিয়ে গেল। রাজার বাঁধন একটু আলগা হয়ে পড়লই, বিশেষ শিথিল হ'ল পিউরিটানদের গৃহ-যুদ্ধের ফলে। অর্থনীতির কাছে ব্যক্তির সমাজ-বাঁধন চলবে না এ-স্বীকৃতি তারা তখন থেকেই পেল। ডক্টর ক্যানিংহাম এই সময়ের চিত্রটি বেশ দিয়েছেন: "Under the Council of State (during the Commonwealth) and in the early days of the Protectorate, the privileged Companies had been practically set aside, and the African trade and East India trade had been open to interlopers." যাই হোক স্টুয়ার্ট-আমলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও, নতুন-কালের শিল্প-পতিরা আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেদের করায়ত্ত অনেকখানিই ক'রে ফেলল। এই সময় থেকেই যন্ত্র-দানবের সঙ্গে সমাজের মানুষের বিরোধ লেগে ওঠে। রেনেসাঁসের যুগে এর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক ছিল, যেটুকু সুখ-সুবিধার সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মিল ছিল, তার পরিবর্তন ঘটে—উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কসা হ'ল ঐ দিয়ে কতখানি বড়লোক হওয়া যায়। ধন-লিপ্সা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কামনা-বাসনা এবং লালসা ডাকিনী-যোগিনীর মতো লোল-জিহ্বা তুলে মানুষের বদলে মানুষের শ্মশানকে খুঁজতে বেরোয়। নিজের প্রয়োজনে ধন-সম্পত্তি নয়, ধনের প্রয়োজনেই ধন। ধনতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে। কৃষিকর্মের মধ্যেও এই যন্ত্র-প্রতিষ্ঠা চলতে থাকল। তিনটি স্তরে ইংল্যাণ্ডের পরিক্রমণ হয়ে গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে—মানুষ, মানুষ-চালিত যন্ত্র,

ষ্টীম-চালিত যন্ত্র। পরিণতি কি? শেষ স্তরে এসে দেখা গেল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিকোণ মানুষের প্রতি এমন বদলে গেল যে, এই যন্ত্র এবং ধনিক-সম্প্রদায় কারিগর আর শ্রমিকদের প্রতি ঠিক 'প্রতিবেশীর' মতো ব্যবহার করত না, মনুষ্যত্বের ছোঁয়াচ ছিল না—নিগ্রো ক্রীতদাসদের মতোই তাদের উপরও ব্যবহার করা হ'ত। কিছু মানুষ বহু মানুষকে দাসে পরিণত করে ফেলে এই সময়।

এক সময় খৃষ্টান-ধর্মকে যে না মানত তার যেমন সমাজে স্থান ছিল না, শিক্ষা-বিভাগে স্থান ছিল না, শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হয়—এই সময় যে-পণ্ডিত অবাধ বাণিজ্যনীতি মানত না, যে-পণ্ডিত রাষ্ট্র-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রচণ্ড ভাষণ দিতে জানত না—তাদের জর্জিয়ান বা ভিক্টোরিয়ান যুগে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হ'ত না—বিশেষ ক'রে রাজনীতি ও অর্থনীতি চেয়ারে তিনি বসতেই পারতেন না (The plutocrats in search of fortunes have always found, and still find, Professors of political economy ready to make as good a case for their patrons as an ill-informed public can be doped into believing. There was not much chance of getting a chair of political economy in the universities of the late Georgian or the early Victorian days unless the applicant was an enthusiastic Free Trader and an eloquent defender of the principles of Laisser-faire,··· ·· G. R. Stirling Toylor)। এমনি ক'রে শিক্ষা-জগতকে অধিকার ক'রে ফেলল নতুন যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যনীতি, জন্ম হ'ল নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, আর দেশের জনসাধাণের উপর চেপে বসল আমরণ অনশন, দারিদ্র।

ওদিকে নেপোলিয়ঁার যুদ্ধের ফলে সারা ইয়োরোপে তখন অভাব। ইংল্যাণ্ডের মালের কাটতি বেড়ে গেল, দরিদ্রদেরও দাবী। কিন্তু আইন আছে। আইন মানুষে করে, কিন্তু দরিদ্ররা মানতে বাধ্য হয়। আইন 'শব্দে' লেখা থাকে—আর সে শব্দ একরকমের প্রতীক। সম্প্রদায় বুঝে সে শব্দটির

ব্যাখ্যার কাজ করা হয়। আসলে ভগবানের রাজ্যের মতো মনুষ্য-জগতে কোন আইন নেই। আইনের ব্যাখ্যা মাত্র আছে। কাজেই দরিদ্রদের মধ্যে প্রাণ-কাড়া, হাড়-ভাঙা অনেক আইন চাপল বটে, কিন্তু দারিদ্র ঘুচল না। এমনি করে মহেশের মৃত্যুতে গফুরদের যাত্রা সুরু হ'ল সহরের দিকে।

কিন্তু সহর কোথায়? কারখানা আর নোংরা গলিতে সহর ছেয়ে গেল। স্বাস্থ্য কাদের জন্যে? মিউনিসিপ্যালিটিই বলুন আর কর্তৃপক্ষই বলুন—কর্তব্য তাদের মাত্র একটি—বড় লোক হওয়া। আর কোন কর্তব্য নেই। বিত্তের প্রতি বিতৃষ্ণা—ব্যক্তিজীবনে এলেও, মনুষ্য-সমাজে কোথায়ও আসে নি। আর বিত্তজ্ঞান বলে, 'মানুষের জীবন আজ আছে কাল নেই, কিন্তু টাকা থাকে। টাকা থাকে সমাধি স্থানে, টাকা থাকে চার্চে, টাকা থাকে পার্লামেণ্টে।'

এই পরিস্থিতির মধ্যে এই দরিদ্রের কুটিরে শিক্ষার বার্তিকা নিয়ে একজন এগিয়ে এলেন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর নাম জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টার। লণ্ডনের সাউথওয়ার্কে ইস্কুল খুললেন—দরিদ্রের ছেলেদের জন্য। যদি টাকা দিতে পার দাও, না পার তবু এস। অনেক ছেলেমেয়েই তো আসবে। এল। কিন্তু শিক্ষক সস্তাদরে পাওয়া যাবে কোথায়? আচ্ছা, ইস্কুলের পাণ্ডা-পাণ্ডা ছেলেদের দিয়ে শিক্ষকতা করালে হয় না? বড়লোকদের দৃষ্টি পড়ল এই সাফল্যের প্রতি। এইটিই হ'ল দুর্যোগ। কারণ তখনকার ধনীমাত্রই দরিদ্রের সম্পর্কে কোন কিছু ভালো করার বিরোধী। প্রথম প্রথম তারা ইস্কুলের দালান তুলে দিল। ১৮০৪-এর দিকে ল্যাঙ্কাস্টারের ইস্কুল বেশ বড় হয়ে উঠল। প্রায় হাজার খানেক ছেলেমেয়ে। ভূস্বামী এলেন, রাজা এলেন—দানের পরিকল্পনা নিয়ে। ল্যাঙ্কাস্টার উস্কানি পেয়ে পেয়ে ক্ষিপ্তের মতো তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচারের জন্য, ইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দূর থেকে দূরান্তরে ছুটলেন। ১৮০৭ সালে ল্যাঙ্কাস্টার ঋণগ্রস্ত হলেন, এইবার ধনীরা কঠোর পাওনাদার সেজে তাঁকে তাড়া করল। শাইলকের স্বপক্ষেও যুক্তি আছে, কারণ শাইলক হচ্ছে নাটকের চরিত্র, কিন্তু ধনীদের শাইলক-বৃত্তির কোন যুক্তি নেই—কারণ ধনীরা নাটকের চরিত্র নয়—তারা অভিনয় করায়।

ল্যাঙ্কাস্টারকে বাঁচানোর জন্ত একটা সমিতি হ'ল—রয়াল ল্যাঙ্কাস্টেরিয়ান সোসাইটী ; ১৮১৪-এ যার নাম হ'ল বৃটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটী। নামের পরিবর্তন লক্ষণীয়। নানা মতবিরোধে ল্যাঙ্কাস্টার এ সমিতি থেকে নাম কাটিয়ে নিলেন। আর একটা ইস্কুল স্থাপন করলেন। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা করলেও করতে পারে, কিন্তু কতদিন আর। বিদেশে গেলেন—দারিদ্রের মধ্যেই মরলেন। দরিদ্রের জন্য প্রাণপাত করেছিলেন, দরিদ্র হয়েই মরলেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

সমিতি থাকল। কিন্তু চার্চ বিপদ গুনল। চার্চের লোক ছাড়া অন্ত কেউ দরিদ্রদের শিক্ষা দিলে যে সব অধার্মিক হয়ে যাবে। তাঁরা ডক্টর এণ্ডরুবেল-কে খাড়া করলেন। এণ্ডরুবেল-এর কার্য-পদ্ধতিতে আমাদের উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে। কারণ তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে এসে এখানকার সর্দার-পোড়ো শিক্ষা প্রথাটি বিলেতে নিয়ে যান। বিলেতে গিয়ে তিনি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'মনিটারিয়াল সিস্টেম' বলে শিক্ষা-বিষয়ক এক বই লিখলেন। আধুনিক ভারত এই একবারই পশ্চিম দেশের শিক্ষায় কিছু দান করেছে। তারপর থেকেই দেউলিয়ার মতো পশ্চিমের শিক্ষা-পদ্ধতি হাত পেতে আবহমান কাল নিয়েছে।

এণ্ডরুবেল আর ল্যাঙ্কাস্টারের দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য আছে। ল্যাঙ্কাস্টারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেও, এ কথা মানতেই হবে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে প্রথম ধর্ম-চার্চ বিবর্জিত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করেন ; তিনিই দেখিয়েছেন দরিদ্র হ'লেও মানুষকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তেমনি ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাই হোক, এ-অবস্থায় প্রত্যেকটি মনীষীরই পতন ঘটে। কাজেই এণ্ডরুবেল-এর উত্থান সুরু হ'ল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নিয়ে এক সমিতি গঠন করা হ'ল। সমিতিটির গোড়াতে নাম ছিল - স্বীকৃত চার্চের নিয়মানুযায়ী দরিদ্রদের জাতীয় শিক্ষা-সমিতি (The National Society for the Education of the Poor in the Principles of the Established Church)। এর পরবর্তী নাম জাতীয় শিক্ষা-সমিতি (The National Society)। বেল সাহেব হ'লেন এর ম্যানেজার। ধার্মিক লোকে এবার ল্যাঙ্কাস্টারের খাত থেকে টাকা টেনে এনে এখানে জমা দিলেন।

কিছুকাল পর এই সর্দার-পোড়ো পদ্ধতি অকেজো ব'লে মনে হ'ল। মনুষ্য-সমাজ ভেঙে-পড়ার প্রাক্কালে যেমন নতুনের প্রতি একরোখা, তেমনি টিকে-থাকার সময় পুরোনোর ভালোমন্দ বিচারের প্রতি উদাসীন। কোনক্রমে একবার একটি বিষয় চালু ক'রে দিতে পারলে তার পরিবর্তন আর সহজে করতে হয় না। সর্দার-পোড়োর পদ্ধতিও এইরূপে ব'হে চলল। বহু ইস্কুল স্থাপিত হ'ল। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে দুটি দিক স্পষ্ট হ'ল—একটি ধর্ম-চর্চা নিরপেক্ষ শিক্ষার মনোভাব, দ্বিতীয়টি ইংরেজ-চার্চের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি। ব্যক্তিগত পরিচালনায় এই শিক্ষা চলতে থাকল, দরিদ্রদের প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষে বুঝতে শিখল, এই শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসা উচিত। দরিদ্রদের এই প্রাথমিক শিক্ষা যন্ত্রযুগের নীতিকেই মেনে চলল অবশ্য। একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, "যন্ত্র-কারখানার এবং ইস্কুলের শিক্ষা একই নীতিতে বাঁধা। ডক্টর বেলের পদ্ধতি বুদ্ধির রাজ্যে শ্রম-বণ্টন নীতিরই প্রয়োগ বিশেষ (The principle in schools and manufacturing is the same. The ground principle of Dr. Bell's system is the division of labour applied to intellectual purposes)।"

শিক্ষা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আসা উচিত, এ বিষয় বলতে গিয়ে হুইটব্রেড এবং ব্রঘাম্‌কে নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল ১৮১৬ থেকে ১৮২০-এর মধ্যে। কাজেই চার্চ, চার্চ-নিরপেক্ষ এবং অবাধ-নীতি-মান্যকারী তিনটি দলের কাছ থেকেই তাঁরা বিরূপ মন্তব্য পেলেন। অথচ ১৮০০-এর বিবাহ-আইনপত্র থেকে জানা যায় তখন পুরুষের ⅓ অংশ এবং মেয়েদের ½ অংশ তাদের নামই লিখতে জানত না। আর সমিতির চেষ্টায় এ-ব্যাপারে ৮ বৎসরে যে উন্নতি ঘটেছিল তা এতই নগণ্য যে, মিথ্যা-কুহেলী-আচ্ছন্ন সেই পরিসংখ্যানের সংখ্যাতেও লেখা কঠিন। হার্বার্ট-স্পেন্সার পর্যন্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব শিক্ষা মানতে চান নি। একমাত্র জন স্টুয়ার্ট মিল শিশুদের শিক্ষায় এবং ফ্যাক্টরীর কাজে অবাধনীতি বজায় রাখার বিরোধী ছিলেন। ১৮৭০-এর শিক্ষা-বিধিতে তাঁর বক্তব্যের অনেকখানি প্রভাব দেখা যায়। 'মিল' শিক্ষা সম্পর্কে অনেক প্রগতির কথা ভেবেছেন। নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্যও তিনি কলম ধ'রে গেছেন। এঁর

সঙ্গে এলেন কার্লাইল, ডিকেন্স এবং রাস্কিন। এঁদেরই মতবাদে রাষ্ট্রকে অনেকখানি এগিয়ে আসতে হ'ল।

যাই হোক, কাদের জন্য এই শ্রমিক অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করল জানিনা, তবে সমাজ-চেতনা তখন এই দিকেই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শিশুদের স্বাস্থ্য ও নীতি সম্পর্কে যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল সেখানেও তাদের শিক্ষা দেবার কথা স্বীকার করা হয়। তারপর থেকে ১৮১৯, ১৮৩৩ এবং ১৮৪৪-এর ফ্যাক্টরী-শিশু আইন শিশুদের এ-জগতে বসবাস করবার এক বিশেষ অধিকার দিল। তা ছাড়াও সামাজিক কাজে-কর্মে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা এই যুগে দেখা যায়।

আর ছিল কে-শাটলওয়ার্থের একক শক্তি। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'ইস্কুলকে সাহায্য দেবার পার্লিমেন্ট সমিতির' প্রথম সম্পাদক। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দেই এই সাহায্য রাষ্ট্র-সভা দিতে সুরু করে, তবে ১৮৩৯-এ এই সাহায্যদান সমিতি নিয়মবদ্ধ হ'ল বলা যায়। ১৮৫০ থেকে ১৮৭৯ এর মধ্যে শিক্ষা কমিসনও কম বসেনি। ১৮৬১ তে ক্লারেণ্ডন কমিসন (পাবলিক স্কুল প্রসঙ্গে), টওনটন কমিসন (১৮৬৪-৬৭ : সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রসঙ্গে)—আরও কত! তবে ইংল্যাণ্ড তখনও এটমিক যুগে পড়েনি বলে তখনও সভ্যতার তেমন ফাঁকি-জুকি দেখা দেয়নি। কমিসন বসলেই তার মতামত নিয়ে কিছু একটা আইন করতই!

এরই মধ্যে নিউক্যাসল কমিসন (১৮৫৮-১৮৬১) একটি অপকর্ম করলেন। তাঁদের প্রস্তাব হ'ল : (১) চার্চ শিশুদের শিক্ষার যে ভার নিয়েছে তার উপরই রাষ্ট্র অনেকটা নির্ভর করতে পারে, (২) আর পাসের হার বা উত্তীর্ণ সংখ্যা দেখে ইস্কুলের সাহায্য হার নির্ধারণ করা উচিত। তখন কাউন্সিল অব এডুকেসনের সহ-সভাপতি রবার্ট লাও (Robert Lowe)। তিনি তো হাতে তালি দিয়ে 'মার দিয়া কেল্লা' বলে নেচে উঠলেন। কারণ তাঁর নজর সাহায্যবৃত্তি হ্রাস করার দিকে। টাকা অনেক কমানো গেল বটে, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড আর দেশের শ্রমিক সঙ্ঘ এমন অবস্থার দিকে এগিয়ে চলল যাতে শিক্ষার একটা সুরাহা না করলে আর চলে না। দলগত রাজনৈতিক চাল

সাধারণ মানুষ তখনও ততটা বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু নিজদের অভাব-অভিযোগ তারা বুঝতে শিখেছিল। একদিকে আছেন ডিসরেলী। ইনি ভোটের অধিকার শ্রমিকদের প্রদান ক'রে ভোটের এলাকা বিস্তৃত করতে চান; অন্যদিকে আছেন গ্লাডস্টোন যাঁর পৈতৃক সম্পত্তির প্রেরণা আর লিভারপুলের নিজস্ব ব্যবসায়-উৎস আলোকপ্রাপ্ত স্বার্থান্বেষীর মনটিকে আয়ত্ত করতে বাধ্য করল। এরই মাঝে চলছেন সম্রাজ্ঞী। বারবার বলছেন, 'দরিদ্রদের জন্য কিছু করুন; ওদের উপেক্ষা করবেন না।' বীয়ারের উপর ট্যাক্স, ম্যাচের উপর কর প্রভৃতি নিয়ে তাঁর অনুরোধ-উপরাধ উল্লেখযোগ্য। গ্লাডস্টোন যেন মরীয়া হ'য়ে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নতিকল্পে উঠে-পড়ে লেগেছেন। সব প্রতিভাই প্রতিভা নয়; কুশাসন যে করে সে রাহু ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুপাল ভালো বক্তৃতা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে মরবার পূর্বে; কংস প্রচণ্ড শাসন করতে পারতেন। সাঁতার কাটতে গিয়ে মানুষই ডোবে; কারণ, তার বুদ্ধি আছে; জন্তু-জানোয়ার ডুবতে জানে না। গ্লাডস্টোনের শাসনকালও এমনি দুর্যোগপূর্ণ।

এই সময়েই ১৮৭০ এর শিক্ষা-বিধি নিরূপিত হ'ল। এই আইন প্রণয়ন করলেন ফর্স্টার। এই শিক্ষা-আইনই বিলাতের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান ধাপ; প্রত্যেক ছেলেমেয়েই ইস্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করবার অধিকারী হয়, অল্প বেতন; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে এই শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যিকও করতে পারতেন; ছাত্রসংখ্যা বিশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে পড়ল; ১৮৮০-তে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনের পক্ষে আবশ্যিক ক'রে দেওয়া হ'ল, ১৮৯১-তে এই শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হ'ল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'বোর্ড অফ এডুকেসন' স্থাপিত হল; সভাপতি হল্লেন—ডিউক অফ ডিভনশায়ের আর জন গর্স্ট হলেন পার্লিমেণ্টারী সেক্রেটারী। এর পর প্রধান মন্ত্রীত্ব নিলেন ব্যালফুর, তিনি রবার্ট মোরাণ্ট—১৯০২ খৃষ্টাব্দে আর একটি শিক্ষা আইন প্রণয়ন করলেন।

১৮৭০ এর আইনে 'পাবলিক এলিমেণ্টারী স্কুল'—কথাটার প্রথম ব্যাখ্যা করা হ'ল এইভাবে:

(১) ধর্মীয় ভিত্তিতে বা অধিকারে কোন ছেলেকে ভর্তি করায় আপত্তি করাও চলবে না, অনুমোদন করাও চলবে না।

(২) ধর্মঅনুশাসন ব্যাপার ইস্কুল বসার আগে বা শেষ হওয়ার দিকে নির্বাহিত হবে; এবং অভিভাবকের ইচ্ছাক্রমে যে-কোন ছেলে এ কাজে যোগদান না করতেও পারে।

(৩) সরকারী পরিদর্শক ইস্কুলের খাতাপত্র যে-কোন সময় এসে পরীক্ষা করতে পারেন; কিন্তু কি ভাবে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে-অনুসন্ধান করা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না।

(৪) ইস্কুলের বেতন হিসাবে সপ্তাহে ৯ পেন্সের বেশি আদায় করা চলবে না; প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ত 'সার্টিফিকেট'-এর অধিকারী হতে হবে; ছাত্র সংখ্যানুপাতে শিক্ষক সংখ্যা স্থির করতে হবে।

শিক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে আর বর্ধিত হবে বলে এই আইন ইংল্যণ্ডকে কতগুলো শিক্ষা-অঞ্চলে বিভক্ত করা হ'ল। সরকার দেখবে, এইসব অঞ্চলে শিক্ষা-প্রসার ঠিকমত হচ্ছে কিনা। এই আঞ্চলিক কর্ম-কর্তারা ইচ্ছে করলে স্কুল বোর্ড তৈরী ক'রে নতুন ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ইস্কুল-গুলোকেও দুটোভাগে ভাগ করা হ'ল: (১) শিশুদের ইস্কুল—৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু এখানে পড়তে পারবে; (২) বড় ছেলেদের ইস্কুল—৭ বৎসর বয়স থেকে ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। উপস্থিতি সংখ্যা আর বিষয়-হিসাবে বৃত্তি প্রদান করত সরকার। এ ছাড়া সান্ধ্য-ইস্কুলও ছিল।

আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষই ইস্কুলগুলো পরিচালনা করতেন; রাষ্ট্র কেবল অর্থসাহায্য করত। ইচ্ছা করলে এই সব ইস্কুল সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদও করতে পারত। শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, বা শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ সব কিছুতেই ইস্কুল স্বাধীন ছিল; সরকারী পরিদর্শক কেবল ফলাফল দেখতেন। কি-কি বিষয় পড়ানো হত? লেখা, পড়া আর অঙ্ক কসা। আর ফলের ভিত্তিতে শিক্ষকের মাইনে। এর দরুণই না-বুঝে মুখস্থ বা 'ঠোঁটস্থ' করা পদ্ধতি খুব চালু ছিল। স্নেহ ছিল না, প্রীতি ছিল না, স্বাস্থ্য থাকল না; বুদ্ধি বাড়ল না এই বিষম ব্যাপারে।

বড় ছেলেদের ইস্কুলে ৭টি শ্রেণীস্তর ছিল। বিষয়গুলি হচ্ছে—পড়া, লেখা, আঁক কসা, মেয়েদের জন্য সীবন, আর ছেলেদের জন্য অঙ্কন; এ ছাড়া থাকল ঐচ্ছিক বিষয় (নিতেও পারে, না নিতেও পারে)। এর মধ্যে ইংরেজি, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, এবং ইতিহাস (যে-কোন দু'টি বিষয় নিতে পারে); তারপর কিছু থাকল বিশেষ বিষয় (Specific Subjects)। ব্যক্তিগতভাবে যেমন—বীজগণিত, জ্যামিতি, যন্ত্রবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, গার্হস্থবিজ্ঞান (মেয়েদের জন্য), জার্মান এবং হিসাব-নিকাশ বিষয়। মেয়েদের জন্য একটু গান, রান্না এবং বস্ত্র ধৌতি। এতগুলি বিষয় ছিল নির্দেশ-পত্রে; তবে সব ইস্কুলেই এর সব বিষয় পড়বার সুযোগ ছিল না।

যাই হোক ধর্ম-শিক্ষা বিরোধী মনোভাব এই আইনে থাকলেও, দেশে তার প্রভাব অনেকখানিই ছিল; আইনে এইটুকুমাত্র বোঝা গেল, 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায়' কথাটির ধার অনেকখানি ভোঁতা হয়ে এসেছে; কিন্তু সব ইস্কুলেই সমস্ত বিষয় পড়বার মতো সুযোগ দিতে পারল না। শিক্ষা-বিভাগের সাহায্য বেশী পাওয়া যাবে কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানোয়—তার উপরেই ইস্কুলের বিষয় প্রবেশ ঘটল। তার ফলে ছেলেরা খুব কম বিষয়ই শিখতে পারত। তবে একথা সত্য, পড়ানোর 'ব্যাপ্তি' থেকে 'যথাযথ' (accuracy) দিকটি এইসব ইস্কুলে প্রধান ছিল। আর ১৮৯০-এর দিকে ইস্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেল; 'আবশ্যিক' হিসাবে পড়া—অভিভাবক, ছাত্র প্রভৃতি সকলের তরফ থেকেই এক রকম মেনে নেওয়া হ'ল। এর মূলে অনেখানি আইন ছিল, অবশ্য বিরুদ্ধতা যে না ছিল তা নয়।

এই সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অন্যরূপ। কোন অবৈতনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। আবার বেতনও এমন যে ধনী ছাড়া সে-বেতনের ভার বইতে পারত না কেউ। তবে কতকগুলো স্কুল-বোর্ড, সপ্তম-মান উত্তীর্ণ ছেলেদের 'সেন্ট্রাল' ইস্কুলের কিছুদূর পর্যন্ত পড়বার সুযোগ সুবিধা দিতে থাকে। তা ছাড়া ছিল সান্ধ্য-ইস্কুল; এখানে ১৪ থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত-ও তারা

পড়তে পারত। প্রাথমিক ইস্কুলের মেধাবী ছেলেরা বৃত্তি নিয়ে মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়বার সুযোগও কিছু পেল।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের টাকায় অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিত্তালয়ের বিধাতারা বার্মিংহামের ধারে-কাছে দুটো উচ্চ বিত্তালয় খুলেছিল (একটি ছেলেদের, অন্যটি মেয়েদের); তা ছাড়া ছিল সাতটি গ্রামার ইস্কুল। গ্রামার ইস্কুলকে অবশ্য ঠিক উচ্চ-বিত্তালয় বলা যেত না; যারা তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করতে চায় তাদের জন্য এই ইস্কুল; পাঠ্যসূচীও তেমনিভাবে নিরূপিত হ'ত। ছেলেদের উচ্চ বিত্তালয়টি বিশ্ববিত্তালয়ে পাঠগ্রহণ করবার উপযুক্ত ছাত্র তৈরী করত। উচ্চবিত্তালয়ের বেতন গ্রামার ইস্কুলের থেকে প্রায় চারগুণ বেশী ছিল। তবে গ্রামার ইস্কুলের অর্ধেক ছাত্র প্রাথমিক ইস্কুল থেকে আসতে পারত।

তা ছাড়া জোসাইয়া ম্যাসনের টাকায় তৈরী হ'ল ম্যাসন্'স কলেজ (৮৮১ খৃষ্টাব্দে)। এত সত্ত্বেও একথা সত্য দরিদ্র প্রাথমিক ছাত্রেরা উচ্চ-শিক্ষা সমস্যায় উদ্‌ব্যস্ত ছিল বটেই। প্রাথমিক শিক্ষাও যে এর ফলে ভেঙে পড়বে একথা তো বোঝা যায়ই। তা ছাড়া আরও একটা কথা, প্রাথমিক ইস্কুলের সঙ্গে মাধ্যমিক ইস্কুলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কারণ অতি স্পষ্ট। প্রাথমিক ইস্কুলে ছেলেরা পড়ত ৫ থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত; আর মাধ্যমিক ইস্কুলে ৭ থেকে ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত। মাধ্যমিক থেকে তারা যাবে বিশ্ববিত্তা্লয়ে; আর যারা যাবে না, তারা প্রস্তুত হবে ব্যবসায়িক জীবনে অথবা অন্যান্য দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য। কাজেই এক ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না।

আমরা আগেই দেখেছি গ্রামার ইস্কুল উচ্চ-মধ্যবিত্তদের প্রধান শিক্ষার আড্ডা হিসেবে চালু হয়েছিল। এই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমাদের দেশের মতো নয়, এই রকম এক শ্রেণীর জন্যই গ্লাডস্টোন সমগ্র জীবন সংগ্রাম ক'রে গেছেন, আর এই একচক্ষু-মনা মানুষটিকে বারবার নিবৃত্ত করেছেন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া। এখানে এই সময় ছেলেরা ৭ বৎসর বয়স থেকে সুরু ক'রে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারত। লাতিন-গ্রীকের সঙ্গে তারা অঙ্ক-ও শিখত বিশ্ববিত্তালয়ের মুখ চেয়ে। অপর একটা] দল সিভিল-সার্ভিস

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'ত। এঁরাই আসতেন ভারতবর্ষে ছড়ি ঘুরোতে জেলায় জেলায়। আর এক দল যেতেন সৈন্য বিভাগে। শেষ দল যেতেন ব্যবসাবাণিজ্যকে অবলম্বন ক'রে—এঁরা ভারী 'মডার্ণ'-এর পক্ষপাতী। অর্থাৎ যুগোপযোগী শিক্ষা-কে গ্রহণ করতেন। ১৩ থেকে ১৯ বয়স পর্যন্ত এদের ভাগ করা হ'ত 'ফর্ম' (form) অনুযায়ী; আর ষষ্ঠ স্তর বা ফর্ম হচ্ছে সব চেয়ে উঁচুতে। পোষাকেরই বা কত নিয়ম বাঁধুন! টুপি পরতে হবে, কালো কোট পরতে হবে, আরও কত কি! কমে গেলেও শারীরিক শাস্তিবিধান বেশ চালু। গ্রামার ইস্কুলের একটা কার্যতালিকা দেওয়া যাক:

সকাল ৯টা ৫ মিনিটে ইস্কুল সুরু হ'ত। এই সময়ে প্রার্থনা। যারা প্রার্থনায় যোগ দেবে না, তারা ঐ সময়ে অন্য একটা ঘরে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে জমায়েত হবে। অসুখবিসুখ হ'লে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিতে হবে। বাড়ীর কাজেও ঘণ্টা মেপে দেওয়া হ'ত। শনিবারে একটু ছাড়াছাড়ি ভাব ছিল। কেউ বাড়ীতে কাজ না করলে অভিভাবককে প্রধান শিক্ষকের গোচরে আনতে হ'ত; তবে বাড়ীর কাজে কারও সাহায্য নেওয়া বারণ। আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত, তবে বাড়ীর-পড়া বাদ দিয়ে নয়। বাসে ট্রামে ট্রেনে অসভ্যতা করলে শাস্তি পেতে হ'ত! ধূমপান নিষিদ্ধ—কোথায়ও ধূমপান করা চলবে না। শাস্তি হিসাবে বেত তো ছিলই, আর্থিক জরিমানাও ছিল।

নানারকম প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব ক্রীড়ায় দেখা যেত অনেক পাবলিক ইস্কুল থেকেও তারা ভালো। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব ইস্কুলও বোর্ডিং রাখতে সুরু করল; হাসপাতাল-খেলার মাঠ—সব ব্যবস্থাই থাকল। পাবলিক ইস্কুলের সঙ্গে গ্রামার ইস্কুলের পার্থক্য এখন শুধু পাঠ্যসূচীতেই থেকে গেল।

১৯০২-এর আইনে স্কুল-বোর্ডগুলিকে বিলুপ্ত ক'রে তার যায়গায় স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ (Local Education Authorities) বিভাগ তৈরী করা হ'ল। তা ছাড়া এই আইনের বড় কাজ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় একই কর্তৃপক্ষের অধীনে আনা।

শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তা হ'লে পরিচালকদের কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি—নাম হ'ল বোর্ড-অফ-এডুকেসন;

এখানে শিক্ষামন্ত্রী সভাপতি, পাঁচজন রাষ্ট্র-সম্পাদক (Secretaries of State) অর্থ-ভাণ্ডারীর প্রথম কমিসনার (First Commissioner of the Treasury) এবং অন্ততঃ চ্যান্সেলার অফ এক্স-চেকার (Chancellor of Exchequer)। তবে এই সমিতি কাগজে পত্রেই থাকল। এর আর অধিবেশন হ'ল না। মন্ত্রী যখন আছেন তখন খরচ-খরচা এবং আয়-ব্যয় সবকিছু পার্লামেণ্টে আলোচনা হ'তে পারত।

যাই হোক, দেশটাকে ৯টি ভাগে ভাগ করা হ'ল; প্রত্যেকেরই দায়িত্ব থাকবে তিন রকম শিক্ষায়—(১) লোক প্রাথমিক শিক্ষা, (২) শিল্প সম্পর্কীয় এবং অব্যাহত বিদ্যালয় (technical & continuation schools), (৩) মাধ্যমিক এবং শিক্ষকের প্রাথমিক প্রস্তুতি কেন্দ্র (Preparatory Teachers Centres).

স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগে পড়ে। এখানে শিক্ষা সমিতি গড়া হ'ল। এঁদের ভার ইস্কুলের শিক্ষা-প্রসারের উপর। সাধারণত, বুধবার এদের বৈঠক বসত, জনসাধারণ উপস্থিত থাকতে পারত। এদের ক্ষমতা ন'টি শাখা বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এঁরা দু' শ্রেণীর ইস্কুল গণ্য করলেন; সাহায্যপ্রাপ্ত (Provided) এবং স্বয়ং চালিত (Non-Provided or Voluntary)। ইস্কুলগুলো দেখবার জন্য ম্যানেজারের পদ সৃষ্টি করা হ'ল। স্বয়ংচালিত ইস্কুলগুলোর অট্টালিকা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বটে, কিন্তু শিক্ষকদের মাইনে-পত্তর পার্লামেণ্টের সাহায্য থেকেই দেওয়া হ'ত।

১৯১৮-এর আগের আইনেও ৫ থেকে ১৪ বছরের সুস্থ ছেলেদের ইস্কুলে পড়া আবশ্যিক হিসাবে ছিল। তবে ৩ থেকে ৫-এর মধ্যেও যে কম ছেলেমেয়ে পড়ত তা নয়; কিন্তু টাকা-পয়সার সঙ্কুলানের কথাও ভাবতে হ'বে তো। কাজেই 'না না তোদের দরকার নেই,' ভাবটা ছিল। ১৯১৯-এর পর তো ৬ বৎসরের আগে ইস্কুলে পাঠানোতে উৎসাহ দিল না। কারণ—সেই অর্থ-সমস্যা। আবাশ্যক করা ভালো, শিক্ষিত করাও ভালো, কিন্তু অর্থ-সমস্যা এলেই আবার ভাবতে হয় 'কাটান-প্যাচ' কি ভাবে দেওয়া যায়। আসল কথা, কর্তা কর্তৃপক্ষের নীতিই দেশের নীতি ব'লে চালিয়ে দেওয়া মনুষ্য সমাজে এক বিশেষ রীতি। তাই 'কর্তার ভূত' না হ'লে লোকের চলে না।

এই সময়ে এক নতুন নামকরণ নিয়ে এক ধরণের ইস্কুল এল—'সেণ্ট্রাল স্কুল'। এ এক ধরণের গোঁজামিলের ইস্কুল। অনেকটা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গোছের। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে ভালো ছেলেমেয়েদের এখানে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হ'ল। ১১ বছরের বালক-বালিকা ৪ বৎসরের মেয়াদে এখানে এসে ভর্তি হ'ত। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কিছু কিছু শারীরিক আর মানসিক পরীক্ষা দিয়ে এখানে তারা আসত। যে-অঞ্চলে এই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা সেই অঞ্চলের শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে একটা পাঠ্যসূচী স্থিরীকৃত হ'ত। কাঠের কাজ, মাটির কাজ, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি নানা রকমের বিষয় পড়া যেত এখানে। লণ্ডন অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রেই এসব ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বেশী। লণ্ডনের পক্ষে প্রয়োজনও বটে; কেরানী চাই, কারিগর চাই। এসব ইস্কুলের পড়ানোর লক্ষ্য হচ্ছে—ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সাধন, চাকুরে তৈরী করা—শরীর মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ উদ্দেশ্য নয়। ১৯১৮-তে এর স্বপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি দেওয়া হয়েছিল অবশ্য। তবে কথা হচ্ছে কি, যুক্তি চোরের পক্ষে যতখানি প্রয়োজন গৃহস্থের পক্ষে বোধহয় ততখানি নয়।

১৯১৮-এর আইন (ফিসার এ্যাক্ট) কেন তৈরী হ'ল? ১৯০২ থেকে ১৯১৮ কতটুকু বছর। ১৮৭০ থেকে ১৯০২ হচ্ছে ৩২ বছরের ব্যবধান, কিন্তু পরেরটির ব্যবধান মাত্র ১৬। শাসকবর্গের কাজ-কর্ম দীর্ঘ মেয়াদী ক'রেই সুরু হয়, কারণ তাঁরা গদীকে স্থায়িত্বের আসনে রাখতে চান, আর 'টেকসই' কিছু করতে গেলেই অর্থ বরাদ্দের আধিক্য সম্পর্কে পার্লামেণ্টে যুক্তি দেখানো সহজ। কিন্তু মানুষের চৈতন্য যখন একবার জাগতে সুরু করে তখন শাসকদের পরিকল্পনাকে অঙ্কের কঠোর নিয়মে স্বল্প মেয়াদী ক'রে দেয়। উইলিয়ম বয়েডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে (১৯২১): "In this land, according to the politicians, who made themselves the spokes man of the national desire, the great body of the people were to enjoy a better life than they had done in pre-war times." অস্যার্থ: যে সব রাজনীতিবিদ্ নিজদের মনে করেন জাতীয় বাসনার প্রবক্তা,

তাঁদের সূত্র অনুযায়ী দেশের বিপুল জনসাধারণ যুদ্ধ পূর্ববর্তী কালের চেয়ে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে চায়।" কেন চায়? প্লেগ, মহামারী, যক্ষ্মায় তাদের জীবন ছেয়ে গেল যুদ্ধের দক্ষিণায়। অর্থ সঙ্কুলান হয় না বললে আর লোকে শোনে না, তারা দেখেছে যুদ্ধের দরুণ কোটি কোটি টাকা কেবল হাওয়ায় উড়ে গেছে; কোত্থেকে এসেছিল এসব টাকা?

কাজেই একটা ধোঁকা দেওয়া হ'ল এই ১৯১৮-এর আইনে। বিশ্বজগতে যেমন সূর্য গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির মধ্যে একটা 'টান' আর 'ছুট'-এর টানাপোড়েন আছে, রাজনীতিতেও তেমনি। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল, মাতৃক্রোড় থেকে সমাধির পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জীবন-পরিক্রমার সমস্ত শিক্ষার স্তরকে হাতে নেওয়া হ'বে, কিন্তু রহস্যজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরকে এই আইনে বাদ দেওয়া হ'ল। তবে এ ত্রুটি সত্ত্বেও এই আইনের মধ্যে নেওয়া হ'ল—নার্সারী স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক, অব্যাহত শিক্ষা, এবং কারিগরি। তা ছাড়া থাকল শারীরিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা। এইসব দিক দিয়ে বিচার ক'রেই বলা হয়, এই আইন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-বিধিতে প্রগতিমূলক বিধান। তবুও বলতে হয় ৮ বছরের মধ্যেই হ্যাডো কমিটির প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই এই আইনকে পরিশোধিত করবার চেষ্টা। এই কমিটি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেকার অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ১১ বছর বয়স পর্যন্ত, তারপর প্রাথমিকোত্তর ১১ থেকে ১৪, তারপর মাধ্যমিক। এই প্রাথমিকোত্তর আর মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে গোলমাল থাকল। গোলমালগুলো নিয়ন্ত্রিত হ'ল অনেকটা 'উপযুক্ত' কথা নিয়ে, ছেলেদের বাছাই ক'রে দেওয়া হবে। বাছাই, না, খারিজ? নানা রকমের পরীক্ষা-পদ্ধতি এল—তার মধ্যে মানসিক পরীক্ষা (Psychological test)। মানব-সংস্কৃতি বা মননবিদ্যা শিক্ষার (humanitics) লক্ষ্যকেও পরিবর্তিত করা হ'ল। কেবল বই পড়ানো হবে না, বৃহত্তর মানব-স্বার্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে। কি ভাবে? পাঠ্যসূচীতে মানবজাতির কার্যবিধি এবং ব্যবহারিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

এরপর ১৯৩১-এ শ্রমিক-সঙ্ঘ যখন রাজ্যশাসন ভার পেল তখন আর একটি আন্দোলন তোলা হল, বয়সের নির্ধারণকে বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বয়স

নিরপেক্ষভাবে মানুষের বাড়ে বটে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেখানে সরকারী টাকা দেওয়ার কথা, সেখানে বেশীদিন ছেলেদের রাখতে হ'লে মূলেই যে বাধা আসবে। কিন্তু টাকার অভাবের যুক্তিটি উড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি দেখা যায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অন্যদিক দিয়ে বেশী সংরক্ষিত হবে। ছেলেদের শিক্ষাকাল যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে শিল্প-কারখানার উপর চাপ কম পড়বে, বয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সংস্থান হবে। কারণ, কারখানার মালিকেরা ছেলেদের শ্রমিক হিসাবে বেশী পছন্দ করত, তাদের নিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তারা বাধ্যও বটে। এই প্রলোভনকে বানচাল করতে হলে—তাদের শিক্ষাকাল বাড়িয়ে দিতে হয়, যাতে শ্রমিক হিসাবে তাদের পাওয়া দুর্ঘট হতে পারে।

কিন্তু ভিতরের এ সব ফন্দি থাকা সত্ত্বেও একটা কথা স্বীকার করতে হবে, এই সময় থেকেই ইংল্যাণ্ড শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে চেয়েছিল, বহুবিধ মানসিক গঠনের লোকের জন্য বহু রকমের ইস্কুল প্রবর্তন করার কথা ভাবছিল ; এইখানেই ইংরাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। আশু প্রয়োজনীয়তায় পাশাপাশি সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি তারা বেশ বজায় রাখতে পারে। এই ধারাকে অনুসরণ করলে, এই যুগে আমরা সাধারণ ইস্কুল বিভাগ বাদ দিয়ে আর কয়েকটি বিভাগকে দেখতে পাই :

(১) পরীক্ষামূলক ইস্কুল : এর মধ্যে আছে ডালটন ল্যাবরেটরী প্ল্যান। এই প্ল্যানকে বলা যেতে পারে মন্তেসরী আর ডিউঈ-এর মধ্যবর্তী পন্থা। মামুলী ইস্কুলগুলো যেমন সংস্কৃতি পোষণের জন্য, এ ইস্কুলগুলোকে বলা যেতে পারে—অভিজ্ঞতা-সংযোজনের ইস্কুল। এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাকে মনোজ্ঞ ক'রে ছেলেদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়, এক রকমের সামাজিক হয়ে ওঠার ইস্কুল বলা যায়।

(২) কোম্পানী ইস্কুল (Works Schools) : কোম্পানীর আয়ত্তে শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা দেবার জন্য এইসব ইস্কুল। এদের মধ্যে আবার বিভিন্ন নামকরণ ছিল : (ক) প্রাথমিক পরিচয় (Initiation School) সংক্রান্ত ইস্কুল। এখানে ফ্যাক্টরীর জীবনধারার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় সাধন করতে হবে তার

শিক্ষা দেওয়া হবে ; (খ) ছুটির সময়ের ইস্কুল (Vacation School) ; (গ) তাঁবু-র ইস্কুল (Camp School) ; (ঘ) শিক্ষানবিশী (Apprenticeship Scheme) ।

কোম্পানী ইস্কুলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—কোম্পানীর বিশেষ বিশেষ কাজকর্মগুলো তাদের কর্মীরা শিখে নেবে ; এখানে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হ'ত ।

(৩) ফেলোশিপ ইস্কুল : এখানে সবরকম বয়সের ছাত্র থাকত। বেশীর ভাগ ইস্কুলে সহশিক্ষা ছিল। এসব ইস্কুলের উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা সমন্বিত ভাবে স্বাধীনতা এবং আত্মশাসণ শিক্ষা দেওয়া ; প্রাপ্তবয়স্কদের জীবন-যাত্রার এক ক্ষুদে সংস্করণ এই ইস্কুল। কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা নেই, কোন পারিতোষিক বিতরণ নেই, পরীক্ষার নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থাও নেই। এইসব ইস্কুল ব্যক্তিগত পরিচালনায় চালিত, বেতনের হারও খুব বেশি ছিল। ইস্কুল যে-কারাগার, এই নিয়মকে মেনে নিয়ে এইসব ইস্কুল যেন উল্টো চালে চলছিল। তবে সাধারণ লোকের উপর এদের প্রভাব খুব বেশী ছিল না।

(৪) পাবলিক ইস্কুলের পথ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিউ পাবলিক ইস্কুল ব'লেও কতকগুলো ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এইসব ইস্কুলে বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্যের দিকে নানারকম গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করত। এখানে মিউজিয়াম, চিত্রশালা প্রভৃতি আছে। ছেলেদের কিছু কিছু কাজকর্ম করবারও ব্যবস্থা থাকল ; যেমন—বাগান করা, শিল্পকলার চর্চা প্রভৃতি।

(৫) সামার ইস্কুল : কিছু কিছু ইস্কুল শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদের অধীনে কিছু বোর্ড অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে এইসব ইস্কুল। তবে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী হ'ত না।

এইসব ইস্কুলের উদ্দেশ্য ছুটির সময়কে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনা ; প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দেশ-বিদেশ দেখা, এর কার্যতালিকার মধ্যে। এর পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য ছিল কিছু কিছু বিভাগে বিশেষজ্ঞ ক'রে ছাত্রদের তৈরী করা। বিষয়ের মধ্যে ছিল—ইংরেজি, ভূগোল, অঙ্ক, সঙ্গীত, শিল্প, ইতিহাস, গ্রামের শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি। কোন কোন ইস্কুলে ব্যবস্থা ছিল ; (১) সাহিত্য-বিভাগ,

(২) গার্হস্থ্যবিষয়, (৩) পেছিয়ে পড়া ছেলেদের সম্পর্কে জ্ঞান, (৪) ধাত্রীবিদ্যা শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

কাজেই দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইংল্যাণ্ড সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বহুদিক দিয়ে শিক্ষা-গ্রহণের উপযোগী ইস্কুল গড়ে তুলেছিল। এর মধ্যে সব ইস্কুলই যে ইংল্যাণ্ডে প্রথম জন্ম নিয়েছে তা নয়, অনেকগুলির আদর্শ এসেছে জার্মানী থেকে। যাই হোক, জাতিসঙ্ঘও (League of Nations) পরবর্তী কালে এর অনেক আদর্শই শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু তবু বলব, এ যুগটা নিতান্তই শিক্ষার জীবন-চাঞ্চল্যের যুগ; এই চাঞ্চল্যকে তখনও সঠিক খাতে প্রবাহিত করা হয় নি। সেই কাজটিই হল ১৯৪৪এর আইনে। আবার ১৯৪৪এর আইনকেও বিন্যস্ত করা হ'ল যুদ্ধের পরে। আগে সম্ভব হয় নি, কারণ যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যার জন্যে নতুন সাজে ইস্কুলগুলোকে সাজাতে হ'ল। মোটামুটি যে-পরিবর্তন হয়েছে সেইগুলি আমরা এখানে দেখি।

প্রথম পরিবর্তন ঘটল প্রাথমিক শিক্ষার। প্রাথমিক ইস্কুলের নাম ছিল এলিমেণ্টারী স্কুল; নাম পরিবর্তন ক'রে দিয়ে নাম রাখা হ'ল—প্রাইমারী স্কুল। প্রায় ২০,০০০ এই ধরণের ইস্কুল ছিল। এদের সবাইয়ের নামই হ'ল—প্রাইমারী স্কুল। ১১ বছরের নিচেকার ছেলেরা এখানে পড়ত। এই বয়সের উপরের বয়সের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের নাম হ'ল সেকেণ্ডারী। প্রাইমারী স্কুলের অধীনে তিন রকমের ইস্কুল: (১) নার্সারী (২-৫ বছর বয়স), (২) ইনফ্যাণ্ট (৫ থেকে ৭ বছর বয়স), (৩) জুনিয়র (৭ থেকে ১১)। সাধারণত পৃথক-পৃথক শিক্ষায়তন ছিল এদের জন্য; বিশেষ ক'রে নার্সারীর; সচরাচর ৪০টি শিশুদের নিয়ে এই বিভাগ। এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের চার্চীয় ইস্কুলগুলো বিপদে পড়ল; বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে যখন গ্রামের ইস্কুলগুলো সম্পর্কে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ভাবতে সুরু করলেন।

কতগুলো এলিমেণ্টারী ইস্কুল সেকেণ্ডারীতে রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু এই রূপান্তরণে ছাত্র বা শিক্ষক যে খুব উপকৃত হ'ল তা নয়।

সেকেণ্ডারী ইস্কুলের তিনটি শাখা—(১) গ্রামার, (২) টেকনিক্যাল, এবং

(৩) মডার্ণ। মডার্ণ ইস্কুল প্রায় সর্বসাধারণের জন্য। জুনিয়র টেকনিক্যাল ইস্কুলগুলি সেকেণ্ডারীতে রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু বিষয়গতভাবে সেকেণ্ডারী ইস্কুলগুলোকে এইভাবে ভাগ করে দেওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে আপত্তি উঠতে থাকে। সেই আপত্তি নিরসনের জন্য দ্বিতীয় ব্যবস্থা হ'ল যে—

(১) দুই ধরণের ইস্কুলের বিষয়কে নিয়ে ইস্কুল-পাঠ্যসূচী নিরূপিত হ'তে পারে—এগুলিকে বলা হয় বাইলেটারাল ;

(২) তিন ধরণের ইস্কুলের বিষয়ই একটা ইস্কুলে থাকতে পারে—নাম দেওয়া হ'ল মালটিলেটারাল ;

(৩) নির্দিষ্ট অঞ্চলের সেকেণ্ডারী শিক্ষায় যা-যা প্রয়োজন তা নিয়েও ইস্কুল হ'তে পারে—নাম কম্প্রিহেনসিভ ;

(৪) কম্প্রিহেনসিভেরই আর-একটু ছোট্ট সংস্করণ ক্যাম্পাস।

ছাত্রসংখ্যাও এই বিভিন্নধরণের ইস্কুলের পরিমিত ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সব ইস্কুলেরই গোড়াকার কথা হ'ল ইস্কুল পরিবেশ, শিক্ষায়তনকে চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রবর্তিত হ'ল এই সব ইস্কুলে। স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা সম্পর্কে ইংল্যণ্ড এতদিনে বেশ কঠোর নিয়মের মধ্যে এল।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—৫ বছর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ইস্কুলের শিক্ষা আবশ্যিক। প্রাইমারী ইস্কুলে সাধারণত সহশিক্ষা ; সেকেণ্ডারীতে পৃথক ইস্কুলও আছে, মিশ্রিত ইস্কুলও আছে। সরকার থেকে তিন ধরণের ইস্কুলেই সাহায্য দেওয়া হয় - (১) কাউন্টি ইস্কুল—অর্থাৎ যেগুলি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত—তার সমস্ত ব্যয় রাষ্ট্র বহন করে, (২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—যেগুলো বেসরকারী হয়েও স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগে চলে—তাদেরও সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয় ; (৩) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত ইস্কুল—শিক্ষা-মন্ত্রীর তহবিল থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গ্রামার ইস্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভবিষ্যতে পড়বে—তাদের ভর্তি করে ; সাধারণত সাহিত্য-শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি এখানে পড়ানো

হয়। বয়স হিসেবে—১৬ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে থাকতে পারে। মডার্ণ ইস্কুলে—সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার যোগ রাখা হয়—১৫ বছর বয়সে ছাত্রেরা এই ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। টেকনিক্যাল ইস্কুলে শিল্পকারিগরী, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

এখনও কিন্তু পাবলিক ইস্কুল আছে। এগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় 'বোর্ড অব্ গভর্ণরস্' কর্তৃক। তবে শিক্ষা-মন্ত্রক থেকে সরাসরি এরা সাহায্যও পেয়ে থাকে। এখানে ১৩ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাকাল। এরকম পাবলিক ইস্কুল মেয়েদেরও কিছু আছে।

এ ছাড়া আছে 'প্রাইভেট স্কুল' নামে কিছু কিছু স্বাধীন ইস্কুল। বেশিরভাগ এরা কাজ করে পাবলিক ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি-অবস্থা নিয়ে অর্থাৎ 'প্রিপারেটরী' ইস্কুল।

১৯৫১ সাল থেকে পরীক্ষা-ব্যবস্থারও কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে, আগে ছিল 'স্কুল সার্টিফিকেট' এবং 'হাইয়ার স্কুল সার্টিফিকেট', এখন নাম হল 'জেনারেল সার্টিফিকেট অব্ এডুকেশন।' বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে—১লা সেপ্টেম্বরে ১৬ বছর। তবে প্রধানশিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অনুমোদনক্রমে কম বয়সেও পরীক্ষা দেওয়া যায়।

কিন্তু ধরা যাক, এইসব ইস্কুল থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া পড়তে গেল না, অথচ অধিকতর উচ্চ-শিক্ষা নেওয়ার আগ্রহ আছে—তাদের কি হবে? তাদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। এগুলিও বেশিরভাগ আঞ্চলিক স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে বৃত্তিমূলক এবং কৃষ্টিমূলক উভয় ধরণের বিষয় পড়ানোর মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আছে। অনেক ইস্কুল সন্ধ্যেবেলাতেও বসে। কর্মী বা শ্রমিকদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার মতো প্রতিষ্ঠানও আছে।

মোটকথা, বৃটেন যখন তৃতীয়-শক্তিতে পরিগণিত হয়ে পড়েছে—তখনই শিক্ষা-সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সজাগ হ'তে পারল। স্থিরবুদ্ধি নিয়ে তারা শিক্ষার-পথে এগিয়ে চলেছে। হয়ত এ ব্যাপারে আমেরিকার শিক্ষা-প্রভাব কিছু

থাকতে পারে ; কিন্তু জগতের মধ্যে বৃটেনই একটি দেশ যেখানে কোন দেশের হৈ-চৈ-করা প্রভাব নিয়ে হঠাৎ মেতে ওঠে না, যাচিয়ে-বাজিয়ে-বুঝিয়ে তারা সব কিছুকে গ্রহণ করে। আমেরিকার অবিরত গবেষণা-প্রসূত শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি বৃটেনের ব্যবস্থা মাধ্যমে টেকসই হ'য়ে ফিরে আসে তবেই বুঝতে হবে শিল্প-কারিগরীবিদ্যায় অনগ্রসর জাতির পক্ষে এই সমাজের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করবার মতো। নতুবা সরাসরি আমেরিকার গবেষণায় সবুজ হ'য়ে যাওয়া অন্য কোন জাতির পক্ষে নিরাপদ নয়। নিবাপদ না-হওয়ার প্রধান কারণই বোধ হয় অর্থনৈতিক। আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামোয় সেখানে যা সহজ-সাধ্য, অন্য কোন দেশে তা নয়। চতুর্থ শক্তির রাষ্ট্র আর প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রের যোগসাধন করছে বৃটেন।

ইংল্যাণ্ডের ইস্কুল-প্রসঙ্গ শেষ করবাব পূর্বে আমরা ও-দেশের ইস্কুলের প্রধান-বিভাগগুলিব ঐতিহাসিক দিকগুলি একটু আলোচনা ক'রে নিই। কাবণ এই প্রধান বিভাগগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তন না জানলে স্পষ্ট ধারণা হওয়া কঠিন।

পাবলিক ইস্কুল

ইংল্যাণ্ডের পাবলিক ইস্কুল বা সাশ্রমিক বিদ্যালয় ইংরেজ জাতির ইতিহাস থেকে একেবারে পৃথক নয়। স্পার্টাব ইস্কুলের সঙ্গে হয়ত এব অনেকখানি মিল আছে, কিন্তু এই পাবলিক ইস্কুলেব ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে আছে ইংরেজ-জাতির মনোবাসনা।

সামাজিক মর্যাদাব সঙ্গে এই ইস্কুল গাঁথা হলেও, পাবলিক-ইস্কুলেব ছেলেদেব মনে এই ইস্কুলেব জীবন-যাপন বেশ বমণীয় হ'য়ে থাকে সেকথা নিঃসন্দেহ। ইতিহাসের দিক দিযে মোটামুটি হিসাব করতে হ'লে বলতে হয় যখন ওয়েকৃহ্যামের উইলিয়াম (William of Wykeham) উইঞ্চস্টার (Winchester) কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন থেকেই এই পাবলিক ইস্কুলেব প্রবর্তন। সে ছিল ১৩৮২ খৃষ্টাব্দ। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, অক্সফোর্ড-এ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—ছেলেদের

মধ্যে স্ব-শাসনের ব্যবস্থা করা ; প্রিফেক্ট-রা অন্যান্য সহপাঠীদের পরিচালনা করত। বাংলাদেশ নাকি ১৭৷১৮ জন অশ্বারোহী কর্তৃক মুসলমানেরা জিতে নিয়েছিল, আর পাবলিক ইস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ১৮জন ভালো ভালো ছেলেরা ভাগ ক'রে নিল। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত ছাত্রের মধ্যে এক যৌথশক্তি সঞ্চারিত করা। চতুর্থ উদ্দেশ্য ছিল—চরিত্র গঠন করা ; চরিত্র গঠন অর্থে তিনি বুঝেছিলেন সৌজন্য শিক্ষা – (Manners makyth man)। পঞ্চম উদ্দেশ্য হ'ল—এই ইস্কুলে দরিদ্রদের ছেলেরা পড়বে, কখন-কখন সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানদেরও ভর্তি করা হবে—ভালো মাইনে নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া ; শ্রেণীবৈষম্য যাতে দূর হয় তার চেষ্টা করা। কিন্তু তাঁর এই শেষ ইচ্ছা ফলবতী হয় নি—একথা সত্য।

গোড়াতে একরকম জীবনযাপন, একরকম চরিত্রগঠন এবং অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের শিক্ষার সহায়ক এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই পাবলিক ইস্কুল কাজ সুরু করল। প্রথম দিকে ইটন, উইঞ্চেস্টার এবং হ্যারোতে যে সর্বশ্রেণীর সুযোগ না ছিল তা নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিজাত শ্রেণী এই সব ইস্কুলকে কুক্ষিগত করে ফেলল। প্রধান কারণ হিসেবে ছিল—যাতায়াতের অসুবিধা, পরিবার-বর্জিত অবস্থা, এবং গণচেতনার অভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে এই গণচেতনার আবির্ভাব দেখা গেল বটে, কিন্তু সমাজ তখন অনেকখানি বদলে গেছে। টিউডর আমল পর্যন্ত পাবলিক ইস্কুল বেশ মর্যাদা পেয়ে আসছিল, কিন্তু রাশিয়ার মাকারেনকো যেমন 'রোড্ টু লাইফ'-এ অশন-বসনের অনটন ইস্কুলে বোধ করেছিলেন (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে), পাবলিক ইস্কুলেও সেই দুর্দশা শীঘ্রই দেখা দিল। শিক্ষকেরা বেতন পান না, ছেলেরা খেতে পায় না, বেশী মাস্টার রাখবার খরচ নেই। অতএব যে-কে-সেই, অর্থাৎ বাড়াও টাকা। টাকা বাড়াতে হ'লে টাকার লোক খুঁজতে হয়। আর, টাকার লোক এমান এমনি টাকা দেয় না। ইস্কুল ক'রে টাকা হয় না—একথা সনাতন, আর ব্যবসায়ীরা টাকা দেয় সেকথাও সনাতন ; কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবসা হিসাবেই ইস্কুলে টাকা দেয় সেকথা নির্লজ্জ উক্তি ব'লে উহ্য

থাকলেও—ব্যাপারটি যে অন্তঃসলিলা গোছের—একথা নিঃসন্দেহ। ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায়ী ছিল এবং এই সময়ে ভূস্বামীরাও নানা কারণে বণিকী মনের চর্চা করছিল। কাজেই এই ধরণের ইস্কুলসংখ্যা কমল বটে, কিন্তু সমাজের উচ্চ-সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষ বেড়ে গেল।

এই সময়ে রাগবীর আর্নল্ড উঠে পড়ে লাগলেন—পাবলিক ইস্কুল থেকে সমস্ত রকমের অনাচার দূরীভূত করতে। অভিজাত আর দরিদ্র-সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী শ্রেণী সেই মধ্যবিত্তদের তিনি টেনে আনলেন। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করলেন, নীতিশিক্ষা প্রবর্তন করলেন—আরও অনেক কিছু করলেন—যার ফলে সমস্ত পাবলিক ইস্কুলই তাঁর রীতিতে চলবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। তাঁর পক্ষে যুগটাও সহায়ক হ'ল। কারণ রেলওয়ের যাতায়াত বেড়েছে, দেশের আয়-অঙ্ক বেড়ে উঠেছে। তাছাড়া তাঁর নীতিশিক্ষার মধ্যে ধর্মও এমন 'বালাখানা' তামাকের মতো মিশে গেল যে পুরোহিত সম্প্রদায় মনে করলেন, 'যাক, ইস্কুলের মতো ইস্কুল হচ্ছে বটে।' আর লগ্ন ফিরিয়ে দিল ইংরেজের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লোককে, স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটতে হচ্ছে ; তাদের ছেলেমেয়েরা সাশ্রম বিদ্যালয় পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

বেঁচে গেল কেবল নয়, চাহিদাও বেড়ে গেল। এত চাহিদা মিটবে কি করে? তাই পুরনো গ্রামার ইস্কুলগুলোকে ঝাড়-পোঁছ করা হোল ; তারা আঞ্চলিক ছেলে ছাড়াও বাইরের ছেলেদের ভর্ত্তি করল—এরকম ইস্কুলের মধ্যে পড়ল আপিংহাম, শেরবোর্ণ প্রভৃতি।

কিন্তু প্রথম যুদ্ধের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং গ্রামার ইস্কুলে গণতন্ত্রের ঢেউ এসে লাগায় পাবলিক ইস্কুলেও চিড্ ধ'রে আসে।

পাবলিক ইস্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু একথাও ঠিক পাবলিক ইস্কুলে পড়ানোর সুযোগ পেলে ইংরেজ মাত্রই যেন বর্তে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ১৯৩০এর পূর্ব পর্যন্ত পাবলিক ইস্কুলের পাঠক্রমে আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খুব যে একটা পার্থক্য ছিল তা নয়। লাতিন আর গ্রীক ভাষা বেশ চালু ছিল, বিজ্ঞান কেবল অনুপ্রবেশ করছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাবলিক ইস্কুলের ছেলেরা একটু বেশি বয়স পর্যন্ত

থাকতে বাধ্য হ'ত। তবে পাবলিক ইস্কুলে পাঠ্যবিষয়ে বৈচিত্র্য আছে। ছেলেরা ইচ্ছামত বিষয় নির্বাচন ক'রে পড়বার সুযোগ এখানে পেত। ইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় কতগুলো সুযোগ-সুবিধাও অবশ্য ছিল। আবাসিক বিদ্যালয় বলে ছেলেরা সর্বক্ষণ এই ইস্কুলে থাকত। সঙ্গীত-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা—আর খেলাধূলার প্রচুর সুযোগ। শিক্ষক আর ছাত্র মিলে বৈঠকমতো ক'রে আলোচনা করার সুযোগও পায়। তা ছাড়া আছে রক্ষীবাহিনী তৈরী করার সুযোগ। অবশ্য অনেকে বলেন, 'না, না—জঙ্গীবাদ শেখানো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু সৈনিকোচিত কসরতে অভ্যস্ত হওয়া।' 'হাউস'-ব্যবস্থায় ছেলেদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি বাড়ানো, খেলাধূলার মধ্যে দিয়েও, একটা বড় উদ্দেশ্য। আর আছে চ্যাপেল, বা উপাসনালয়। এই খেলাধূলা আর উপাসনার আধিক্য আর অনিয়মিত পরিচালনার জন্য পাবলিক ইস্কুলকে সমালোচনা কম সইতে হয় না। বড় বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়—এই ইস্কুলের ছাত্রদের টাইপ-চরিত্র নিয়ে, বিশেষ এক সমাজ-বহির্ভূত চরিত্রধারা নিয়ে। আরও নিন্দা করা হয় এই বলে যে—এখানকার শিক্ষায় শৃঙ্খলাবিধান যত বড়, বুদ্ধি-উদ্দীপক শিক্ষাব্যবস্থার প্রশ্রয় ততই কম। তা ছাড়া খরচের বাহুল্য নিয়ে আক্রমণ তো আছেই। কিন্তু এত সমালোচনা সত্ত্বেও পাবলিক ইস্কুলের মোহনীয় ছবি ইংরেজজাতিকে কেবল হাতছানিই দেয় না, তার প্ররোচনায় শিক্ষা-সংস্কার করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্তাদের পাটিগণিত-মার্কা বুদ্ধিকে বীজগণিত-মার্কায় রূপান্তরিত করতে হয়েছে।

দিনের ইস্কুল—(Day School):

কিন্তু আবাসিক বা পাবলিক-ইস্কুলের প্রীতি যত লোকেরই থাকুক—সকলের সাধ্যে এ ইস্কুলে ছেলেদের পাঠানো কুলোয় না। তা ছাড়া মা-বাপের ঘরোয়া-পরিবেশ ছেড়ে এই রকম বাঁধা-চালের শিক্ষা দেওয়া অনেক শিক্ষা-ব্রতীই পছন্দ করেন না। স্নেহ-প্রাপ্তি হচ্ছে শিশুদের ক্ষুধা। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ যতই গৃহ-পরিবেশ বা মা-বাপকে ভবিষ্যৎ-নাগরিক গঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর আর অপ্রয়োজনীয় মনে করুন না কেন, শিক্ষাব্রতীরা সে কথা মনে করেন

না। প্লেতোর পুরনো-গ্রীকসমাজ-উপযোগী কথাবার্তাও এখানে অচল। রাষ্ট্র শিক্ষাকে যখন কুক্ষিগত করতে চায়, তখনই 'পরিবার'-গোষ্ঠীর উপর তার আসে সন্দেহ। বেকারসমস্যা যখন বাড়ে অর্থাৎ রাষ্ট্র যখন সমাজের সকল উপযুক্ত নাগরিককে কাজ-কর্ম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম হয়, তখনই 'বিশেষ বিশেষ শিক্ষা না-পেলে যে নাগরিক হওয়া যায় না' এই কথা ঘোষণা ক'রে সমস্ত দায়িত্ব বেকারদের শিক্ষার উপর এবং পিতামাতার দূরদৃষ্টির অভাবের উপর চাপিয়ে দেয়। এমনি ক'রে এক দিক থেকে রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ নাগরিককে পিতামাতার আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে আনতে চায়, আর অন্য দিক থেকে সতর্ক পিতামাতা রাষ্ট্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে যখন বোঝে তাদের সন্তান তাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা পাচ্ছে না। রাষ্ট্র-মতবাদ নিরপেক্ষ শিক্ষাব্রতীও পিতামাতার পক্ষে এসে দাঁড়ান। তাই তাঁরা আন্দোলন তোলেন 'পিতার সম্মতি নিয়ে শিক্ষা', ইস্কুল ; আর পিতা-মাতার সহযোগে শিক্ষাকে চালু করতে চান। রাষ্ট্র-ও পিছিয়ে থাকে না, সে-ও তখন ঐ প্যারেণ্ট-স্কুল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজদের প্রভাব খাটাতে চায় ; মনে করে মানুষে আর পাভলভের কুকুরে খুব তফাৎ নেই। রাষ্ট্র-শাসকেরা যে এই অপকর্ম করবেনই এমন কোন কথা নেই, কিন্তু জাতি-ভেদ প্রথার চেয়েও শ্রেণী-বৈষম্য প্রথা নানা অপকর্মের প্রেরণা দেয় রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষদের ; বিশেষ ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে তো এ ব্যাপার সেই ইয়োরোপের দেবতাদের ভূমি-বিশেষ সেই গ্রীসেও দেখা গেছে।

কাজেই ডে-ইস্কুলের পিছনে অনেক লোকই দাঁড়াবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এর ইতিহাস কতদূর থেকে টানা যায়? অনেকে আলফ্রেডের যুগ থেকে টেনেছেন, অনেকে তারও পূর্ব থেকে বলেছেন। সপ্তম শতাব্দীতেও নাকি ক্যাণ্টারবেরী, ইয়র্কে এ ধরণের ইস্কুল ছিল। মধ্যযুগে নাকি সাড়ে পাঁচ হাজার লোকপ্রতি একটি ক'রে গ্রামার ইস্কুল ছিল। সংস্কার যুগে ৩০০ ইস্কুলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালের দিকে বোর্ড ইংল্যণ্ডে প্রায় ১৫০০এর মতো মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেছিল। এর মধ্যে তখনও প্রায় ৩০০টি ইস্কুল কোনরকম সাহায্য (গ্রাণ্ট) নিত না, এবং এর প্রায় ২৯০টিই ছিল কোন কোন প্রকারের

বোর্ডিং ইস্কুল। অন্য দশটিকেই বলা যায় খাঁটি খাঁটি ডে ইস্কুল (মাধ্যমিক)। আবার মজা হচ্ছে এই, ডে-ইস্কুলের শিক্ষার জন্যই রাষ্ট্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকেন; এই ডে-ইস্কুলই সাধারণের শিক্ষার অঙ্গ। সেখানে যারা সাহায্য নেবে না, তারা তো কর্তৃপক্ষের খবরদারীও সহ্য করবে না।

কাজেই এরা রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষের আওতার বাইরে। অবশিষ্টের মধ্যে ৩২৪টি ইস্কুলকে খাঁটি খাঁটি ডে-ইস্কুল বলা যায়, ২৮০টি ইস্কুল দিবাকালীন বটে কিন্তু এখানে ছিল সহশিক্ষা। এর বাইরে যেসব ইস্কুল ছিল তাদের কোন কোনটিতে আবার ছোটখাটো বোর্ডিং-ও থাকত। যাই হোক সংখ্যানুপাত ক'সে তাদেরও মোটামুটি ডে-ইস্কুল হয়ত বলা যায়। কিছু সংখ্যক ইস্কুল ছিল অবৈতনিক—আবার কতগুলি ইস্কুল বেতন নিত। বেতনের হারেও খুব মিল ছিল না, ইস্কুলের মর্যাদার উপর এই হার নির্ভর করত।

ইংলাণ্ডের সমাজও বড় বিচিত্র, বেতন দিয়ে পড়ার ইস্কুলে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভীড় পড়ে যেত বেশী। তাদের ধারণা, বেশী টাকা খরচ করলে বেশী ভালো শিক্ষা পাওয়া যাবেই—এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ।

টেকনিক্যাল বা কারিগরী বিদ্যালয় শ্রেণী :

মাধ্যমিক ইস্কুল বিভাগে আর-এক ধরণের ইস্কুলের খবরও পাওয়া যায়। পুরনো-সমাজে কারিগরেরা কেবল জিনিস-পত্তরই তৈরী করত না, তারা ঐ সব কিভাবে তৈরী করে সে শিক্ষাও দিত। কারিগরদের আওতায় যেসব সন্তানসন্ততি মানুষ হ'ত তাদেরই টেনে আনা হ'ত শিক্ষানবিশ হিসাবে। প্রথম যুগে তারা পিতার বৃত্তিই অনুসরণ করত। তারপরের যুগে বিশিষ্ট কারিগরের অধীনেই তারা শিক্ষালাভ করত। এরপর এই সব কারিগর-শ্রেণী সঙ্ঘ বা গিল্ড গঠন ক'রে এইরকম শিক্ষানবিশদের গ্রহণ করতে সুরু করে। এই শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল, শিক্ষানবিশী কাল, শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগর এবং নিপুণ কারিগর (apprentice, journeyman & master)। গিল্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গণ্য হ'ত, সরকারের অধীনেও কাজ পেত। কাজেই এই সব গিল্ডে যে কেবল কারিগরী শিক্ষাই

দেওয়া হ'ত তা নয়, তাদের নৈতিক-শিক্ষাও দেওয়া হ'ত। কিন্তু যতই হোক এখানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এইগুলি শিক্ষা দেওয়া হ'ত না, কাজেই বলা যায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষকারী শিক্ষার অভাব ছিলই। এ ধরণের শিক্ষা নিয়ে মানবসমাজ খুব বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তা ছাড়া এল শিক্ষা-বিপ্লব। নতুন নতুন শিল্পসাধনার নতুন নতুন পদ্ধতি, মানুষের হাত থেকে কারখানা যন্ত্রের হাতে যেতে বসল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নতুন যুগের শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থাপিত হ'ল 'লণ্ডন মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট।' ১৮৪১ এর মধ্যেই প্রায় দ্বিশতাধিক এমন ইস্কুল স্থাপিত হল। কিন্তু এখানকার শিক্ষায় আবার ব্যবহারিক কাজকর্ম বা হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যাপারটা কমে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বক্তৃতাধর্মী শিক্ষাই বেশী চালু হ'ল। কিন্তু ওরই মধ্যে কেমন ক'রে যেন ধীরে ধীরে শিল্প-কারিগরদের এক সঙ্ঘ গড়ে উঠল।

১৮৪২ সালে শেফিল্ডে 'পিপল্‌স কলেজ' নামে এই ধরণের আর একটি ইস্কুল স্থাপিত হয়। এইখানে তত্ত্ব আর ব্যবহারিক দিককে মিলিয়ে শিক্ষা দেওয়া হ'তে থাকে। এইখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কাজে-কর্মের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নিকটে এসে পড়লেন; আর বক্তৃতাধর্মী শিক্ষা থাকল না; থাকল অনেকটা 'টিউটোরিয়াল' শিক্ষার ধর্ম। এখানে সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হ'তে থাকে। জীবনযাত্রার নির্দেশ এখান থেকে শিক্ষার্থীরা পেতে থাকে। অতএব স্থাপন কর ঐ ধরণের ইস্কুল। স্থাপিত হ'ল। কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। কারণ, শিক্ষার্থী কারা? কারিগরেরা। তাদের ইস্কুল-অধ্যয়ন কতখানি? প্রায় কিছুই নয়। কাজেই এখানকার সাধারণ শিক্ষাকে তারা গ্রহণ করবার মতো বুদ্ধিতে বেড়ে পেল না। এই সময়েই এদের জন্য সান্ধ্য শিক্ষালয়, অথবা 'রবিবাসরীয়' ইস্কুল স্থাপিত হ'ল। এই রকম অবস্থায় ১৮৪৪ সালের ফ্যাক্টরী আইনে ছেলেদের কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হ'ল।

এদিকে জার্মাণী থেকে এই ধরণের শিক্ষালয় সম্পর্কে নানা কথা আমদানী হয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ড কি পিছিয়ে থাকবে? ১৮৫২এর দিকে স্থাপিত হল জুনিয়ার টেকনিক্যাল ইস্কুল। ম্যাঞ্চেস্টার, ইসলিংটন, বৃস্টল প্রভৃতি স্থানে এই

ইস্কুল কাজ সুরু করল। কি পড়ানো হবে? যন্ত্রবিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং অন্যান্য কারিগরী বিষয়ে শিক্ষানবিশী আর প্রাথমিক ইস্কুলের যাবতীয় বিষয় এবং ব্যবহারিক গণিত এবং পদার্থবিদ্যা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এইগুলিই 'ক'বিভাগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থান লাভ করে। জার্মানীর রিয়ালস্যুলের (Realschiule) সঙ্গে এদের অনেকখানি মিল আছে।

জুনিয়ার টেকনিকাল ইস্কুলের অধ্যয়ন কাল ২ থেকে ৩ বৎসর; শিক্ষার্থীর বয়স হবে ১৩ থেকে ১৪। উদ্দেশ্য কেবল বৃত্তিশিক্ষাই দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাও। ইংরেজি, অঙ্ক-বিজ্ঞান, কারিগরি-নক্সা অঙ্কন, কারখানার কাজ, ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞান, স্বাস্থ্যচর্চা এবং মেয়েদের বিদ্যালয়ে সূচশিল্প শিক্ষা দেওয়া হ'ত—অন্যান্য বিষয়ের একটু-আধটু পরিবর্তন ক'রে।

এই জুনিয়ার ইস্কুলেরই একটু পরিবর্ধন ক'রে দাঁড়াল টেকনিক্যাল ইস্কুল ফিসার এ্যাক্টের পর (১৯১৮)। যাই হোক একটা কথা ঠিক, এই ইস্কুলের উপযোগিতা সম্পর্কে সমাজে অনেক রকমের মতদ্বৈধ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—এক শ্রেণী বলেন—বৃত্তিশিক্ষার দিক বা উপযোগিতা-বাদের ভিত্তিতেই এগুলি স্থাপিত হোক, আর একদল বলেন, না বৃত্তিগত উদ্দেশ্য না হয়ে হবে—চিত্তের প্রসারতামূলক উদ্দেশ্য। ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে কেণ্ট এডুকেসন কমিটি এ বিষয়ে এক নির্দেশ দেন। এই কমিটি—উপর্যুক্ত দুই ধারার সমন্বয়ের পক্ষপাতী। বয়ঃসন্ধি বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজের বিবিধ মনোরাজ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—সেই বিষয়ে সজাগ থাকবার জন্যই কমিটি উপদেশ দিলেন। এ ইস্কুল হবে একক-সমাজ গঠনের সংস্থা; এর পড়ানোর পদ্ধতি ব্যবহারিক কর্ম-বিজ্ঞান অনুসরণ করবে বটেই, কিন্তু সমাজের মূল্যমানের দিকে উন্নাসিক হয়েও থাকবে না। কিন্তু সেদিক দিয়ে নিয়োগ-কারীদেরও তো দায়িত্ব আছে; তাঁদেরও দেখতে হবে যাতে তাঁদের উৎপাদন-শক্তিরই কেবল বৃদ্ধি ঘটুক তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তারা সুন্দর এবং উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

হোয়াইটহেড্ তাঁদের এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই খেদোক্তি করেছিলেন: 'সভ্যসমাজের নন্দন-বৃত্তির উপাযোগিতার দিক দিয়ে বিজ্ঞান-চর্চার প্রতিক্রিয়া

বড় অশুভ হয়ে পড়েছে। এর বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি 'বস্তুর' দিকে নজর দিতেই বাধ্য করেছে, কিন্তু সেই বস্তুর 'মূল্যমানে'র দিকে কোন নজরই নেই।……. এই ভুল-দৃষ্টির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক মতবাদ জড়িত হয়ে পড়ায়—কেবল ব্যবসা প্রসারের দিকই বড় হয়ে গেল।…মনে হয়, সভ্যতাকে এই যে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ঘিরে ধরেছে, যে-আবহাওয়া যন্ত্রবিজ্ঞান এনে দিল, তার থেকে মানবসভ্যতার মুক্তি নেই।'

নার্সারি এবং শিশুবিদ্যালয় :

সেই ১৮০৬ সালের রবার্ট ওয়েনের যুগ থেকে শিশুদের উপর ইংল্যাণ্ডে দৃষ্টি পড়েছিল। তাঁর ইস্কুলের শিশুরা ২ বছর বয়স থেকে ৬ বছর পর্যন্ত গান করত, নাচত, মুক্ত বায়ুর সান্নিধ্যে নিজদের মনের বিকাশ ঘটাত।

কিন্তু তারপরই অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যবনিকা অন্তর্হিত হ'তে সুরু করল ১৮৭০ সালের পর থেকে অল্প অল্প ক'রে। ফ্রয়েবেলের প্রভাবই পুনরায় এই দিকে ইংরেজ-সমাজকে আকৃষ্ট করে। তবে এ সময় ধনীদের ছেলেমেয়েরাই যা-কিছু উপকৃত হ'ত। ১৯০৫ সালের পর গরীবদের ছেলে-মেয়েদের জন্ম এ বিষয়ে ভাবনা সুরু হ'তে দেখা যায়। তবু কিছু করা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। ফ্রয়েবেলের নীতি অনুযায়ী এসব ইস্কুলের ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে—খেলা, নিদ্রা, অবাধ কথাবার্তা, গল্পবলা, পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ-সাধন। এই যে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রীড়াকৌতুক, কর্ম-পরিচালনা, আত্মনিয়ন্ত্রিত মানসিক বিকাশ, ভিতরের শক্তি বাইরে তুলে ধরা—এই-ই ছিল ফ্রয়েবেল-অনুসরণকারীদের শিশু-শিক্ষার মূলমন্ত্র। ফ্রয়েবেল সমিতির সঙ্গে যুক্ত হ'ল—মন্তেসরীর শিশু-গবেষণার ফল, তারপর 'নার্সারী স্কুল মুভমেণ্ট' বা আন্দোলন। মন্তেসরী নানা অভীক্ষার সাহায্যে শিশু-মনকে যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন, সেই সঙ্গে ইস্কুলের এবং শিক্ষা পরিবেশের যথোপযুক্ততা সম্পর্কেও ভাবতে সুরু করলেন। তাঁর মতে, শিশু-শিক্ষার পরিবেশ-গঠন এবং পরিবেশের যোগান অনেকখানি কাজের।

১৯১৮ সালে নার্সারী-স্কুল-আন্দোলনের প্রভাবে ইংরেজ-সমাজ এদিকে

আবার নজর দিল। নার্সারী-ইস্কুলের শিক্ষকেরা বেশ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নার্সারী ইস্কুল দুরকম ভাবে পরিচালিত হ'ল—(১) আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে, (২) অন্যগুলো স্বয়ংচালিত তবে বোর্ড থেকে বৃত্তি কিছু পেত। প্রায় চল্লিশ থেকে দুশ' ষাটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসব ইস্কুল বসত। তবে সব ইস্কুলই মুক্ত অঙ্গনের। ছেলেমেয়েরা এখানে সমস্ত দিবামানই থাকত। তবে যেসব অঞ্চলে বাপ-মা উভয়েই কাজে বেরিয়ে যান—তাঁদের ছেলেমেয়ে সকাল ৭-৩০টা থেকে সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ কাল পর্যন্ত থাকত। খাওয়া-দাওয়া ইস্কুলেই। নিয়মিত ডাক্তার আসেন – অবয়বের মাপজোঁক করেন, স্বাস্থ্য দেখেন। কতগুলি নার্সারী ইস্কুল স্বয়ংসম্পূর্ণ, কতগুলো ইনফ্যাণ্ট বা শিশু-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। কোনরকম আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা এসব শ্রেণীতে হয় না ; তবে চলা-ফেরা, সৌজন্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রিপারেটরী ইস্কুল বা প্রস্তুতি-বিদ্যালয় শ্রেণী :

এই প্রস্তুতি-বিদ্যালয় ইতিহাসের দিক দিয়ে খুব কুলীন না হ'লেও, কুলীন-ঘরে কাজকর্ম করে ব'লে এর মর্যাদা ইংল্যাণ্ডে কম নয়। এ ইস্কুলের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাবলিক ইস্কুলের উপযোগী ছাত্র তৈরী করা। কাজেই এর গঠনে পাবলিক-ইস্কুলের ছাঁদ অনেকখানি, অতএব এরও পূর্বপুরুষকে স্পার্টাতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এগুলো বেসরকারী বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। কোনরকম সাহায্য এ সব ইস্কুল গ্রহণ করে না, সরকারের নিয়ন্ত্রণও নেই। মাইনে খুব বেশী, বেশির ভাগ ছাত্রাবাসসমন্বিত। সংখ্যায় খুব বেশী নয়, তবে হাঁক-ডাক কম নেই। এক সময় ছিল, এই প্রস্তুতি-বিদ্যালয়ের পরোয়ানা না হ'লে পাবলিক ইস্কুলে ভর্তি হওয়াই যেত না। বড় বড় দালান, প্রাসাদ বলা যায়, আর মুখে আর ব্যবহারে বড় বড় ঐতিহ্যের কথা। তিনধারায় শিক্ষা চলত,—শারীরিক, বৌদ্ধিক, এবং নৈতিক। লাতিন আছে, অঙ্ক আছে ; প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার রূপ কিছুটা কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাধারাই বেশী। ইংরেজির কদরটা কম ছিল ব'লে—কিছুকাল পাঠ্যসূচী নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলেছিল।

তবে ধর্মের ভিত্তি, যৌথকর্মপ্রচেষ্টা আ । ঐ 'এক জাতি-এক প্রাণ' তৈরী করবার কাজে এই সব ইস্কুল আত্মনিয়োগ করে ব'লে—এদের সমস্ত দোষত্রুটি বেশী জোর দিয়ে দেখা হয় না। এ সব ইস্কুলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে 'ভালো শাসক-শ্রেণী' তৈরী করা।

বোর্‌স্টাল ইস্কুল :

কলকারখানার যুগে সভ্যতা-সঙ্কট এসে যায়। মানসিক চিত্তবৃত্তি নানারূপ বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা আধুনিক সভ্যতায় উন্মার্গগামী হয়ে যাচ্ছে বেশি। এই উন্মার্গ-গতির কারণ হয়ত অনেক, কিন্তু তাদের জেলে পাঠিয়ে ঘানি ঘুরুতে বলা হবে, না শিক্ষা দেওয়া হবে সেই হচ্ছে সমস্যা। :৯২৬ সনের দিকে রাশিয়াতে মাকারেন্‌কো এই রকম উন্মার্গগামী ছেলেদের নিযে ইস্কুল খুলেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রোড্‌ টু লাইফ' হযত অনেকেরই পড়া আছে, কাজেই এই ইস্কুলের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের য় কতখানি দায়িত্ব তা তাঁরা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

ইংল্যাণ্ডেও এই বোরস্টাল ইস্কুল, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯৩০এর দিকে এ রকম তিনটি ইস্কুল ছিল – বোরস্টালে, ফেল্‌টহামে, এবং পোর্টল্যাণ্ডে।

এখানকার কাজকর্মের ব্যবস্থার মধ্যে— আগন্তুক ছেলেমেযেকে প্রথম সপ্তাহে নিম্নশ্রেণীর কাজ করতে হয়, এই ধরুন, ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে আবাসগৃহ রাখা, এই সময এদের পিছন-পিছন থাকে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ। এই দিন এই সব কাজের মধ্য থেকেই তার চিত্তবৃত্তির মূল অনুসন্ধান চালিয়ে পরবর্তীকালে তার উপযুক্ত কাজ দেওয়া হয়। দৈনন্দিন কার্যতালিকার মধ্যে বলা যায সকাল ৬টার সময ঘুম থেকে সবাইকে উঠতে হয়, প্রাতঃকালীন কুচকাওযাজ করতে হবে, ব্যায়াম করবে, আর সাতটার সময় প্রাতরাশ করবে। তারপর দুপুরের খাওয়ার সময়টা বাদ দিয়ে প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে কোন বৃত্তিমূলক কর্ম-সংস্থানের (ইস্কুলের অভ্যন্তরে) সঙ্গে যুক্ত থাকবে। অনেক রকমের বৃত্তি আছে—ছবি আঁকা, চুণকাম করা, ইঁট গাঁথা,

ছুতোরের কাজ করা—এমনি সব। সন্ধ্যেবেলায় একটু মেলামেশার সুযোগ, আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অবসর। সমস্ত কিছুর মূলে আছে—আত্ম-নির্ভর ক'রে তোলা, শৃঙ্খলা মানতে শেখা এবং পরস্পরিক সহযোগিতাকে নির্ভর ক'রে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে শেখা। কাজকর্ম, খেলাধূলা সমস্ত কিছুর পিছনেই এই মূলনীতি।

সাধারণত এই সব ইস্কুলই বর্তমানে আছে—তবে ১৯৪৪ সালের আইনে এর নিয়ম-নীতিতে অনেক বদল হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ইতিহাস এবং ইস্কুলের ব্যবস্থা পড়ে শুধু এই কথাই মনে হয়—শাসনক্ষমতা যখন যার হাতেই থাকুক—শিক্ষার দিক দিয়ে জনসাধারণের জাগ্রত চক্ষুকে কেউই উপেক্ষা করতে পারে নি। আমরা ইংরেজকে রাজা হিসাবে পেয়েছিলাম—সাধারণ-ভাবে রাজা নয়, বণিক-রাজা ; কাজেই ইংল্যাণ্ডের মানুষকে কোনদিনই ঠিক-মতো চিনে উঠতে পারি নি ; রুক্ষ বিকৃত চন্দ্রের একটা পিঠ যেমন চিরকাল পৃথিবীর মানুষের কাছে ঢাকা থাকে—আমাদের কাছে তারাও ঠিক তেমনি ; কিন্তু আমাদের একটা কথা ভাবতেই হবে—তাদের দেশ ছিল, তাদের সমাজ ছিল, তাদের বেদনা ছিল, তাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল—অন্যান্য দেশেরই মতো ; কিন্তু অমিত মানসিক শক্তিতে তারা নিজদের সমস্ত বাধা সঙ্কীর্ণতা আপন দেশে কাটিয়ে উঠেছিল এই শিক্ষা আর ইস্কুলের ব্যবস্থায়। গণতন্ত্রের সত্যকার অর্থ কি জানি না, যে সংজ্ঞাই হোক, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস গণতন্ত্রের মানসিক দীপ্তিকে তুলে ধরতে পেরেছে। ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির গর্ব, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা—সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা তাদের জাতীয় জীবনের পরতে পরতে।

ডেনমার্কে

সেই কবে কোন্ আদিকালে এই মহাবিশ্বের একটি নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আর তার আকর্ষণে সূর্য থেকে খানটুক ছিটকিয়ে বেরিয়ে এসে সৃষ্টি হয়ে গেল আমাদের গ্রহ-উপগ্রহ। তারপরই চলছে আমাদের সৌরজগতের পরিক্রমা। সূর্যের ধ্বংস থেকে এত গ্রহের সৃষ্টি। সেই নক্ষত্রটি ভালো করেছিল কি মন্দ করেছিল সে হিসেব রাখা দুষ্কর। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে ঘটনাটি এই। ইয়োরোপের সমাজেও তেমনি একটি নক্ষত্রের গতি-পথের ফলে নতুন ইযোরোপের সৃষ্টি। এই নতুন নক্ষত্রটি হচ্ছে খৃষ্টীয় ধর্ম। এই ধর্মের প্রেরণা তার পুরনো জরদ্গব হিংস্র সমাজকে ভেঙে দিয়ে নতুন শিক্ষার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে, আবার সেই পুরনো সমাজের নবরূপ সেই ধর্ম থেকেই মুক্তি নিয়ে স্বতন্ত্র হ'তে গিয়ে ভাবরাজ্যে এক পরিক্রমা সৃষ্টি করেছে। সে-পরিক্রমার শেষ আজও হয় নি। এই পরিক্রমণটি ডেনমার্কের শিক্ষা-ইতিহাসে যত স্পষ্ট, এমনটি আমাদের আলোচ্য দেশগুলিতে আর কোথায়ও পাইনি।

সেই ৮২৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট-সন্ন্যাসী আন্‌সগার (Ansgar) দ্বাদশটি ছেলেকে কিনে নিয়ে পড়াতে সুরু করলেন, আর সেই-ই সুরু হ'ল ডেনমার্কে ইস্কুলের শিক্ষা; তারপর ধর্মশিক্ষা সেই ইস্কুলে আষ্টে-পৃষ্ঠে জুড়ে বসল, বিদেশী ভাষা লাতিন শিক্ষা হ'যে গেল আবশ্যিক; কালক্রমে এই শিক্ষার বিরুদ্ধে চলল প্রবল আন্দোলন; বুঝিবা ডেনমার্কের অধিবাসী সেই ইস্কুলকে উৎখাত করে বসে! কিন্তু না ওরই মধ্যে আবার নতুন রূপ নিয়ে এলেন গ্রাণ্ডটুইগ (Grundtvig) লোকশিক্ষালযে (Folk Schools); সেখানে ধম, নীতি শিক্ষা বড়; প্রক্ষোভ বা ইমোসনের দিকটিই যেখানে একান্ত, জীবনের গান সেখানে প্রধান উপকরণ। আজ জগতে ডেনমার্কের বড় দানই এই নতুন ধরণের ইস্কুল। এ পর্যন্ত আমরা অন্যান্য ইস্কুলের বিবর্তন বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে দেখেছি। কাজেই সেগুলোর উপর বেশি জোর না দিয়ে ডেনমার্কের এই লোকশিক্ষালয় সম্পর্কেই আমরা বিশেষ সন্ধান নিতে চেষ্টা করব।

দ্বীপময় ডেনমার্ক মূলত কিন্তু কৃষক অধ্যুষিত ভূমি। কৃষকদের স্বাধীনতা কোন দিনই বিশেষ খোয়া যায় নি। মোটামুটি গ্রামীণ সভ্যতাই তাদের। কিন্তু এরই মধ্যে এসে গেল লুথারের অনুগামীদের সংস্কৃতি। ডেনমার্ক তা গ্রহণ করল। জার্মাণ-ইংল্যাণ্ড-নরওয়ে-সুইডেন অনেক দেশের প্রভাবই এদেশে এসেছে। গ্রাণ্ডটুইগ নিজেই ইংল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসে সমাজকে নতুনরূপে গঠন করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কালক্রমে দেখা গেল কৃষাণেরা ছুটছে সহরের দিকে। এই সহর-মুখী লোকের চরিত্রের কথাও ভাবতে হবে। ভাবতে হয়, নেপোলিয়ঁা কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া দুর্দশা, তারপরও আছে জার্মাণের সংগ্রাম।—ইত্যাদি আলোচনা ক'রে আমরা জনগণের মধ্যে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মনোভাবটিই বেশী দেখতে পাই। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবোধ পাশাপাশি চলে এখানে।

প্রথমদিকে ছিল ক্যাথেড্রাল-ইস্কুল, লাতিন ইস্কুল—ধর্মযাজকদের ধারাকে অক্ষুণ্ণ যাতে রাখা যায় তারই শিক্ষা। এই ইস্কুলের অনেক সম্পত্তি, অনেক টাকা-পয়সা। কিন্তু লেখাপড়ার অবস্থা? পড়ুয়াদের অবস্থা? এইখানে আমাদের দেশের হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিক্ষার সঙ্গে তাদের কিছুটা মিল ছিল। ছাত্রেরা ঘরে-ঘরে মাধুকরী করতে বেরোত। 'মাধুকরী' কথাটা সাধুভাষা, আসলে ভিক্ষা। কিন্তু গৃহস্থেরা ভিক্ষা না দিয়ে পারত না। ভয়ে। কারণ, একদিন ওরাই তো চার্চের পুরোহিত হয়ে ধর্ম এবং সমাজের হর্তাকর্তা হয়ে বসবে। কিন্তু ছাত্রদের এই ভিক্ষাসংগ্রহে সময় যা অপচয় হয়ে বাকী থাকত—তাতে আর পড়াশোনা তেমন এগোত না। বেত্র-প্রহার ছিল ছাত্রদের শিক্ষা-দানের প্রথম এবং প্রধান উপকরণ। ইস্কুলে ছাত্রের ভীড়ই কি কম! এমন সময়ে মধ্যযুগে এল জার্মানী বণিক এদেশে। বণিকেরা যেখানেই যায় সেখানেই দালাল মুৎসুদ্দী তৈরী করে নিয়ে একটা প্রবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে তোলে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লাতিন-ইস্কুলের পাশাপাশি তৈরী করল লেখা আর আঁক কসা-র ইস্কুল, যাকে ভারতবর্ষের ভাষায় বলা যায় মহাজনী পাঠশালা। আবির্ভাব হ'ল (১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) লুথারের ধর্ম-সংস্কার। সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলের উপর নানা পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। লাতিন বেশ ঘট পেতে বসে গেল

ইস্কুলে। এই সব ছাত্রদের দুবার পরীক্ষা দিতে হ'ত—১২ বছর বয়সে আর ১৬ বছর বয়সে। এই পরীক্ষা থেকে ছাত্রদের উপযুক্ততা মাপ ক'রে নেওয়া হ'ত—উপযুক্ততা অর্থে কে ধর্মযাজক হ'তে পারবে সেই বিচার। এর বিরুদ্ধে যত খারাপ মন্তব্যই করা হোক, একথা বেশ বোঝা যায় - প্রথম থেকেই ছাত্রদের ক্ষমতা মেপে নেওয়ার দিকে উৎসাহী ছিল ; ঠিক এমনি রীতিই তো বর্তমান কালে আমাদের দেশেও চালু হ'তে চলেছে। ডেনমার্কের ইতিহাসেও দেখা যাবে—বিংশ শতাব্দীতে তারা এই ব্যাপারে মানসিক অভীক্ষা-পত্র প্রয়োগ করছে—তাদের ক্ষমতার সীমা এবং প্রবণতা বুঝবার জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, দিনেমারেরা শিক্ষাজগতে পরীক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে বেশ ভেবেছে। পরীক্ষা আর গ্রন্থ বাদ দেওয়ার দিকেই দিনেমার মনীষীরা বেশি চিন্তা করেছেন।

চার্চ কিন্তু গ্রামের ইস্কুল সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাবেনি। লুথারের নির্দেশ—শোন, কেবল শোন ; বারবার একই কথা শোন, লেখাপড়ার কিছু দরকার নেই। এই ছিল গ্রামের ইস্কুলের রীতি। ১৭০০ সালের দিকে জার্মানী থেকে পাইয়েটিজমের (Pictism) ঢেউ এল। এরাই প্রথমে সমস্ত সহরে, কোপেনহাগেনে এবং চার্চে চার্চে ইস্কুল খুলতে বাধ্য করালো। রাজধানীতে দেখা গেল কোপেনহাগেন এলিমেণ্টারী ইস্কুলের সূত্রপাত।

তারপর চতুর্থ ফ্রেডারিক (১৬৯৯-১৭৩০), তাঁর পুত্র ষষ্ঠ ক্রিস্টিয়ান (১৭৩০-১৭৪৬) প্রভৃতি রাজাদের উৎসাহে আর পৃষ্ঠপোষকতায় ডেনমার্কে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে গেল। ওদিকে তখন মাতৃভাষার উপর দেশবাসীর ভীষণ টান বেড়ে গেছে। কাজেই একেবারে নিরঙ্কুশ ভাবে চার্চের ইস্কুল অগ্রসর হ'তে পারল না। তা ছাড়া ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা-ধারা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। যখন দেশে জাগরণের সাড়া পড়ে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত আর শাসক শ্রেণী চলতে চায় না, তখনই সৃষ্টি হয় 'কমিসন'। এই কমিসন আর কিছুই নয় জাতির জীবনে একরকমের জোয়ারভাঁটা। পৃথিবীর বুকের উপর তার জোয়ার-ভাঁটা যেমন পৃথিবীর গতিকে মন্থর ক'রে দেয়, ঠিক তেমনি কমিসন মানুষের চাহিদার বেগকে মন্থর করে দেয়। ১৭৮৯ সালে 'গ্র্যাণ্ড স্কুল কমিসন' (Grand School Commission) বসল

ইস্কুলের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য, আর তা ১৮১৪ সালেও শেষ হ'ল না ; ইতিমধ্যে এদেশে নেপোলিয়ঁার উদয়ে ইংরাজ কোপেনহাগেনকে বোমা মেরে শেষ ক'রে দিয়ে গেল ! যাই হোক, ১৮০৯এর আইনে ছেলেদের ভিক্ষাবৃত্তি তুলে দিতে হ'ল ; মাতৃভাষা আর বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে স্থান পেল, আর এমনি ক'রে লাতিন ইস্কুল ধীরে ধীরে হাই-ইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৮১৮ সালের আইনে—পড়াশুনার উদ্দেশ্য স্থির ক'রে দেওয়া হয়—(সৎ খৃষ্টান হবে রে বাপু!), পড়ানোটা আবশ্যিক (নতুবা বাপের জরিমানা), অনেক ইস্কুল খোলা হ'ল, পাঠ্যসূচী প্রসারিত হ'ল। কিন্তু শিক্ষক ? শিক্ষক কোথায় ? খোলা হ'ল নর্ম্যাল ইস্কুল। ১৮৪৪এ ইস্কুল-ডাইরেক্টর (School-director) নিয়োগ করা হ'ল—ইনি হবেন শিক্ষার অধিকর্তা। কিছুদিন বেল-ল্যাঙ্কাস্টারের সর্দার-পোড়ো প্রথা চালু হয়েছিল, কারণ লোকাভাব !

১৮১৪ সন থেকে ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা (ইস্কুলের মধ্যে) আবশ্যিক ক'রে দেওয়া হয়েছিল ; ১৮২৮ সালে এই দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেবার জন্য আরও ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই গ্রাণ্ডটুইগের নতুনশিক্ষার আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে এদেশের ১৯০৩এর আইনটিতে শিক্ষা-জগতে যে-বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল তার কথা ব'লে নিই।

১৯০৩-এ মাধ্যমিক বা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা (Gymnasiums) আর প্রাথমিক শিক্ষার (Elementary School) যোগসূত্র স্থাপনার জন্য নতুন রকমের ইস্কুল খোলা হ'ল, মিডল-ইস্কুল বা দিনেমারদের ভাষায় Enhedsskole. এই ইস্কুলগুলোকে গণতন্ত্রসম্মত করা হ'ল, অর্থাৎ সবারই অধিকার থাকল এখানে শিক্ষাগ্রহণ করবার। এখানে তথ্যমূলক এবং ব্যবহারিক উভয় ধরণের শিক্ষাই দেওয়া হ'ত ; ছেলেদের হাতের কাজের শিক্ষা এখানে বড় হয়ে গেল। কারণ, এই সময় জন ডিউয়ি, কের্সেনস্টাইনার প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীর প্রভাব বেশী ছিল। গ্রামে হ'ল গ্রাণ্ডটুইগ আর কোল্ড-এর প্রবর্তিত জীবনময়-শিক্ষার ফোক্ হাই-ইস্কুল এবং ফ্রী-ইস্কুল ; আর সহরে এল হাতের-কাজের শিক্ষা,

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই দুইটি ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ডেনমার্কে বিশেষভাবে দেখা যায়।

১৯০৩ থেকে দিনেমার ইস্কুলের বিভাগ নিম্নলিখিতভাবে চালু হ'ল :

(১) ৬ বা ৭ বছর বয়স থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ুয়াদের ৪ বা ৫ বছরের পাঠসম্বলিত এলিমেণ্টারী ইস্কুল—

(২) ৪ বছরের সেকেণ্ডারী বা মিড্‌ল ইস্কুল—শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ১৫—

(৩) ৩ বছরের হাই ইস্কুল (জিম্‌নাসিয়াম)—শিক্ষার্থীদের বয়স ১৫ থেকে ১৮—

যারা মিডল-ইস্কুলে আসতে চায় না, অথবা এখানকার পাঠের উপযুক্ত যারা নয়, তারা এলিমেণ্টারীর ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম মানের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে।

মিড্‌ল ইস্কুলে ১ বছর পড়বার পর, শিক্ষার্থীরা একটি বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে (Realexamen) মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলের ২ বছরের পাঠ সাঙ্গ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যেতে পারে : এলিমেণ্টারী ইস্কুলের ৮ম মানের শিক্ষার্থীদেরও এমনি ব্যবস্থা থাকল। এই পরীক্ষার পর তারা রাজকীয় কাজ অর্থাৎ রেলওয়ে, পোস্ট-অফিস্ টেলিগ্রাফ বিভাগ এবং শুল্কবিভাগে যোগ দিতে পারে। এলিমেণ্টারী ইস্কুল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, অবৈতনিক। কতকগুলি অঞ্চলে মিড্‌ল ইস্কুল এবং হাই ইস্কুলেও এই অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে ; অনেক অঞ্চলের হাই ইস্কুলে অভিভাবকের আয়-অনুপাতিক বেতনের ব্যবস্থা আছে।

১৯১৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত অনেক হাই ইস্কুল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই এগুলি রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে এসে গেল।

১৯০৩এ এনহেডসস্কোলে-র যে-পরিবর্তন সাধিত হ'ল—তার সম্পর্কে একটু বলার আছে। দিনেমারেরা লাতিন-ইস্কুলকে জ্ঞানের সংবাদ কণ্ঠস্থ করবার ইস্কুল বলে মনে করত ; তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এসব ইস্কুল যেন ঠিক খাপ খেত না। কাজেই ব্যবহারিক কাজ, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তারা মিল ক'রে

এই ইস্কুলের চরিত্র বদল ক'রে নিল। কাজেই তারা ভাবতে সুরু করল ইস্কুলে কি ক'রে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া যায়, আর পরীক্ষা-পদ্ধতির কিভাবে বদল করা যায়।

সুইডিস গ্রন্থকর্ত্রী এলেন-কেই (Ellen Key) এই শতাব্দীকে শিশু-শতাব্দী ব'লে অভিহিত করেছিলেন। এই কথাটি দিনেমারেরা খুব স্বীকার করে; শিশুদের জীবন-গতি এবং স্বভাব অনুযায়ী ইস্কুল কিভাবে তৈরী করা যায় তাই-ই হচ্ছে সমস্যা। কাজেই তিনটি দিক দিয়ে তারা সংস্কার করতে চায়—

(ক) পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার, (খ) যুক্তির সঙ্গে মিশিয়ে হাতের কাজের শিক্ষাসূত্রকে প্রবর্তন করা, (গ) গৃহের সঙ্গে ইস্কুলের সহযোগ গঠন করা।

পরীক্ষা তুলে দেওয়া সত্যিই কঠিন। যে-চরিত্রেরই হোক পরীক্ষা-ব্যবস্থা রাখা দরকার, কিন্তু গ্রাণ্ডটুইগ্ পরীক্ষা আদৌ পছন্দ করেন না; তিনি ঐ বর্ণমালা দিয়ে সুরু ক'রে বই দিয়ে শিক্ষার কালকে শেষ ক'রে দেওবার প্রচণ্ড বিরোধী। তবু পরীক্ষা বাদ দেওয়া শিক্ষাকর্তৃপক্ষ খুব একটা হিতকর মনে করলেন না। কাজেই পরীক্ষা সংস্কার ক'রে তাঁরা ব্যবস্থা করলেন:

(১) বিষয়-জ্ঞান এবং তার ব্যবহার করা প্রসঙ্গে একটি পরীক্ষা; লেখা, পড়া এবং অঙ্ক কসা, আর সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা এই চরিত্রে পড়বে।

(২) ক্ষমতা পরীক্ষা—ছাত্রদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শিক্ষকেরা মতামত দিয়ে ছাত্রদের মনোভিলাষ উদ্ঘাটন ক'রে তাদের প্রবণতার বিচার করবেন।

(৩) বুদ্ধি-অভীক্ষা—ছেলেদের স্বয়ং-কর্মকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি অভীক্ষা প্রযোগ করে তাদের উন্নতি লক্ষ্য করা হবে।

পরীক্ষার দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—ছাত্রদের কৃতিত্বের পরিমাপ বেশী কর্চ্ছেন শিক্ষকেরা। তারপরই তাঁরা আনলেন হাতের-কাজ শিক্ষা। এই হাতের-কাজের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা সমাজ-মানসের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, ডিউয়ি-র 'কাজ করতে-করতে শেখা' (Learning by doing) মতবাদটিকে এঁরা পূর্ণ সমর্থন করলেন। শুধু তাই নয়, ইস্কুলের আওতায় অভিভাবকদের তাঁরা টেনে আনলেন; ইস্কুল যে তাঁদেরই সমাজ এবং সম্প্রদায়ের, এই বোধটি

জাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এইসব ইস্কুলে গ্রন্থাগার, বীক্ষণাগার, কর্মশালা, প্যাকশালা, উত্থান, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ থাকবেই। গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯১৭ সালে ইস্কুলের সঙ্গে এই বিষয়ে সহযোগিতার ভাব নিয়ে এগিয়ে এল। এমনি ক'রে অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থা মিলে এইসব সাধারণ ইস্কুলকে নিয়ে এগোতে থাকুক। আমরা গ্রাণ্ডটুইগ-কোলডের ইস্কুল সম্পর্কে আলোচনা করি।

গ্রাণ্ডটুইগের (১৭৮৩-১৮৭২) পিতা ছিলেন লুথার ধর্মমতের গোঁড়াভক্ত। গ্রাণ্ডটুইগ তাঁর মাতার কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। দিনেমারদের লোকসঙ্গীত এবং জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচয় করান তাঁর মাতাই প্রথমে। যুবাবয়সে তিনি যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে তিনি প্রেমে-জড়িত হয়ে মানসিকভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারপর থেকেই তিনি যোগজীবনে পুনরায় আকৃষ্ট হ'লেন, অর্থাৎ 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'। এই সময় তিনি তাঁর দূর সম্পর্কের ভ্রাতা দার্শনিক হেনরিক স্টেফেনস (Henrik Steffens), দিনেমার কবি এ্যাডাম ওহ্‌লেন স্কালাজার প্রভৃতির সান্নিধ্যে আসেন। তখন থেকেই তাঁর কবিতার সৌন্দর্য এবং রসের প্রতি মন আকৃষ্ট হ'ল; তা ছাড়া স্কাণ্ডিনেভিয়ানদের রূপকথায়ও তিনি আগ্রহ পেলেন।

তিনি এবিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করলেন '৮•৮ খৃষ্টাব্দে (Scandinavian Mythology)—এর মধ্যে তিনি দেহ এবং মনের দ্বন্দ্ব রূপায়িত করেন। ৮১• খৃষ্টাব্দে তাঁর মনের আরও পরিবর্তন ঘটল, তিনি পুনরায় শৈশবেব ঈশ্বর-বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

এমনি ক'রে তাঁর মনের মধ্যে দুটি দিক উদ্ভাসিত হ'ল, একটি ঈশ্বরে আস্থা, দ্বিতীয়টি লোকসঙ্গীত এবং পূর্বপুরুষদের গাথা সাহিত্য। এরই উপর দাঁড় করালেন তিনি তাঁর নয়া শিক্ষা-আন্দোলন। লোকশিক্ষালয় বা ফোক্ হাই ইস্কুল নামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮২৯-থেকে ৩১ পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন; এইখান থেকে তিনি স্বাধীনতাস্পৃহা গ্রহণ ক'রে—চার্চ, রাষ্ট্র এবং ইস্কুলকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়ার প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন; এবং এই অবসরে

গ্রাণ্ডটুইগ 'রয়াল ডানিস ন্যাশনাল হাই ইস্কুল' স্থাপনের আন্দোলন সুরু করেন ; ঠিক আন্দোলন নয়, অনেকটা আবেদন। রাজা অষ্টম ক্রিস্টিয়ান (১৮৩৯-৪৮) তাঁর মতের সমর্থন ক'রে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হ'লেন ; কিন্তু তাঁর পরমায়ু এ বিষয়ে বাধ সাধল। ১৮৪৯ সাল থেকে গ্রাণ্ডটুইগ এই রকম ইস্কুলের মাধ্যমে দিনেমার সমাজকে এই ধরণের ইস্কুলের প্রতি আস্থার ভাব গঠন করিয়ে দেন। এই ধরণের ইস্কুল প্রথম স্থাপিত হয় স্লেসউইগে। কিন্তু এই সময় মাতৃভাষা আর জার্মান ভাষার সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ; কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর কাজ অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়ে।

এই সময়ে আর একজন শিক্ষাবিদ দৃঢ় সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়ে গ্রাণ্ডটুইগের ফোক্ হাই ইস্কুলকে বাঁচিয়ে দেন ; এঁর নাম ক্রিস্টেন কোল্ড (১৮১৬-১৮৭০)। এই প্রতিভাশালী শিক্ষাবিদের জন্ম এক কৃষক পরিবারে। তাঁর ইস্কুলের বিদ্যা খুব না-থাকলেও শিক্ষণ-শিক্ষাবিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি পরবর্তীকালে গ্রাণ্ডটুইগের মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোল্ড প্রথমে ফ্যানেন এবং পরে ড্যালবিতে ফোক্ হাই ইস্কুল স্থাপন করেন ; তারপর ১৮৬২ সালে ওডেন্‌সের কাছে এমনি একটি বৃহৎ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্রিস্টেন কোল্ড শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনার পক্ষপাতী ; তিনি বিশ্বাস্ করতেন যে সুন্দর বাচনভঙ্গীতেই এ কাজ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই বক্তৃতা মুখ থেকে তোড়ের সঙ্গে বেরোবে না, উৎসারিত হবে অন্তর থেকে। কিন্তু তাঁর পাঠদানের কোন অংশ লিপিবদ্ধ করে নেওয়া তাঁর নিষেধ ছিল। কিন্তু পাঠদান যত ভালোই হোক, পরবর্তীকালে তারা মনে রাখবে কি করে ? কোল্ড বললেন, "নর্দমার কাজকর্মে কিছু চিহ্ন থাকা দরকার, ভবিষ্যতের সারাইয়ের জন্য ; কিন্তু জমিতে ফসল কি করে হবে তার দাগ দিতে হয় না। ফসল নিজেই জানে গাছের কোন্ স্থান থেকে তার জন্ম নিতে হবে। সত্যকার শিক্ষা ত তাই। ঘড়িতে যেমন দম দেওয়া হয়, তেমনি ক'রে আমিও তোমাদের এমন 'দম' দিয়ে দেব যে জীবনে আর কখনও অভিজ্ঞতার বিস্মরণ ঘটবেনা।"

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত-সম্পর্ক স্থাপনই ছিল কোল্‌ডের শিক্ষাদানের মূলমন্ত্র। প্রত্যেকের মনের মধ্যে গিয়ে পৌছতে পারতেন তিনি। তিনি ছাত্রদের বলতেন, "বাইরের মর্যাদা আর দম্ভের প্রতিষ্ঠা হিতকর নয়; তার বদলে তোমরা অন্তরকে সুন্দর করবার ইচ্ছাকে বর্ধন কর।" কৃষিকর্মের সঙ্গে এঁর ইস্কুলের বিশেষ যোগ ছিল।

কিন্তু কোনকাজই নির্বিঘ্নে চলেনা, ভালো কাজতো নয়ই। আমাদের দেশে মহাত্মা প্রবর্তিত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখেই তা অনেকটা উপলব্ধি করতে পারি। গ্রাণ্ডটুইগ আর কোলডের শিক্ষারীতির বিরুদ্ধেও বিষোদগার করতে সুরু করল মামুলী-শিক্ষক আর বুদ্ধিজীবীর দল। তাঁরা বলেন –ও-সব চাষাড়ে ইস্কুল, আষাঢ়ে মতবাদের। খবরের কাগজও এ-দলে যোগ দিল। সব দেশের সংবাদপত্রেরই একই খেলা। কাজেই এই ইস্কুলের বদনাম ডেনমার্কের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমনি সময়ে ঘটল জার্মানীর সঙ্গে দিনেমারদের সংগ্রাম ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। দিনেমার-রা কেবল বাইরেই মার খেলনা, দেশের অনেকটা হাত-ছাড়া হওয়াতে বুদ্ধিজীবীরা পানে কেবল চুণ-ই লাগাতে সুরু করল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এদেশে যেমন দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে, ১৮৬১ সালের পর দিনেমারেরাও তেমনি জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির কাজে লেগে যায়। আর সেই সময়েই বুঝলেন কোল্‌ডের শিক্ষার উপযোগিতা।

পালুডান-মুলারের কবিতা আবার ফোক্ হাই ইস্কুলের দিকে দিনেমারদের চিত্ত আকৃষ্ট করে দেয়। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মতো তাঁর কবিতাও হ'ল জাতীয় সঙ্গীত:

> 'সত্য এবং স্বর্ণপ্রভ চিত্তের পুরুষ
> দৃঢ় আর ধর্মের চেতনায় নারী;
> এই-ই হচ্ছে ডেনমার্কের লক্ষ্য।'

এই উভয়দিকই সংসাধিত হয় ফোক্-হাই-ইস্কুলের শিক্ষায়; তাই এই ইস্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন লাডউইগ স্রুডার, আর্নস্ট ট্রাইয়ার, জেনস্ নারেগার্ড প্রভৃতি শিক্ষাব্রতী। ক্রিস্টেন কোল্‌ডের থেকেও তাঁরা গ্রাণ্ডটুইগ-কে ভালো-ভাবে বুঝতে পারলেন। কাজেই কোল্‌ডের মতবাদ থেকে এখন গ্রাণ্ডটুইগের

মতবাদই বিশেষভাবে চালু হল এই সব ইস্কুলে। এমনি ক'রে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে (বিশেষ করে প্রুশিয়দের বাধা) ফোক্ হাই ইস্কুল আসকভে এসে খ্যাতির শিখরে দাঁড়িয়ে পড়ল বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেশাত্মবোধ-কে উত্তীর্ণ হয়ে ফোক-হাই ইস্কুলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাধনা চলতে সুরু করে। তারপর আমরা দেখছি এলসিনোরে পিটার ম্যানিচে-র (Peter Manniche) তত্ত্বাবধানে 'ইণ্টার ন্যাশনাল ফোক হাই ইস্কুল' স্থাপিত হ'তে। গ্রাণ্ডটুইগ আর কোল্‌ডের শিক্ষা-সম্পর্কে যে-ধারণা তার একটু আলোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গ্রাণ্ডটুইগ দেশের যুবকদের উপরেই আস্থা রাখতেন বেশী (১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সের)। তাদের শিক্ষা দিয়েই দেশে এক প্রাণ, এক মতের প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি মনে করতেন এমনি করে নিরক্ষরতা আর পাণ্ডিত্যের ভেদ দূরীভূত করা সম্ভবপর। ছেলেদের ইস্কুল সম্পর্কে তিনি মামুলী ইস্কুল বা লাতিন ইস্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলতেন এই যে বিজ্ঞান আর প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ইস্কুল—এগুলো তো মৃতের ইস্কুল! কারণ এ ইস্কুলের শিক্ষায় ছেলেদের চরিত্র গঠিত হয় না। তিনি বলতেন, সাধারণ ইস্কুলে লেখা-পড়া আর অঙ্ক কসার উপর কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া ধর্মশাস্ত্র ইস্কুলের আওতায় পড়ানোর মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছুতে নেই! জীবন আর শিক্ষা পাশাপাশি চলবে; জীবন আগে, শিক্ষা সেই জীবনকে অনুসরণ করবে মাত্র। ঐযে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে শিশুদের নানা যুক্তি-ন্যায় শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ করতে চেষ্টা করছে ইস্কুল-কর্তৃপক্ষ, তারা কি জানে না—এসব কত নিরর্থক, তারা কি জানে না যে, এসব জীবন-বিরোধী কাজ। গল্প বল, রূপকথা বল, জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ইতিহাস পড়াও, কিছু কিছু কাজ কর্ম করতে দাও, লেখা শেখাও, পড়া শেখাও, আঁক শেখাও—শিক্ষার এইতো সব হওয়া উচিত। এর বেশী আবার কি? তাদের চিত্তের সম্প্রসারণ ঘটাও, অনুভূতির রাজ্যকে উন্নীত কর।

কোল্‌ড বললেন, শিশুদের সামর্থ্য আর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাকে চালু করতে হবে; তাদের বুদ্ধির উৎকর্ষতা সাধন করতে যাওয়া উচিত নয়। তাদের

কল্পনাশক্তিকেই বিকাশ কর। শিক্ষক কেবল তাদের প্রবণতাকে সামলিয়ে আর উসকিয়ে চলবেন। যুক্তি-বিজ্ঞান প্রযুক্ত হবে মাত্র অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে; আর ধর্মশাস্ত্র এবং জাতির ইতিহাস পড়ানোর চেয়ে উপলব্ধি করিয়ে সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন কাজে-কর্মে সেই মনোবৃত্তি প্রতিফলিত করুক। বক্তৃতাধর্মী পড়ানো থাকবে, কারণ এই বক্তৃতার মধ্যে তারা নিজদের স্বপ্ন সার্থক হ'তে দেখবে, সার্থক করতে চেষ্টা করবে, ব্যবহারিক জীবনে সেই নীতি মানতে চেষ্টা করবে। শিক্ষকের আদর্শের প্রভাব কোল্‌ড বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া তিনি বললেন, পাঠ প্রস্তুত করা এবং পরীক্ষা দেওয়া ব্যাপার দুটো ইস্কুল থেকে তুলে দিতে হবে। শিশুশিক্ষার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তিনি স্বীকার করেন নি; অভিভাবকের কর্তৃত্বও নয়; কর্তৃত্ব নয়, দায়িত্ব বোধ—মমত্ব তিনি চেয়েছিলেন।

এই নীতির উপর দাঁড়িয়েই ফোক্‌-হাই ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল—দিনেমারদের যা নিজের জিনিস। সেখানকার শিক্ষায় স্থান হ'ল—গল্পের, গানের এবং শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের; সেখানে স্থান নেই পাঠ্যপুস্তকের, পরীক্ষার, এবং মুখস্থবিদ্যার; এই ইস্কুলের প্রাণ হচ্ছে শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকের এবং অভিভাবকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সহৃদয়তা।

ডেনমার্কের ফোক্‌-হাই ইস্কুলের উপর জোর দিয়েই আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ করেছি। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এ ছাড়াও তাদের অন্যান্য ধরণের ইস্কুলও আছে—যেমন, কৃষি-ইস্কুল, ব্যবসাবাণিজ্যিক-ইস্কুল, টেকনিক্যাল এবং ঐ ধরণের কারিগরী ইস্কুল, পরিবহ বা অব্যাহত ইস্কুল, বয়স্কদের ইস্কুল, গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের ইস্কুল, পঙ্গু বা ব্যাধিত ছেলেমেয়েদের ইস্কুল প্রভৃতি। তা ছাড়া ডেনমার্ক দেশটি শিশুদের মঙ্গল এবং সুখসুবিধার জন্য তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে রেল, মিউনিসিপ্যালিটি, রাষ্ট্র এবং বেতার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার অনুমোদন আছে, ৭০ বছর বয়সে অবসর নিতেই হবে; শিক্ষকতায় অধিক বয়সের অনুমোদন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কারণ যখন শিক্ষাকার্যে তাঁরা কেবল অভিজ্ঞ হ'তে সুরু করলেন সেই ৫৫ বছর বয়সেই তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় না।

তা ছাড়া আছে তাঁদের পেন্সনের ব্যবস্থা ; অসুস্থ হয়ে পূর্বেই অবসর নিতে হলেও বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্র চার রকমে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে : (১) স্টেট ইস্কুল, (২) রাষ্ট্রের অধীনে মিউনিসিপ্যালিটির ইস্কুল, (৩) বৃত্তিপ্রাপ্ত বেসরকারী ইস্কুল আর (৪) বৃত্তিবিহীন বেসরকারী ইস্কুল। মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরেও কিছুটা এই রকমের নিয়ন্ত্রণ। যাই হোক, আমরা এই প্রশাসনিক দিকটি বর্তমান গ্রন্থে তেমন আলোচনা না ক'রে—ডেনমার্কের ইস্কুলের চরিত্র সম্পর্কেই বিশেষ আলোচনা ক'রে দেখছি, জগতের সমস্ত দেশেই চিন্তাধারার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছেই। আর আজ দেখছি,সংস্কৃতি কখনও উদ্ভিদের মতো নয়, বরং বিভিন্ন দেশের ভাবধারার মিথস্ক্রিয়ায় এই সংস্কৃতি গঠিত হয়। আমাদের দেশের শিক্ষারীতিতেও এই সব ইস্কুলের কোন্ কোন্ প্রভাব স্বীকার করেছি বা করব—তা ভেবে দেখা দরকার।

জার্মানীতে

সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথায় যদি হাইড্রোকার্বন না থেকে ঈশ্বর থাকতেন, যত কোটি বছর আগেই হোক না কেন যদি স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মাতৃস্নেহ না থাকত, চন্দ্র যদি প্রশান্ত মহাসাগরের খানটুকু খাব্‌লে গ্রানাইটের স্তর সাবাড় না-ক'রে সমগ্র পৃথিবী-খণ্ডেরই ব্যাসল্টের স্তর বের ক'রে দিয়ে যেত—তা হ'লে মানুষের শিক্ষা নিয়ে এত বোধহয় হৈ-চৈ করতে হত না ; কিংবা সৃষ্টির নিয়ম বোধহয় বুধ শুক্র গ্রহেরই মতো অনেকটা সহজ হয়ে যেত। মানুষ একপ্রকারের জীব, এ কথা যতখানি সত্য, মানুষের মনের উপর মানুষের প্রভাব আছে—একথাও ততখানি সত্য। মনের উপর এই প্রভাব কোন্ মানুষের? ব্যক্তিরও যেমন সমগ্র জাতিরও তেমনি। প্রথমে ছিল ব্যক্তির প্রভাব বেশী, জাতির প্রভাব কম ; কিন্তু পরে হ'ল জাতির প্রভাবই একান্ত। জাতির এই ঐকান্তিক প্রভাবকেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে অস্বীকার ক'রে বসে। আর, এই অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যে সমাজের পক্ষে কেবল ভালো কাজই করে তা

নয়, মন্দ কাজও ক'রে বসে। তাছাড়া আছে মানুষের মনে সংগ্রাম থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা, শান্তির ইচ্ছা। ঐ শান্তি পেতে হ'লেই মানুষকে মন-সম্পর্কে এত নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়—যার মোটামুটি হিসেব থাকে ধর্মে, নীতিতে আবার শিক্ষায়। কিন্তু এই জার্মান দেশ কি কোন দিন সংগ্রাম থেকে অবসর পেয়েছে? হয়ত অবসর সবটুকু কোনদিনই পায় নি, কিন্তু অষ্টম-নবম শতাব্দীতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। সেই সময়েই আলকুইনের শিষ্য হ্রাবানাস (Hrabanus) এখানে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হ্রাবানাসের জন্ম ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে। হ্রাবানাসকেই বলা হয় জার্মানীর প্রথম শিক্ষক। কিন্তু চার্চ-সংলগ্ন ইস্কুলের অন্যত্রও যে-ধর্ম ছিল এখানেও তাই। কাজেই চার্চের সে ইস্কুলের বিবর্তন বলতে গিয়ে বহুভাষিতার দোষে জড়িয়ে না-পড়াই মঙ্গল। আমরা হ্রাবানাস বা লুথারের ধর্ম-মত নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। আমরা শিক্ষা আর ইস্কুলের মধ্যে এঁদের এবং সমাজের অভ্যন্তরের লোকের যে-প্রভাব আসছে তাকেই অনুসরণ করতে চেষ্টা করব।

শিক্ষা-ইতিহাসে জার্মানীতে একটা দিক লক্ষ্য করবার মতো যে, ১২৩২ থেকে ১৩৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় বিশ-বাইশটা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রয়োজনীয়তা কি, আর চার্চের ইস্কুল থেকে এদের স্বাতন্ত্র্যই বা কি?

একথা তো ঠিক, এর পূর্বে ইস্কুল চার্চসংলগ্ন হওয়ায় শিক্ষাটি ধর্মযাজকদের একচেটিয়া হয়ে পড়ছিল। নগর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার চাহিদা বাড়তে থাকে। কারণ, ঐ নগর-পত্তনের মর্মেই সে-কথা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কারিগরী শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিই লেখা এবং পড়ার প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। পড়ার চেয়েও লেখার কদর বেশী। সেই ইজিপ্টের মতো এই কয় শতাব্দীতেও। কারণ? কারণ হচ্ছে, যখন ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে, তখন খাতাপত্তর ঠিক করার প্রয়োজন পড়ে। খাতাপত্তর, যাকে বলে রেকর্ড—তা লিখতে লেখারই দরকার; এখনও তো ড্যালহৌসি স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিং-নামটায় মন্ত্রী আর মুনসী উভয়েই স্থান পাচ্ছে। ব্যবসায়ের থেকে শাসনকার্য। কাজেই এ সময় সব বাপ-মাই চাইতেন ছেলেরা লিখতে শিখুক, লিখতে শিখলেই

স্বাধীন হবে, স্বাধীন হলেই তাদের পছন্দমতো সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারবে। সেই হাইড্রোকার্বন আর মাতৃস্নেহ! ইয়োরোপে তখন মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল চার্চ-নিরপেক্ষ লেখা-আর-পড়ার ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার ধুম পড়ে গেল। কিন্তু জার্মানীর কপাল খারাপ। তাদের দেশের চার্চ বড় শক্ত খুঁটি গেড়ে বসেছে। সহজে নাগরিকেরা তাদের সরিয়ে দিতে পারে নি। চার্চের পরোয়া না করে জার্মানীতে এই রকম ইস্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন লুই ড্রিনগেনবার্গ—শ্লেটস্টাডে (Schlettstadt in Lower Alsace)। এমনি ক'রে বার্গ লাতিন গ্রামার (Burgh Latin Grammar School) ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করবার হিড়িক পড়ে গেল। এখানে পড়বে ব্যবসায়ীদের ছেলে। তবে পাঠ্যসূচী অনেকটা চার্চ লাতিন গ্রামার ইস্কুলেরই মতো। কাজেই চার্চের তরফ থেকে বাধা এল। আর সে বাধা কি রকম, একেবারে নাগাসন্ন্যাসীদেব মতো—রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। মতবাদে তো চার্চের সঙ্গে এদের পার্থক্য নেই, তবে এ বাধা কেন? কারণ সম্পত্তি হারাবার ভয়। ইস্কুল চালিয়ে চার্চের তো কম টাকা আয় হয় না। চার্চ এই পৌরসভার নায়কদের ধর্ম থেকে ব'হিষ্কার করে, আবার পৌব সভার নায়কেরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গাঙপার ক'রে দেয়। এই সময়ে পোপ এসে মধ্যস্থতা করলেন। কারণ, এ তো একটি মাত্র দেশেরই ব্যাপার নয়; মধ্যযুগে এমনি অবস্থা সারা ইযোরোপে। তারপর নগরের ইস্কুলগুলোর দিনে দিনে বাড়ে কালকেতুর অবস্থা। এরপর আমরা জার্মানীর অন্তর্গত প্রুশিয়ার অভ্যন্তর ভাগটি দেখি।

এখানে দ্বিতীয় জোয়াশিম (Joachim II) ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা নিয়ে কিছু ভাবতে সুরু করেছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ইস্কুল স্থাপনার উদ্দেশ্যটি প্রণিধান যোগ্য: খৃষ্টধর্ম সংরক্ষণ এবং দৃঢ় পুলিসবাহিনী তৈরী করবার উদ্দেশ্যেই ইস্কুলেব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন (Die Erhaltung guter Polizei); সহরেই এইসব ইস্কুল ছিল, পড়ানোর মধ্যে ছিল—ধর্ম, লেখা, পড়া এবং অঙ্ক কসা। ইস্কুল পরিচালনায় ছ' জন লোক থাকতেন—৩ জন চার্চ থেকে আর ৩ জন চার্চের বাইরের। জোয়াশিম পরিদর্শকও নিযুক্ত করেছিলেন (১৬০০ খৃষ্টাব্দে); তাঁরা দেখতেন প্রত্যেক ইস্কুলে ঠিকমতো মাস্টার রাখছে কি না;

তা ছাড়া তাঁরা পড়ানো-শোনানোর খোঁজ-খবরও নিতেন। এমনি ক'রে রাজার আয়ত্তে চলে আসছে ইস্কুল।

প্রথম ফ্রেডরিক উইলহেলম (১৭১৩-১৭৪০) ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইস্কুলের আইন রচনা করলেন। এই আইনে শিক্ষা সর্বসাধারণের এবং আবশ্যিক ক'রে দেওয়া হ'ল। ছেলেরা যদি ইস্কুলে না-আসত তবে অভিভাবকদের জরিমানা করা হ'ত। হ্যাঁ, বেতন দিতে হবে বৈকি! তবে খুব দরিদ্র যারা তাদের সাহায্য করবে মিউনিসিপ্যালটি। তারপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষকদের মাইনের কথাও বললেন। ব্যবস্থা হ'ল, ছাত্রদের বেতন থেকে মাইনে তো তাঁরা পাবেনই, অধিকন্তু শিক্ষকেরা যে-বিষয়ে পারদর্শী (যেমন, দর্জির কাজ, কামারের কাজ, ছুতোরের কাজ) সে বিষয়েও একচেটিয়া ব্যবসায় করতে পারবেন। যাঁরা এমন কাজ জানতেন না, তাঁদের ৬ সপ্তাহের ছুটি মিলত—ঐ সময়ে খামারের কাজে যোগ দিতে পারতেন। তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য সেমিনারীও খোলা হ'ল।

মহামতি ফ্রেডরিক (১৭৪০-৮৬) পিতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রুশিয়াতে আবশ্যিক শিক্ষা ইংল্যণ্ড-ফ্রান্সের অনেক আগে থেকেই সুরু হয়েছে। এরপর শিক্ষা-সচিব হিসাবে হুম্‌বোল্‌ড্‌ট্‌ এবং রাষ্ট্র সচিব স্টেনই, ফিক্‌টে প্রভৃতি মনীষীর উৎসাহে প্রুশিয়ার শিক্ষা এগিয়ে যেতে থাকল। হুম্‌বোল্‌ড্‌ট্‌—প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলিকে নতুন ক'রে রূপ দিলেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে—রাষ্ট্রের এই যে মর্যাদা এ অনেকটা লুথারই দিয়ে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রকে চার্চের সমানই শ্রদ্ধার যোগ্য বলে, পবিত্র ব'লে অভিহিত ক'বে গেছেন; আর তারই ফলে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এত কর্মক্ষমতা।

উরটেম্‌বার্গ ও পিছিয়ে থাকল না। তারাও ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই ইস্কলকে সাজাতে সুরু করেছিল। ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে। এইখান থেকেই জন্ম হয়েছিল অব্যাহত ইস্কুলের (Continuation School)। কিন্তু অব্যাহত ইস্কুল চার্চ সংলগ্ন ছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায় না, কাজেই ইস্কুলের ঘণ্টা সারা দিনমান

চলতে থাকুক। সাক্সন্যাণ্ডের বিশপ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এই অব্যাহত ইস্কুলের প্রবর্তন করেন—প্রবর্তন করেন শুধু ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই ভাবটিই পরে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। সেও কিন্তু এই রাজ্য থেকেই প্রবর্তিত হয়। আর ১৮৪৬এর দিকে এই ব্যবসায়িক বা ট্রেড ইস্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেল ৬৯এ। এরপর অব্যাহত কারীগরী ইস্কুলের নিয়ম-কানুন প্রণয়নের জন্য ১৮৫৩ সালে কমিসন বসল। এই বাণিজ্যিক ইস্কুল কেবল ছেলেদের জন্যই নয়, মেয়েদের জন্যও। এমনি ক'রে উরটেমবার্গ থেকে কারিগরী বিদ্যালয় জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হ'ল ২৬টি রাজ্য নিয়ে। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম্ সম্রাটও বটে, প্রুশিয়ার নৃপতিও বটে। রাষ্ট্রীয় গঠন এবং সংবিধানের কারণে প্রুশিয়ার থাকল একচ্ছত্র আধিপত্য এই জার্মান সাম্রাজ্যে।

দেশের সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক ইস্কুলগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করে দেখা যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাথমিক ইস্কুলের নাম ছিল—এলিমেণ্টার স্যুলেন (Elementar Schulen)। কিন্তু ১৮০৬ থেকেই এগুলোর লোক-ইস্কুল বা ফোক্ স্যুলেন (Volk Schulen) নাম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিল। কারণ সর্বসাধারণের অন্তর্বৃত্তির মুক্তিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এখন থেকে এই ইস্কুলের ব্রত। এ বিষয়ে ১৮০৮এ স্টেইনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য; 'ছোটদের শিক্ষা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে আমরা অনেক কিছু অনুধাবন করতে পারি, প্রত্যাশা করতে পারি। যদি তাদের অন্তরস্থ সুপ্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সেই পদ্ধতিতে তাদের আত্মিক চরিত্র বিকাশ ঘটানো যায়, এবং সুকঠোর জীবন-নীতিকে যদি পোষণ এবং উৎসাহিত করা যায়; যদি একমুখীন শিক্ষাকে বর্জন করা যায়, যদি শক্তি এবং মর্যাদার উৎস সেই উপেক্ষিত সহজাত প্রবৃত্তিকে সতর্কতার সঙ্গে চালু করা যায়, তা হলে মনে করি—শারীরিক এবং নৈতিক দিক দিয়ে এমন এক সবল জাতি আমরা ভবিষ্যতে পাব যে…' ইত্যাদি। এ:খানি জোর পড়ল, কারণ ১৮০৬এ প্রুশিয়া যুদ্ধে যে হেরে গেল! এই কথাই তো অন্যভাবে পেস্তবলৎজী বহু পূর্বে বলেছিলেন মশাই! আসল কথা

জাতির নায়ক বাইরে অপদস্থ না হলে দেশের যুবকসাধারণ এবং শিশুমহলে ফিরে আসে না। দেশের শিক্ষাই যে জাতিগঠনে সাহায্য করে—শান্তিকামী পরান্নভোজী পরিপুষ্ট ব্যক্তিরা তা প্রায় ভুলেই থাকেন। তৃতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ামও ঐ কথাই বলেছিলেন, "আমরা রাজ্য হারিয়েছি, রাজ্যের গৌরব হারিয়েছি, আর তাই আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা যেন দেশবাসীর শিক্ষার দিকে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করি।" এঁদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। কারণ বিড়াল কোন্ সময় কাশী যায় তা প্রায় সবারই জানা।

ঠিক তাই হ'ল। আলটেনস্টাইনের মন্ত্রীত্বকালে (১৮১৭-৩৮) এই প্রাথমিক ইস্কুলের সংস্কৃতির দিক চাপা দিয়ে তার যন্ত্রবিজ্ঞানের শিক্ষার দিক তুলে ধরা হল। চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ামের সময় (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) ইস্কুলগুলো জাঁদরেলী ক'রে পরিচালনা করা হ'ল। শেষটুকু শেষ করলেন অটো ফন্ রাউমার (১৮৫৪ সালে)। এই সময় প্রাথমিক ইস্কুল অর্থ এক ইস্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক। এ্যাডালবার্ট ফক শিক্ষামন্ত্রী (১৮৭২-৭৯) হয়ে এই ব্যবস্থাটার বদল করলেন; অনেক-শ্রেণী নিয়ে প্রাথমিক ইস্কুল চালু করলেন তিনি। কিন্তু ইস্কুলের দোষ আরও জমা হ'ল বিসমার্কের শিক্ষানীতির জন্য। তাঁর রাজ্যে অক্ষরজ্ঞান দরকার কেন? অধস্তন কর্মচারীর এবং শিল্পালয়ের শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সোস্যালিজম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও এ ধারণার খুব একটা পরিবর্তন ঘটল না; তাঁরা চাইলেন বিশ্বস্ত এবং বশংবদ নাগরিক বা প্রজামণ্ডলী তৈরী করতে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এই দুর্দশা কেন হল? তার কারণ জমা হয়ে আছে জার্মানীর সমাজের অভ্যন্তরে। এই সমাজের একটা অংশ ভূম্যধিকারীরা।

তাঁদের ধারণা লেখাপড়া শিখে কৃষকেরা সহরে চলে যাবে এবং শিল্পকারখানায় যোগ দেবে। আবার শিল্পপতিরাও লেখাপড়ার বিরোধী—কারণ শ্রমিকেরা তা হ'লে নিজদের সুখ-সুবিধা আদায় করবার জন্য সঙ্ঘসমিতি গঠন ক'রে বসবে। ভূম্যধিকারীদের আর একটা ধারণা ছিল যে, লেখাপড়া শিখে লোকে ধর্ম ভুলে যায়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য অন্যত্র। ভূম্যধিকারী বা Junker হচ্ছে জার্মানীর সমাজের প্রভাব-শালী সম্প্রদায় (১৯১৮এর পূর্ব

পর্যন্ত)। বড় বড় চাকরী তারাই করত, মন্ত্রীই বলা যাক আর সচিবই বলা যাক সবই এই পরিবার থেকে আসত। কাজেই সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ঘটলে তাদের পদ-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটবে, এ ভয় তাদের ছিল।

তারপর হচ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এরা ইতস্ততকারী দল। শিক্ষার মূল্য তারা বুঝত, কিন্তু শ্রেণী বৈষম্যকেও ভুলে যেতে পারে না। তারা প্রোলেটারিয়েট বা শ্রমিকদের চেতনাকে লক্ষ্য ক'রে ভয় পেয়েছিল যে, হয়ত বা এরা জার্মানীর জাতীয়তাকে নষ্ট ক'রে বসবে।

কিন্তু জার্মাণ সাম্রাজ্যে একটা রীতি ছিল যে, ছেলেরা ৬ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবশ্যতই ইস্কুলে যাবে। রিপাব্‌লিক এ ধারার কোন পরিবর্তন করে নি। আর একটি নীতিও অনুসরণ করা হ'ল। প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের আরও কিছুকাল বৃত্তিমূলক অব্যাহত ইস্কুলে (Continuation School) পড়াশুনা করতে হবে, এই ইস্কুলের নাম বেরাফস স্যুলে (Berufsschule); কতকাল? ১৯১৯ এ নির্ধারিত করেছিল ৩ বছর। সাধারণত ২ থেকে ৩ বছর পর্যন্তই এই শিক্ষা চলত। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে ঐক্য সম্পাদনের চেষ্টা হ'ল—যার জন্য এই ইস্কুলের নাম করা যায় গ্রুণ্ডস্যুলে (Grundschule)। ১৯১৮ এর পর বামপন্থীদল এই গণতন্ত্র-সম্মত ইস্কুলের নামকরণ করতে চেয়েছিলেন আইনহাইটস্যুলে (Einheitschule) বলে। কিন্তু গ্রুণ্ডস্যুলে-র সঙ্গে ফোর্‌স্যুলে-র (Vorschulen) তফাৎ আছে। ফোরস্যুলেকে বলা যায় বিলাতের প্রিপারেটরী ইস্কুলের মতো। এসব ইস্কুল মাধ্যমিক ইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকত। যারা উচ্চতর বিদ্যালয়ে পড়বে তারা এখানে ভর্তি হয়ে ৪ বছরের যায়গায় ৩ বছরের মধ্যেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবেশলাভ করত।

এই 'ফোরস্যুলে', ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য আনে বলে পরবর্তীকালে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে এ-ও স্থির করা হয় যে, প্রাথমিক ইস্কুলে ছাত্রদের বই এবং সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

১৯১৯ এর 'ফোর্‌স্যুলে' আর 'গ্রুণ্ডস্যুলে' সম্পর্কে নাজীরাও সায় দিল। তারা 'গ্রুণ্ডস্যুলে'-কে সমর্থন করল অন্য উদ্দেশ্যে; তারা ভাবল এই কচিবয়সের

মানবশিশুকে আদর্শ-ছাপে গঠিত ক'রে নেওয়া অনেক সহজসাধ্য। কাজেই ১৯৩৬ সালে অবশিষ্ট ফোরস্যুলে-কে তুলে দেওয়া হ'ল। অবশ্য নাজীরা এই উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল তাদের উপেক্ষার বস্তু। আর একটি কারণের কথাও অনেকে বলেন; নাজীদল বুদ্ধিবৃত্তিকে তত পছন্দ করত না; কেউ কেউ বলেন, এই প্রাথমিক ইস্কুলগুলো গ্রামের মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, দেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত এই ইস্কুলের শিরা-উপশিরা চলে গেছে। নাজী দলের পক্ষে এ বড় কম প্রলোভনের বস্তু নয়। এইজন্য তারা নিজেরাও কতগুলি নিজস্ব প্রাথমিক ইস্কুল খুলল—নাম দিল, 'হানস্-সেম স্যুলে' (Hans-Schemm Schueln)। ১৯৪০এ তাদের এক নির্দেশ নামায় উক্ত আছে, "প্রাথমিক ইস্কুল—দলের অন্যান্য ইস্কুলের সঙ্গে এক হয়ে—জার্মানীর যুবজনের চিত্তগঠনে এমন কাজ দেবে যে তারা ভবিষ্যতে সমাজের, জাতির এবং ফুয়েরারের অনেক সাহায্য করবে।" কিন্তু তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই হোক আর যে-করেই হোক ভালো কথাও বলেছিল—"প্রাথমিক ইস্কুল নষ্ট করলে, জাতি যে উৎস থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে সেই উৎসকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়।"

নাজী রাজত্বকাল ফুরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাথমিক আর মাধ্যমিকের মধ্যবর্তী আর একধরণের ইস্কুলের অস্তিত্ব ছিল—তার নাম মিটলস্যুলে (Mittelschule)। এই ইস্কুল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফক্ (Falk)-ই করেন; কারণ ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক শ্রেণীর চাহিদা মেটাতে হয়েছিল। ৬ বছরের পড়া এখানে, ৯ বছর বয়সে—প্রাথমিক স্তরের চার বছর শেষ হ'লে—এখানে এসে তারা ভর্তি হ'ত—পড়ত ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত। এই ইস্কুল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেউ বড় একটা যেতনা। এখানে পড়া ঐচ্ছিক, কাজেই বেতন দিতে হ'ত; তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এখানকার বেতন কম। এখানে একটি বিদেশী ভাষা শিখতেই হ'ত; আর ব্যবহারিক বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হ'ত বেশী। নাজীরাও এই সব ইস্কুল রেখেছিল; কিন্তু যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব ইস্কুল রূপান্তরিত হয়ে নাম নিল হাউপ্টস্যুলে (Hauptschule); হিটলার নিজে এই পরিবর্তন করেছিলেন। এই ইস্কুলে ৬ বছরের বদলে

(প্রাথমিকের ২ বছর পর) করা হল চার বছরের পাঠ্যসূচী ; এর সঙ্গে যুক্ত থাকল ছুটি কন্‌টিনিউয়েসন বা অব্যাহত শ্রেণী (Aufbau Klassen) ; ঐ চার বছরের মধ্যেই, তবে কোন কোন সময় কাল বাড়িয়ে নেওয়া হ'ত। পাঠ্যসূচীর মধ্যে ব্যবহারিক বিষয় সমূহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত, আর ইতিহাস এবং ভূগোল এমনভাবে পড়ানো হ'ত যাতে জাতীয় চরিত্র এবং ঐতিহ্য বুঝতে তারা সক্ষম হয়। ধর্মশাস্ত্র পড়ানো বর্জন করা হ'ল। অনেকে বলেন, পাঠ্যসূচীর পিছনে রাজনৈতিক এবং আদর্শগত মনোভাবই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হ'ত। কিন্তু কোন্ পাঠ্যসূচীই বা এই দুটি মনোভাব ছাড়া! মাত্রায় বেশী আর কম নিয়ে যা কিছু কথা। হিটলারের আমলে যে এই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তার প্রমাণ মেলে ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রথমত এই নির্বাচন করতেন প্রাথমিক ইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক, তারপর সেই তালিকা অনুমোদন করবেন পার্টির কর্তৃপক্ষ ; অনুমোদন নির্ভর করত ছাত্রের স্বাস্থ্যের দিক এবং জাতিগত কৌলীন্যের দিকের উপর। কাজেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক এই ইস্কুল নিয়ন্ত্রিত হলেও আসলে কর্তামি করতেন হিটলারের রাজনৈতিক দল। জঙ্গীবাদের দিকে তাকিয়েই এই সব করা হ'ত। শিক্ষা যখন কোন একটি বিশেষ দলের কুক্ষিগত হয় তখনই তা আপত্তিকর। হিটলার এই ইস্কুল নিয়ে এই আপত্তিকর কাজই করেছিলেন। সবাই হয়ত এমনি করতে চায়, কিন্তু পারে না। পারে না বলেই, মনে হয়, তাদের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তা সে যত ক্ষীণই হোক। কিন্তু হিটলার ছিলেন এ বিষয়ে একেবারে উগ্রপন্থী। ১৯৪২ এর পর থেকে মিটলস্যুলে দ্রুতগতিতে হাউপ্টস্যুলেতে রূপান্তরিত হয়ে চলল। হিটলারের যে-দোষই থাকুক, ইস্কুল যে দেশের কাজে কতখানি লাগতে পারে তা বুঝবার মতো প্রতিভা তাঁর ছিল। অন্য সব দেশে (ইয়োরোপের) ইস্কুলের ভালো করাটা যেন দাতব্য করার মতো, কিন্তু জার্মানীতে আর ডেনমার্কে দেখা গেল, ইস্কুল সমাজের, দেশের জন্য সংগ্রামের এক প্রধান অস্ত্রস্বরূপ।

কিন্তু জার্মানীতেও এই বোধ একেবারে আকাশ থেকে পড়ে নি ; প্রয়োজনে পড়ে এই বোধ জন্মেছে। প্রথম দিকে জাতি বলতে জার্মানীর খণ্ড-খণ্ড রাজ্যের

প্রতি আনুগত্য বোঝাতো ; জার্মানীর অধিবাসীর চিত্তবৃত্তিতে দুটি বিরোধী শক্তি কাজ করত : (১) চার্চের প্রতি শ্রদ্ধা এবং (২) জাগতিক কাজকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি। কাজেই প্রাচীন ভাষা শিক্ষা-পাঠ্যসূচীর একদিকে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের সেবা। দার্শনিক হেগেল আবার এই প্রাচীন ভাষার চর্চা আর রাজপুরুষ—এই দুই-কে সর্বোচ্চে স্থান দিলেন। হয়ত তাঁর সময়ে ঐ ভাবধারারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপুরুষদের প্রতি আনুগত্য যেন জার্মানীর শিক্ষাব্রতীদের দুঃসহ হয়ে ওঠে। তাঁরা জানলেন, এদের হাত থেকে মুক্তি না ঘটলে শিক্ষায় গণতন্ত্র আসবে না। মুক্তি ঘটিয়ে দিলেন নেপোলিয়ঁ। এবারে উদার দেশাত্মবোধ এবং দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণী মনের সন্ধান পেলেন জার্মানেরা।

জার্মানীর বড় সৌভাগ্য যে, হুম্‌বোল্‌ড্‌টের মতো শিক্ষাসচিব পেয়েছিল। আর দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের মনটি বড় বেশী গতিশীল। বস্তু বা মনের সাধ্যকে অতিক্রম ক'রে গেলে সে গতি ধ্বংসাত্মক। হুমবলড্‌টের ধীর-গতি তারা পছন্দ করতে পারল না।

হুমবোলড্‌ট্‌ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যসূচী এমনভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন যাতে মনের মুক্তি ঘটে, জাতির পুনর্জন্ম হ'তে পারে। হ্বাইমার (Weimer)-এর মতবাদী ছিলেন হুমবোলডট। তিনি ব্যক্তিত্বগঠনে এবং সত্যকার মনুষ্যত্ব সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। ব্যক্তিত্ব আর সত্যকার মনুষ্যত্ব কি, তার ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন গ্যয়টে তাঁর ফাউস্ট নামক গ্রন্থে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? ছাত্রদেব কেবল প্রাচীন ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপকরণ যুগিযে যাওযাই বড় কথা নয়, 'তাদের এমন শক্তি যোগাতে হবে যাতে তারা অনুভব-শক্তিকে বাড়াতে পারে, এবং আদর্শ-মনুষ্যধর্মের উপযোগী চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করতে পাবে।' প্রাচীন ভাষাব মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেল—জীবনকে পরিচালিত করা এবং অধ্যাত্ম রাজ্যকে উন্নীত করা। কিন্তু সৎনাগরিক হওয়ার জন্য, দায়িত্বশীল নাগবিক হ'তে, অন্য বিষয়-বস্তুর যা দরকার তাকেও বাদ দেওয়া চলবে না। এই হচ্ছে মাধ্যমিক বিষয় বস্তু পড়ানোর একমাত্র উদ্দেশ্য।

মাধ্যমিক ইস্কুলগুলোর ১৮:৮ সালে নতুন নামকরণ হল জিমনাসিয়াম (Gymnasium) বলে। এখান থেকে পাশ ক'রে তারা সার্টিফিকেট বা আবিটুর (Abitur) নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকত।

কিন্তু আলটেনস্টাইন এ চাকা ঘুরিয়ে দিলেন। রাজকর্মচারী চাই বটে! প্রাচীন ভাষা থাকল কিন্তু পেছন-পেছন আসবে—সাধারণ শিক্ষার। ফলে প্রাচীনভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'ল। ১৮৩০ থেকে :৮৩৭ প্রুশিয়া-ব্যাভেরিয়াতে এই অদ্ভুত ব্যাপারই চলতে থাকল।

কাজকর্মও কম ছিল না। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের মনোভাবটিই এই যে, সেখানে কাজ হোক চাই নাই হোক, কর্মচারীকে যতক্ষণ পারা যায় আটক ক'রে রাখতে হবে। প্রধান উদ্দেশ্য—এরা অন্দোলন করতে অবসর পাবে না। কিন্তু ফলে যে দেশের লোকের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় সে হিসাব কর্তৃপক্ষ করে না। হিসাব করতে হল—যখন ১৮৩৬ সালে এই অত্যধিক কাজের চাপ লোকের স্বাস্থ্য কিভাবে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে—তা চিকিৎসক মণ্ডলী আন্দোলন ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

১৮৫৬ সালে প্রুশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্থার অধিকর্তা লুডউইগ ভাইস (Ludwig Wiese) এইজন্য পাঠ্যবিষয়ের চাপ কমাতে গিয়ে 'হরিষে বিষাদ' ঘটালেন। ১৮৮২-তেও ঐ একই ব্যাপার। সব যেন, 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।' আসল কথা, সাধ্য ছিল কিন্তু সাধের সঙ্গে সাধ্যের মিল ছিল না। এঁরা কি করেছিলেন? জিমনাসিয়ামে লাতিনের সময় কমিয়ে দিয়ে, সাধারণবিষয়ের ঘণ্টা বাড়িয়ে দিলেন; রিয়াল-জিমনাসিয়ামে প্রাচীন ভাষার সময় বাড়িয়ে সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সময় কমিয়ে দেওয়া হ'ল। বিচিত্র রকমের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৮৯২ সালে এর একটা সুরাহা হল। রাইস্-স্কুল-কনফারেন্সে স্থির হ'ল—গ্রামার ইস্কুলে ১৬ ঘণ্টা পড়ানোর সময় হবে। লাতিন পড়ানো কমিয়ে জার্মানী ভাষার ঘণ্টা বাড়াতে হবে; শারীরিক চর্চা বাড়াতে হবে। তবে সার্টিফিকেট নিতে হলে, লাতিনে একটি রচনা লিখতে হবেই; কিন্তু যারা জার্মানী সাহিত্য এবং রচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই এই

সার্টিফিকেটের অধিকারী। এমনি ক'রে জার্মানের মাতৃভাষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থান ক'রে নিল।

মাধ্যমিক স্তরে যে-সব ইস্কুল থাকল তার একটা পরিচয় দেওয়া যাক।

রিয়াল জিম্‌নাসিয়াম (Realgymnasium) :

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'রিয়ালস্থ্যলে' থেকে এই ইস্কুলের উদ্ভব। এখানে আধুনিক বিষয় এবং কিছুটা প্রাচীন ভাষা পড়ানো হয়। এই বিভাগে তিন ধরণের ইস্কুল ছিল; জিম্‌নাসিয়াম, রিয়াল জিমনাসিয়াম এবং ওবার-রিয়ালস্থ্যলে (Ober-real-schule); রাইস-স্কুল-কনফারেন্স এবং জজী বিভাগ এই তিনটি ইস্কুলের পাস করা ছাত্রদের সমান মর্যাদা দাবী ক'রে নিলেন।

ব্যবসাবাণিজ্যিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে ওবার-রিয়ালস্থ্যলের (Ober-real schule) উদ্ভব। এখানে গ্রীক-লাতিন পড়ানো হত না; আধুনিক ভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়ানো হ'ত। এরও জন্ম সাল ১৮৮২। যাই হোক তিনটি ইস্কুলের যে-কোনটি থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারা যেত। পুরোহিত সম্প্রদায় জিমনাসিয়ামের লেখাপড়াই পছন্দ করতেন বেশী।

কিন্তু এখনও আইন বা চিকিৎসাবিজ্ঞান অথবা ভাষাবিজ্ঞান পড়তে হ'লে লাতিন গ্রীক জানতে হ'ত। কাজেই জিমনাসিয়ামে এবং রিয়াল-জিমনাসিয়ামে লাতিন অথবা গ্রীকের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

হ'লে হবে কি, সমাজের চাহিদা কিন্তু জিমনাসিয়ামের পড়া। যেমন বিলাতের পাবলিক-ইস্কুলের মর্যাদা—এখানেও তেমনি জিমনাসিয়ামের। বড় বড় রাজকার্য কিন্তু জিমনাসিয়ামের ছাত্রেরা পেত। কাজেই বেশী ছাত্র এখানেই আসত। অথচ এখানকার পড়াশুনার পদ্ধতিতে ছেলেরা কাল্পনিক-শক্তি বিকাশের সুযোগ পেতনা, জীবনযাত্রার বাস্তবদিকের সঙ্গে মিলও ছিল না। কিন্তু একটা সুবিধা ছিল, আগন্তুক সমাজবাদকে কিছুটা এই ইস্কুল ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

কাজেই আরজি এল, শিক্ষার আইন সংস্কার করতে হবে। আইন সংস্কার

করা হ'ল যে, ছেলেদের অভিভাবকের বেতনের হার দেখে ছাত্রদের ভর্তি না ক'রে,তাদের সামর্থ্য দেখে ভর্তি করা হবে। ১৯১৯ এর দিকে এই আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। আরও কিছু পরিবর্তন করা হ'ল—যার ফলে গরীব ছাত্রদের মাইনা-পত্তর আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য থাকবেন;

কিন্তু তা-ও সব রাজ্য মানতে পারল না। একমাত্র থুরিঙ্গিয়া (Thuringia)-তে কিছুটা কাজ দেখা গেল। ১৯২২২-এ 'এইন হেইট স্যুলে' ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হ'ল।

প্রুশিয়াতে মাধ্যমিক ইস্কুলের এবং এইন-হেইট-স্যুলে-র পাঠ্যসূচীতে ঐক্য আনতে চেষ্টা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। জিমনাসিয়ামের লাতিন পড়ানোর সময় কমিয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুরকমের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। (১) ডয়েস্‌সে ওবারস্যুলে (Deutsche Oberschule) এবং (২) অউফবাউ-স্যুলে (Aufbau Schule).

ডয়েস্‌-সে ওবারস্যুলে :

প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর জার্মানেরা আবার নিজেদের দেশের ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই ইস্কুলকেই তখন এরা জার্মান ইস্কুল বলত। ১৯২০এর রাইশ কনফারেন্সেও এই নীতি মান্য করবার দিকে প্রস্তাব ঝুঁকে পড়ে। এমন ইস্কুল চাই যেখান থেকে পাস করে বেরিয়ে প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষকও হওয়া যায়। কারণ ক্রমেই লেখাপড়ার দিকে দেশবাসী ঝুঁকে পড়েছে—অথচ প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষক প্রাথমিক ইস্কুল থেকেই পাস করা। কাজেই লাতিন-গ্রীক বর্জন ক'রে জার্মান, ইতিহাস এবং ভূগোল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই ইস্কুল মাধ্যমিক স্তরে এসে ঢুকল।

আউফ-বাউ স্যুলে :

এটিও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু গ্রামের জন্য। অন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এর পাঠ্যসূচীর কাল কম। সাধারণত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসতে হয় ১০ বছর বয়সে, এখানে আসতে পারবে ১২ বছর বয়সেও। অন্য মাধ্যমিক

ইস্কুলের পড়ার সময় ৯ বছর ধরে—এখানে ৬ বছর। এই রকম গ্রামের ইস্কুল স্থাপনার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি হচ্ছে, অল্প বয়স থেকেই পরিবেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র পড়তে আসায় তাদের চিত্তের যে পরিবর্তন ঘটে যায়—তাকে খুব সুস্থ বলা যায় না। কাজেই যতদূর সম্ভব তাদেরকে পরিবেশের মধ্যে রেখেই পড়ানো উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রামকে তারা সংস্কৃতি এবং দেশীয় সম্পদের উৎস মনে করত। কাজেই গ্রামকে ধ্বংস তারা করতে চায় নি।

কিন্তু এত ইস্কুল থাকলে অভিভাবকদের বিপদও তো বটে। নানা কারণে বিশেষ ক'রে চাকরী-বাকরী ক্ষেত্রে স্থানত্যাগ করতে হ'লে—ছেলেদের অন্য ইস্কুলের সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ্যসূচীর মধ্যে ফেলে দেওয়া রীতিমত আশঙ্কার কথা। হিটলারের সময় এই স্থানান্তরে যাওয়ার হিড়িক এবং প্রয়োজন কর্মচারীদের তো আরও বেড়ে গেল। কাজেই এই সময় 'এক-ধরণের ইস্কুল চালানো হোক ব'লে' আন্দোলন সুরু হয়। একটা ব্যবস্থা হ'ল আইন-হাইট স্যুলের মাধ্যমে।

১৯৩৮ সালে এই বিন্যাসকরণের দিকে মন দেওয়া হয়। তিন রকমের মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকল মাত্র—ডয়েস-সে ওবারস্যুলে, আউফবাউ স্যুলে আর কিছু সংখ্যক Gymnasium. এদের মধ্যে প্রথমটিতেই ছাত্রসংখ্যা বেশী হ'ল।

১৯৩৭এ পাঠ্যসূচী কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কসরতী বা শারীরিক চর্চার ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। 'জাতি-জাতি-জাতীয়তা'—এই ছিল ছাত্রদের কাছে চরিত্র হিসাবে চাহিদা।

কাজেই তারা ইস্কুলের বিন্যাসকরণে ক্ষান্তি না দিয়ে আবাসিক বিদ্যালয়, একেবারে বিলাতের পাবলিক ইস্কুল ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মন দিল। এই রকম এক ধরণের ইস্কুলের নাম সংক্ষেপে NPEA (National Political Educational Institutions) অর্থাৎ জাতির রাজনৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে শৃঙ্খলাবোধ বড় কঠিন; একেবারে সৈন্যদলের মতো; পাঠ্যসূচী অনেকটা ডয়েস-সে ওবারস্যুলের মতো—তবে কিছু কিছু রাজনীতি (হয়ত বা আর্যামি) শিখতে হত।

তাছাড়া হ'ল এ্যাডলফ হিটলার ইস্কুল। রাজনৈতিক দল একে নিয়ন্ত্রিত করত। বিনাবেতনে পড়া, ১২ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পাঠ্যকাল নির্ধারিত ছিল। তা ছাড়া ছিল রাইশ-ইস্কুল ; ঐ একই নিয়মের।

কিন্তু হিটলারের আমলের আবাসিক বিদ্যালয়ের এখানেই উপসংহার নয়। আরও থাকল –জার্মান স্টেট বোর্ডিং ইস্কুল। ১৯৪১ সালে এর প্রবর্তন। যুদ্ধের দরুণ যাদের গৃহজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল, তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই সব ইস্কুল। কৃষক বা কারিগর শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও ভর্তি হ'তে পেত ; যারা দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করল—তাদের ছেলেমেয়েরাও এখানে পড়তে পারে।

এ ছাড়া নাম করতে হয়—লাইপজিগ আর ফ্রাঙ্কফোর্ট-মেইনের সঙ্গীত-বিদ্যালয়, মুজিসে জিমনাসিয়াম (Musische Gymnasien) ; যাদের ছেলেমেয়ে সঙ্গীতে এবং অন্যান্য সুকুমার কলায়, অত্যন্ত নিপুণ তারাই এখানে ভর্তি হ'ত।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের কোন ইস্কুল ছিল না। ঐ একটা ইস্কুল ছিল (Hohere Tochter Schulen) কিন্তু সেও তো অনেকটা দুয়ের মাঝামাঝি, ঠিক মাধ্যমিক স্তরের নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিয়ে নারী-আন্দোলন সুরু হ'ল। ১৯০৮ থেকে তাদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়েয় ব্যবস্থা হয়। জার্মানীর শিক্ষা অধিকর্তাদের ধারণা ছিল মেয়েরা শিক্ষা পেলে তাদের নারীত্বের ক্ষতি হবে।

এদের জন্য লিজিয়াম (Lyzeum) ব'লে ইস্কুল খোলা হ'ল : সাতটি শ্রেণী, ১০ বছর বয়স থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত পড়বার সময়। আরও বেশী যারা পড়তে চায় তাদের জন্য (২-৩ বছর বেশী) আরও দুধরণের ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হ'ল। এদের বলা হ'ত Oberlyzeum. এখান থেকে পাস করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকই মেয়েদের পড়াতে রাজী ছিল না। ব্যাডেন বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ক'রে দিল ; কিন্তু প্রুশিয়া বহুদিন ঘাড় বাঁকা ক'রে ছিল। তারপর ১৯১৮ সালে যখন মেয়েদের ভোটাধিকার এল তখন তাদের শিক্ষার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে পড়ে।

১৯২৩ সালে এই সব ইস্কুলের কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। হিটলার এই ইস্কুল ব্যবস্থা অনেকটা সরল ক'রে ছেলেদের মতো ক'রে দিলেন।

জার্মানীর ইতিহাস থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত একটা দিক বেশ লক্ষ্য করবার মতো। নানা অবস্থা বিপর্যয়ে জার্মান-রা শিক্ষাকে জাতিগঠনের বিশেষ উপকরণ ব'লে মনে করতে পেরেছিল। হিটলারও সেকথা বিশ্বাস করতেন; এত কাজের মধ্যেও তিনি শিক্ষার নানাদিক দিয়ে ভেবেছেন। যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালেও সকল ছেলেমেযের, সকল রকম অসুবিধা দূর করবার জন্য তিনি উদার ভাবে শিক্ষা বিভাগকে সাহায্য করেছেন—কোথায়ও কার্পণ্য করেন নি। হয়ত এর মধ্য দিয়ে তিনি জঙ্গী-সভ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর মতবাদের সহায়ক মনে করেছিলেন ইস্কুলকে, কিন্তু কখনও 'আমার বড় সাধের প্ল্যান ভেস্তে যাবে' বলে চিৎকার করেন নি।

জার্মান-বিপ্লব প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলা দরকার, অবশ্য শিক্ষা প্রসঙ্গে। কারণ, এর মধ্য থেকে আমরা শিক্ষা-অঞ্চল নিয়ে দলগত স্বার্থের কথা কতকটা বুঝতে পারব।

আমরা জানি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দেও জার্মানীতে প্রায় ৩০০ রাজ্য ছিল। যখন জার্মান-ইউনিয়ন গঠিত হয় (১৮১৫-৬৬) তখন রাজ্যসংখ্যা কমে ৩৯এ দাঁড়ায়। ১৮৭১এ জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হ'লে রাজ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬। ১৯১৮ সালে জার্মান-বিপ্লব সংগঠিত হয়। কিন্তু ফেডাবেল-গঠনকে তারা খুব পরিবর্তন করেনি। ১৯১৯ সালের ১১ই আগস্ট সংবিধান রচনা করে জার্মান সাম্রাজ্য 'রিপাবলিক' নাম গ্রহণ করে। 'রাইশস্টাগ' জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হল; কোন রকম 'আপার' 'লোয়াব' হাউস ছিল না। এই রাইশ-স্টাগের অথবা রিপাবলিকের যিনি 'প্রেসিডেণ্ট' তিনিও জনসাধারণ কর্তৃক সোজাসুজি নির্বাচিত হতেন। 'রাইশস্টাগ' আইন প্রণয়ন করত, আর সেই আইনকে কার্যে পরিণত করত 'রাইশস্‌রাট'। এই রাইশস্টাগের মধ্যে প্রায় ৪৬৯ জন বিভিন্ন দলের সভ্য ছিলেন। সবারই যে মতবাদ এক রকমের তা কিন্তু নয়, কেউ নরম পন্থী, কেউ রক্ষণশীল, কেউ চরমপন্থী। যেহেতু জার্মানরা ঐতিহ্যকে বড় বেশী শ্রদ্ধা করে সেইজন্য নানা চেষ্টায়ও ইস্কুল থেকে

ধর্মের প্রভাব উঠানো গেল না। কাজেই ঝগড়া বাধল—একদিকে জার্মান ন্যাসনালিস্ট পার্টি এবং ক্যাথলিক—অন্যদিকে সোস্যালিস্টেরা। সোস্যা-লিস্টরা চান ইস্কুলে ধর্মশিক্ষা বর্জন করতে হবে; কিন্তু সংখ্যাধিক্যে পারা গেল না ব'লে তাঁরা পাল্টা প্রস্তাব দিলেন—ছু রকমের ইস্কুলই থাকুক। প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু স্থির হ'ল না বটে, তবে বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষায় কিছু স্বাধীনতা এল, আর ১৪৩ ধারায় শিক্ষকের অধিকার এবং কর্তব্য রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সমান ক'রে দেওয়া হল। ১৪৪এর ধারায়—ইস্কুলকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হ'ল। এই ছুই উপায়ে ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব থেকে শিক্ষক এবং ইস্কুলকে বের ক'রে আনা গেল বটে। তা ছাড়া আইন করা হ'ল, আবশ্যিক পড়া হবে ৮ বছর ধরে প্রথমত, তারপর অব্যাহত ইস্কুলের পড়া; কতদিন? না, আঠারো বছর বয়স পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত। এই সমস্ত ইস্কুলেরই পড়ানো এবং পড়ার সরঞ্জাম বিনাখরচায় ছাত্রদের দিতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ প্রাথমিক ইস্কুলের নাম তো 'গ্রুণ্ড স্কুলে' রাখা হ'ল।

প্রথম নির্বাচনে সোস্যালিস্টদের একক দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাই তাদের প্রস্তাব 'এক কর্ম-পরিকল্পনা শিক্ষার দিক দিয়ে' অনেকটা সাফল্য আনতে পেরেছিল; কিন্তু তারপর থেকেই এদের প্রভাব দেশে কমে যায়। দ্বিতীয় নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা দলে ভারী হয়ে পড়ল। এবার 'সেণ্টার' দলের সঙ্গে সোস্যালিস্টরা হাত না মেলালে প্রভাবশালী হ'তে পারছে না; 'সেণ্টার' দলের মধ্যে আবার ছুটো ভাগ, এক ভাগ ধনী সম্প্রদায় থেকে অন্য ভাগ দরিদ্র সম্প্রদায় থেকে এসেছে। কাজেই 'সেণ্টার' দলের মধ্যেই ভাঙনের খেলা আছে।

সোস্যালিস্টরা ছুটো দিক কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল—দেশের অর্থ নৈতিক দিক আর শিক্ষার দিক। আর ক্যাথলিকেরা শিক্ষাকে হাত করতে চায় প্রথমে। কাজেই সোস্যালিস্টদের কোন্‌টি ত্যাগ করতে হবে? তারা মনে করল, আর্থিক নীতিকে যদি তারা প্রভাবিত করতে পারে—তবে দেশের আর সব দিক ঠিক করা যাবে। তারা মনে করত, দেশের অর্থ-নীতি থেকেই সব কিছু জন্ম নেয়। এমন ক'রে প্রথমে সোস্যালিস্টদের হাত থেকে শিক্ষা-

রাজ্য চলে গেল, আর তারপর অর্থরাজ্যও যে কেমন ক'রে চলে গেল যার ফলে ন্যাসন্যাল সোস্যাল পার্টি ধীরে ধীরে (বলতে হয় এক লাফে) এগিয়ে এল তা জার্মানীর ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানতে পারবেন। পরিণামে দেখা যায়, রিপাবলিকের সময়ে শিক্ষা-ধারা যেটুকু এগোতে পারার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল—তা সফল হ'তে পারল না দলগত স্বার্থের আভিজাত্যে।

সে থাক, তবু বলতে হয়—এই যুগে নানাদিক দিয়ে ইস্কুলকে চালিত করবার একটা স্পৃহা দেখা যায়। প্রুশিয়াতে পরীক্ষামূলক ইস্কুল স্থাপন করবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়; তার মধ্যে নাম করতে হয়—শ্রম-ইস্কুল (Arbeits schule—Schools of Manual labour) সমাজ ইস্কুল (Schulge Mienden—Community Schools), মেধাবীদের ইস্কুল (Begabten Schulen), মুক্তপ্রাঙ্গণ ইস্কুল (Waldschulen)—ইত্যাদি। কিন্তু অর্থসমস্যার জন্য এসব ইস্কুল এগোতে পারল না।

পরীক্ষা-মূলক ইস্কুল সমূহের মধ্যে কয়েকটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার: জীবন-রূপায়নের ইস্কুল (Life School), কর্ম-প্রধান ইস্কুল (Work School).

শিক্ষা-জগতের সমস্যা এখানে দুটি; একটি নতুন আবহাওয়া—শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-প্রসার মানুষের জীবনের মানকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে; অন্যটি—শিক্ষা বেপরোয়া ভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চলছে। কাজেই যত কিছু নতুন শিক্ষা-নীতি আছে তাকে পরীক্ষা করা দরকার—কোন্‌টি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এইজন্যই পরীক্ষামূলক ইস্কুলের (Versuchs-schulen) প্রবর্তন।

জীবন-রূপায়নের ইস্কুল: আরবেইটস্যুলে

এর মধ্যে কাজকর্মের শিক্ষানবিশী ইস্কুলের (Arbeitsschule) প্রথমে নাম করতে হয়। এই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা মনে করতেন যে কেবলমাত্র শ্রেণী বা শ্রেণী পড়ানোতেই জীবন রূপায়ন চলবে না, ইস্কুল নিজেই যে জীবনের প্রতিচ্ছবি সেকথা মনে রাখতে হবে। কিন্তু এই ইস্কুলের সঙ্গে অব্যাহত ইস্কুলের

চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানেও অবশ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ছাত্রদের পড়ানো হ'ত। অব্যাহত ইস্কুল হচ্ছে শিল্পকারখানার সঙ্গে যুক্ত, আর এখানে সাধারণ ইস্কুলের সঙ্গে কাজ যুক্ত করা; প্রথমটি হচ্ছে ছাত্রদের শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা, এখানে কর্ম-কে প্রধান ক'রে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা। এখানে কোন বাঁধাধরা কার্যতালিকা ছিল না, শিক্ষার্থীরা এখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে পাঠ্যসূচী তৈরী করত। স্বেচ্ছা-কর্ম এবং মুক্ত-মন ছাত্রদের মধ্যে যা আছে তাকেই উদ্দীপ্ত ক'রে শিক্ষাদান চলত এখানে। জীবনের সঙ্গে তাদের কি ভাবে যোগ করা হ'ত? তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ত বনে, পাহাড়ে, সহরের কর্মব্যস্ততায়, ফ্যাক্টরীতে, রেলওয়েতে, লাইব্রেরীতে, যাদুঘরে। সেখানে তারা দেখুক, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। এর সঙ্গে অভিভাবকেরা এত জড়িত হয়ে পড়তেন—এত সহযোগ করতেন যে—সত্যিই এই সব ইস্কুল সমাজে একটি প্রেরণার সঞ্চার করল।

এর জন্য শিক্ষকদের জানতে হ'ত—ছাত্রদের মন, মনোবিজ্ঞান পড়তে হ'ত—আর জানতে হত ছাত্রদের পরিবেশ। এমনি ক'রে দেখা গেল, শৃঙ্খলা সম্পর্কে কোন কিছু ভাববার নেই, ইস্কুলের লেখাপড়ায়ও তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

কর্মপ্রধান ইস্কুল (Work School):

কর্ম-প্রধান কথাটি নিয়ে জার্মানীতেও অনেক আলোড়ন হয়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করতেন 'কর্ম' বলতে শারীরিক পরিশ্রম বোঝায়, কেউ কেউ বলতেন—মানসিক ক্রিয়ার একটা ধরণকেই বোঝায়। ১৯২০-তে জার্মানীর শিক্ষাবিদেরা কর্ম বলতে এই দুটি অর্থকেই ধরে নিলেন; অর্থাৎ কর্ম-প্রধান ইস্কুলে এই দুটি দিকই থাকবে। প্রথম অর্থ হচ্ছে কর্মের বস্তু হিসাবে। মিউনিকের কের্সেনস্টাইনার প্রথম অর্থটিকেই মানতেন, আর লাইপজিগের গানডিগ (Gandig) দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু কি করে ইস্কুলে কর্মের মাধ্যমে পড়ানো হবে? সেই তো কথা! আচ্ছা বাগান করো; বিজ্ঞানের মডেল তৈরী করো। আরো পরিবর্তন ক'রে

বলা হ'ল, ছেলেদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ক'রে দাও। আসল কথা, শিক্ষকের বক্তৃতা আর তাকে ছাত্রকর্তৃক উদ্গীরণ তাঁরা পছন্দ করলেন না, ব্যস। হুঁ, এই কার্যক্রমে 'ভ্রমণ' থাকবে কিন্তু।

যেহেতু কেসে´নস্টাইনার (Kerschensteiner) এই ধরণের ইস্কুলের প্রধান কর্মী সেইজন্য তাঁর ইস্কুল সম্পর্কেই সন্ধান নেওয়া যাক;

১৯১০ সালে কেসে´নস্টাইনার কর্মপ্রধান ইস্কুলকে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ তাঁর সঙ্কল্প বেশী দূর অগ্রসর হ'ল না।

তারপর আবার এই ইস্কুলের কাজ চলতে সুরু করল। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও এই ইস্কুলকে সুনজরে দেখলেন, তার কারণ অবশ্য অন্য। ছেলেদের সম্পর্কে প্রীতির ভাব নিয়ে এগিয়ে আসা-ই এই ইস্কুলের শিক্ষকের প্রধান গুণ। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থাকা এই ইস্কুলের অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজীয় ক'রে তুলতে হবে।

এই ইস্কুলের পাঠ্যসূচী আছে, দৈনন্দিন কর্ম-তালিকা আছে। প্রথম বছরে আছে—গান, ধর্ম, শরীরিক চর্চা, অঙ্ক শিক্ষা, এবং পর্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন করা; তার পরের তিন বছরে—কাঠের কাজ, সেলাই, হাতের কাজ—এদের আবার স্তর-ভেদ আছে। ছেলেদের নিজদের স্বাধীন মত অনুসারে এসব কাজ করতে দিতে হবে। এমনি ক'রে ইস্কুল ছাত্রদের চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে। কাজের মধ্য দিয়ে নৈতিক-চরিত্র গঠন কেসে´নস্টাইনারের একটা বড় উদ্দেশ্য। কাণ্টের দার্শনিকতা এবং ফিকটের জাতীয়তা দুটিকেই পূর্ণ ক'রে তুলতে কেসে´নস্টাইনার একান্ত ক'রে চেয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে কম্যুনিটি বা সামাজিক জীবন সম্পর্কে ছাত্রদের পরিচয় করানোর জন্য আলোচনার অবসরও রেখেছিলেন। এইখানেই বোধহয় ডিউয়ির মতবাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। ডিউয়ি কোন প্রকার বাইরের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি; তিনি চেয়েছিলেন এসব অন্তরের বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হ'বে; বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে তাদের মনের পক্ষে নতুন উপকরণ সংযোজনা করা ঠিক নয়। তাছাড়া ঐ জাতীয়তাবোধ

নিয়েও ডিউয়িির আপত্তি; ব্যক্তিত্ব গঠন অনেকটা দেশ কালকে পার হ'য়ে যায়; জাতীয়তা তাকে খর্ব করে।

এই বিভাগে আর এক ধরণের ইস্কুলের নাম করতে হয়—তার যোগ ছিল দেশের অর্থ নৈতিক দিকের সঙ্গে; একে বলা হ'ত Production School বা উৎপাদনমূলক কর্ম-প্রধান ইস্কুল। এদের মধ্যে উত্থান-সৃষ্টির ইস্কুলগুলো জার্মানীতে বেশ সাড়া এনেছিল; কারণ এতে বয়স্ক ব্যক্তি, অভিভাবক, সবাই উৎসাহ পেতেন।

এরই সঙ্গে নাম করতে হয় হাম্বুর্গের কর্মপ্রধান সামাজিক ইস্কুল (Community School) এখানে ছেলেদের যেমন কাজ আছে তেমনি মুক্তিও আছে। ধরতে গেলে হাম্বুর্গের শ্রমিকসঙ্ঘই এর প্রধান উদ্যোক্তা; এদের নায়ক ছিলেন হেইনরিশ ভোলগাস্ট (Heinrich Wolgast)। এঁরা মনে করতেন—ইস্কুল পড়ানোর যায়গা নয়, এখানে ছেলেমেয়ে সমাজের ধারার সঙ্গে পরিচিত হবে; তাদেরই সমিতি গোছের, কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ইস্কুলে থাকবে না, কোন ধর্ম নয়, কোন রাজনৈতিক দলের ভেদাভেদ নয়; ছেলেদের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার নানা উপকরণ ইস্কুল যোগাড় করে দেবে; পরীক্ষা থাকবে না, বৃত্তি বা কাজের ধরণ থাকবে না; শিক্ষার্থী এখানে এসে পরিদর্শন করবে, সৃষ্টি করবে, নিজকে নানা ভাবে প্রকাশ করবে; প্রক্ষোভ বা মানসিক ভাববিকাশকে বৃদ্ধি করাই এই ইস্কুলের উদ্দেশ্য, বুদ্ধি বা চিন্তাকে নয়। প্রদর্শনী ক'রে, প্রবন্ধ আলোচনা ক'রে, গল্প সংগ্রহ করে, অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, নানা ভাবে তারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করত।

যাই হোক জীবনরূপায়ণ এবং কর্মপ্রধান ইস্কুল সমূহের উদ্দেশ্য দেখে আমরা বুঝতে পারছি, জার্মানীতে শিক্ষাব্রতীরা ইস্কুলের কঠোর নিয়ম কানুন আর মতবাদের সঙ্ঘর্ষকে শিক্ষার অনুকূল মনে করেন নি। এই শিক্ষার কঠোর নিয়মের আর গৃহবদ্ধ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি বিচিত্রধারায় শিক্ষাআন্দোলন ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই সুরু হ'তে দেখা যায়।

এদের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দলের নাম করতে হয়; যেমন ডি হ্বাণ্ডার ফোগেল (Die Wandervogel) এবং হ্বাণ্ডারটাগ (Wandertag)।

হ্বাণ্ডার ফোগেল (Wander Birds):

প্রথমত এরা ইস্কুলের কঠোর নিয়ম থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষার দিকগুলোকে সফল করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে এর রূপ বেশ রমণীয় হ'য়ে উঠল। রাত্রিতে এরা বেরোত ; মশাল জ্বালিয়ে এরা চলত, প্রাচীন লোকগাথা গেয়ে গেয়ে এদের ভ্রমণপর্ব। হাজর হাজার বছর পূর্বে জার্মাণেরা অরণ্যবাস যেভাবে করত—তারই প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা ছিল এদের উদ্দেশ্য। কিন্তু জার্মানীর মাটিতে কোন কিছুই জাতীয়তা বর্জিত থাকে না ; কাজেই এর মধ্যে সেটি সংক্রমিত হ'ল। কিছুদিন ইস্কুল কর্তৃপক্ষ বাধা দিলেন—কিন্তু 'এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে' ? কাজেই শেষকালে শিক্ষকেরাও এসে যোগ দিলেন। এমনি ক'রে যুব-উৎসবের সূচনা হ'ল। উদ্দেশ্য কি ? সমাজসংস্কার এবং আত্ম-শিক্ষার পথে সমগ্র তরুণ-তরুণীকে চালিত করা। এই আন্দোলনের ফলেই ইস্কুলেও ছাত্রছাত্রীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। পথে-পথে এইসব তরুণ-তরুণী যখন এক রকমের পোষাক পরে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে বেড়াত তখন সমস্ত গ্রাম নগর যেন আনন্দে মগ্ন হ'য়ে যেত। জানি, তরুণ-তরুণীর এই অবাধ মেলামেশার শিক্ষার কথা শুনে অনগ্রসর দেশের অনেকেরই অস্বস্তি দেখা দেবে। হয়ত সে অস্বস্তি অভিনয়ের কারুকার্য নয়, অন্তরের নৈতিক-বোধ থেকেই জাত। কিন্তু তাঁদের আশ্বস্ত ক'রে বলা যায়—ঘাবড়াবার কিছু নেই ; ঐ জঙ্গী-সভ্যতার দেশেও তরুণ-তরুণীদের এই অবাধ শিক্ষা-ক্রীড়ার দরুণ কোন রকমেরই নৈতিক স্খলন দেখা যায় নি। বরং মদব্যবসায়ী আর সিগারেট কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়েছিল, কারণ তারা ঐ দুটির বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন করেছিল যে, বড়দের সমাজেও মাদক আর ধূমপান বিরোধীর দল বেড়ে গেল। দেশের অর্থনৈতিক দিক কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অবশ্য জানা নেই। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ মেলা-মেশা শেষ পর্য্যন্ত সুফলপ্রসূই হয়েছে।

এদের কার্য-পরিক্রমা থেকেই ইস্কুলের ব্যবস্থায় এল গ্রীষ্মাবকাশের মেলা-মেশা (Summer Camps)।

ভ্যাণ্ডারটাগ্ (Wandertag):

প্রথমে জার্মান সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন ; কারণ সৈন্য বাহিনীতে লোক কম পড়ে যাচ্ছিল। অতএব ইস্কুলের বড় বড় ছেলেদের একটা দিন স্থির করে বাইরে নিয়ে এসে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ত। একটা বিশেষ দিন স্থির করা ছিল এইজন্য।

কিন্তু রিপাবলিক হওয়ার পর এর চরিত্র বদলে যায়। ঐ দিনটা ছুটির দিন ক'রে দেওয়া হ'ল ; ছেলেরা সেদিন ইস্কুল থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়বে ভ্রমণের নেশায় ; যেখানে ইচ্ছা ঘুরে আসুক। এর জন্য ছেলেদের খরচ ছেলেরাই বহন করত, তবে যারা দরিদ্র তাদের জন্য একটা ফাণ্ড বা ভাণ্ডার করা হ'ত। এমনি বেড়াতে বেড়াতে তারা গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতির সম্পর্কে বহু সংবাদ সংগ্রহ করত। অর্থাৎ এই দিন বই ফেলে এসে তারা প্রকৃতির মধ্য থেকে তাদের জ্ঞাতব্য জেনে নিত। মাসের মধ্যে একটা দিন তাদের এমনি ছুটির পড়ার-দিন নির্ধারিত থাকত। এখানেও কিন্তু মাদকতা-বিরোধী মনোভাব গঠিত হয়ে উঠেছিল।

জার্মানীর ইস্কুল, কেবল জার্মানীরই বা কেন, ইয়োরোপ-আমেরিকার ইস্কুলগুলোতে যে তিনজন শিক্ষাব্রতীর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। এঁদের নাম, পেস্তালৎজী, ফ্রোয়েবেল এবং হার্বার্ট। ফ্রোয়েবেল ও হার্বার্ট-কে বলা যায় পেস্তালৎজীর মন্ত্রশিষ্য। অবশ্য পেস্তালৎজীর গুরুর সন্ধানও করা যায় ; পেস্তালৎজী প্রভাবিত হয়েছিলেন অনেকটা রুশোর চিন্তাধারায়।

পেস্তালৎজী:

ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে স্যুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখে জন্মগ্রহণ করেন ; দেহান্তর হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল, অনুষ্ঠিত হ'ল অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। দু'টো কারণের জন্যই বোধহয় প্রক্ষোভ আর ভাবাবেগে তাঁর জীবন আর চিন্তা পরিচালিত হ'ত ; গভীর চিন্তা আর যুক্তিবাদ তাঁর মনে উৎসাহ পেত না। একটা গল্প আছে, ছোটবেলা মিঠাই

কিনবার জন্য দোকানে গেছেন, দোকানীর মেয়েটি তাঁকে সদুপদেশ দিল, “যে-সামান্য পয়সা তোমার আছে, ওতে মিঠাই না কিনে ওতেই আরও ভালো জিনিস কিনতে পারতে।” এই মেয়েটিই পরবর্তীকালে তাঁর সহধর্মিনী হ’ল (Anna Schulthess) ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে। এঁর বৈষয়িক জ্ঞান একেবারেই ছিল না; তাঁর চরিত্রের এই দিক সম্পর্কে বলা যায়, পৃথিবীর মনীষীরাও বিপদে তাঁর কাছ থেকে সদুপদেশ নিতে পারে, মানুষকে কি ক’রে ভালোবাসা যায় তার হিসাব নিতে পারে, কিন্তু দেশের কোন রাজাও তাঁকে এক পয়সা দিতে নারাজ, কারণ জানেন—পয়সাটির ঠিক হিসাবমতো ব্যয় করা তাঁর চরিত্রে নেই। পেস্তালৎজীর মধ্যে একটি মমতাময়ী মহীয়সী মাতৃমূর্তি দেখা যেত। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণই দরিদ্রদের ব্যথিতদের প্রতি গভীর প্রীতি। কিন্তু প্রতিদানে তাদের কাছ থেকেও তিনি প্রবঞ্চনা পেয়ে গেছেন। যে সব ভিখিরী ছেলেকে সংগ্রহ ক’রে তিনি নিউহোফ্ (Neuhuf) এর শিক্ষায়তনে ভর্তি করলেন, তারাই তাঁর কাছ থেকে কাপড়-চোপড় যোগাড় ক’রে সরে পড়ল ভিক্ষাবৃত্তি করতে। অথচ তাদের প্রতি তাঁর এত করুণা যে, বিরক্ত হয়ে তাল্প গুটোননি তিনি, বরং টাকার পর টাকা ঢেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে ওদেরই দলে যেতে বাধ্য হলেন। বাংলাদেশের কবি মধুসূদনের দারিদ্রে মৃত্যু ঘটবে বলে কেউ বোধহয় তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়নি, কিন্তু পেস্তালৎজীর বন্ধুরা সেদিকে কৃপণতা করেনি; তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নি।

প্রথমত (১৭৬৫-১৭৭৫) তিনি কৃষি ব্যবসায়ে ঝুঁকে পড়লেন, ব্যর্থ হ লেন, ধরলেন আইন ব্যবসায়; সেখানেও ব্যর্থতা। দরিদ্রদের প্রতি মমত্বের জন্যই কিন্তু তিনি এই ব্যবসায় গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়েই তিনি রুশোর প্রভাবে এসে পড়েন। রুশোর কয়েকটি কথা তখন খুব চালু। প্রথম হচ্ছে—‘ইস্কুল থেকে বই সরিয়ে, ছেলেদের প্রকৃতিব সান্নিধ্যে নিয়ে এস।’ দ্বিতীয়—‘সভ্যতা হচ্ছে অভিশাপ আর বর্বরতা হচ্ছে আশীর্বাদ’; তৃতীয়—‘ছেলেদের স্বাস্থ্য পশুর মতো দৃঢ় ক’রে তুলতে হবে’; চতুর্থ—‘সংযম আর নৈতিক শিক্ষা নিন্দার্হ’; পঞ্চম—‘যুক্তির চেয়ে আবেগই হচ্ছে জীবন-যাত্রার বড় উপকরণ’। রুশোর কয়েকটি মতবাদ খুব জোরদার হ’লেও ঐগুলির একটিও শিক্ষাক্ষেত্রে মান্য করা

যায় না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ ক'রে পুস্তক বর্জিত ইস্কুলের কথা একেবারেই অচল। পুস্তক কাকে বলে, তার উদ্দেশ্য কি, গ্রন্থাগার কি, এসব কথা একটু ভাবলেই ঐ মতবাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

পেস্তালৎজী কিন্তু রুশোর সংযম-আর নীতিশিক্ষার সম্পৃক্ত অভিমত গ্রহণ করলেন না। স্বাধীনতা আর নিয়ন্ত্রণ এই দুটির সীমানির্ধারণ ক'রে তিনি দিতে চাইলেন। পেস্তালৎজী ঘোষণা করলেন, "রুশো যে দুটি দিককে একেবারে বিযুক্ত ক'রে ফেলেছেন, সে দুটিকে আমরা মিলিয়ে নেব, তার সমন্বয় সাধন করব।" কিন্তু ঐ প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষারীতিটি তিনি মেনে নিলেন; বইয়ে এইসব না পড়িয়ে ছেলেদের সেইখানেই নিয়ে যেতে হবে। এই জন্যই তাঁর শিক্ষানীতি দাঁড়াল—"শব্দের আগে বস্তু", "মূর্ত বিষয় হবে বিমূর্ত ভাবের আগে।"

যাই হোক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অনাথ-আশ্রমের মতো ক'রে এক ইস্কুল খুললেন নিউহোফ-এ। তা-ও ব্যর্থ হ'ল অনাথদেরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু এখন থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'ল। (১) তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুযায়া পদ্ধতিকে ব্যবহার করা; (২) তাদের পাহাড়ে-বনে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে আনা; তা ছাড়া তাঁর ধারণা হ'ল, (৩) গৃহাঙ্গণই হচ্ছে মানুষের সত্যকার শিক্ষাক্ষেত্র। মায়েরা যাতে শিক্ষা ঠিকমতো ছেলেদের দিতে পারে তার জন্য তিনি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, প্রচার করলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর লিওনার্দ এণ্ড গার্ট্রুড্ নামে পুস্তকটি প্রকাশিত হ'ল। বইটি একটি কৃষক পরিবারের কাল্পনিক কাহিনী বিশেষ। এর মধ্যে সাধারণ জীবনযাত্রার অনেক বিষয়ই তিনি সন্নিবেশ করেছেন, কিন্তু সবার মূলকথা হিসাবে বললেন, শিক্ষাই হচ্ছে যাঁতার খিলের মতো যার চারপাশে অন্য সব কিছু ঘুরছে (Education is the pivot on which everything turns)। এই পুস্তক প্রকাশ করবার পর থেকেই সে-যুগের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটল। খ্যাতি জুটল কিন্তু এখনও সাফল্য এল না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে স্টানজ্ (Stanz) সহরে অনাথদের জন্য আবার ইস্কুল খুললেন। সহরটি ধ্বংসস্তূপের উপর (যুদ্ধের দরুণ), কোন বাড়ীঘর নেই,

সঙ্গীসাথী নেই, পুস্তক নেই—থাকবার মধ্যে আছে ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেরা, অথবা ভিক্ষুক-সন্তান। এইখানেই তাঁর ভাগ্যদেবী একটু মুচকী হাসলেন। এখানে তিনি সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠ শুনতেন; অন্য সময় শারীরিক শ্রমে তাদের নিযুক্ত রাখতেন। পাঠের সময়েও শিশুদের চিত্রাঙ্কন, লেখা এবং কাজের মধ্যে নিযুক্ত থাকতে হ'ত। প্রায় ৮০টি শিশু ছিল এখানে; তাদের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য ধ্বনি-ছন্দ সৃষ্টির সাহায্য নিলেন। পেস্তালৎজীর ভাষায়, পাঠে যে মনের ভাব সৃষ্টি ক'রে তা ধ্বনিসমন্বিত উচ্চারণের মাধ্যমেই বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে (It was found that the rhythmical pronunciation increased the impression produced by the lesson)। পাঠের ছোট ছোট অংশের মধ্যে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন; প্রথম অংশ অভ্যস্ত হ'লে পরের অংশ দেওয়া হ'ত। একযোগেই পড়ানো হ'ত। সমস্ত ছেলেই শিক্ষকের উচ্চারিত শব্দ সরবে আবৃত্তি করত; আবার পারস্পরিক পাঠও ছিল (mutual)। ছেলেরাই ছেলেদের পড়াত (আমাদের দেশে নামতা পড়ানোর মতো)। তারাই সব পরীক্ষানিরীক্ষা করত, তিনি কেবল নির্দেশ দিতেন। সর্দার-পোড়ো প্রথাটি পেস্তালৎজীকে দায়ে পড়েই গ্রহণ করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর আর কোন সহকর্মী তো ছিল না। লেখার সঙ্গে পড়া পাশাপাশি চলত, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ানো হ'ত। ইংল্যাণ্ডের বেল-ল্যাঙ্কাস্টারও তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁদের সর্দার-পোড়ো প্রথাটি এখানেও অনুসৃত হ'তে দেখে বোধহয় খুসীই হ'লেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সর্দার-পোড়ো প্রথাটি মাদ্রাজ থেকে এখানে এসেছিল, না স্টান্‌জ-বার্গডোর্ফ থেকে বেল-ল্যাঙ্কাস্টার প্রথাটি নিয়ে গেলেন। এ বিষয়ে বিতর্কের কোন সুযোগই নেই; কারণ মাদ্রাজ থেকেই যে এ অভিজ্ঞতা বেল-সাহেব নিয়েছিলেন—তার স্বীকৃতি আছে। প্রশ্ন কেবল এইটিই হয়—মাদ্রাজ আর স্টান্‌জ একই রীতি আবিষ্কার করল কি করে? তার উত্তর অনেকটা সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া থেকে পাওয়া যায়, অনেকটা সংস্কৃতির উদ্ভব সূত্র থেকে পাওয়া যায়; সামাজিক পরিবেশ যদি দু দেশের একেবারে সমান হয়

তবে—একই প্রথার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়—একথা সমাজ-তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন (The like workings of men's minds under like conditions)।

যাই হোক, শিক্ষাদান-বিষয়কে অতিক্রম ক'রে তাঁর লক্ষ্য সব সময়ই ছিল যে, কেমন ক'রে শিশুদের মধ্যে নীতিগত আবেগ বা মানসিক অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করা যায়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজের চরিত্র, তাদের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতিই অনেকখানি কার্যকরী ছিল। তারা শৃঙ্খলা আর সৌন্দর্যের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়ে। আর অনাথ বা ভিক্ষুক সম্প্রদায় বলে যেন তাদের চেনাই যায় না। প্রাথমিক শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের যত উন্নতিই হোক, শিক্ষকের কিন্তু কাজের চাপ অত্যধিক বেড়ে যায়, ফলে শিক্ষকের স্বাস্থ্যের দিকে আর নজর থাকল না। আর প্রাথমিক ইস্কুলের (উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে) শিক্ষকের এই 'কাজের চাপে স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা'—আদর্শটিই সারা ইয়োরোপ মেনে নিল; প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষকের এইই হচ্ছে অশুভক্ষণ; আমাদের দেশে বুনো-রামনাথ যে-আদর্শ দেশের সম্মুখে রেখে ভারতীয় শিক্ষককে পর্যুদস্ত ক'রে গেছেন, ঠিক তেমনি। সমাজ যে কেমন ক'রে প্রতিভা-কে অনুমোদন ক'রে তাঁকে সাধারণ ঘর-দোরে আনতে চায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে—তার প্রমাণ এই দুটি আদর্শ-বাদকে নিয়ম ব'লে স্বীকার ক'রে নেওযার মনোবৃত্তি থেকেই পাওয়া যায়। স্টানজের সাফল্যের পর তিনি বার্গডোর্ফে (Burgdorf) ইস্কুল খুললেন। এখানেও তিনি সফলকাম হ'লেন। এখানেই হার্বার্ট (Herbart) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'ন। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে একটা কথা বলা দরকার; তাঁর কাজে কোনরকম প্রাক্‌চিন্তা বা পরিকল্পনা থাকত না; যে-সময়টুকুর মধ্যে তাঁর কাজের ফল পাওয়ার কথা—তার চেয়ে অনেক বেশী সময় তাঁর লেগে যেত। ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম এবং খেয়াল-ই ছিল তাঁর সদিচ্ছার প্রেরণা। এই সময় তিনি বই লিখলেন 'হাউ গারট্রুড্ টীচেস হার চিলড্রেন' (How Gertrude teaches her children); কিছুকাল পর বোঝা গেল (১৮০৫এর দিকে) এখানকার ইস্কুলও টিকবে না। কাজেই তিনি লেক-

নিউস্যাটেলএর দক্ষিণপ্রান্তে ইভার্ড্যুনে (Yverdun) সরে এলেন। এইখানে তাঁর দু'জন সহকর্মীদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। এই সঙ্ঘর্ষের দরুণ তিনি মানসিক অত্যন্ত আঘাত পেলেন। সব আদর্শই কি তাঁর বিপর্যস্ত হয়ে গেল? যে-প্রীতির উপর তাঁর কাজ, সেই প্রীতিই যে অন্তর্হিত হয়ে গেল! জীবনের এই নৈরাশ্য নিয়েই এই অন্তর-শক্তিসম্পন্ন মানুষটিকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করতে হ'ল।

পেস্তালৎজীর শিক্ষাক্ষেত্রে বড় কীর্তি এই যে, তিনি পড়ানোর পদ্ধতিকে একেবারে সহজ ক'রে এনেছিলেন। এমনও বলা যায়, পদ্ধতিকে যান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত করলেন। যে-কোন ব্যক্তিই পড়ানো-শোনানোর কাজে লাগতে পারে, এমনভাবে পদ্ধতিকে রূপ দিলেন। কিন্তু একথা বোধহয় তিনি ভুলে গেলেন, তিনি নিজে সাফল্য অর্জন ক'রেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মে। অথচ শিক্ষকের এই ব্যক্তিগত ধর্ম না থাকলে যে ঠিকভাবে ছাত্রদের তৈরী করা যায় না, তা অন্তত তাঁর লেখাতে পাওয়া গেল না। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিতে পদ্ধতি বড় ছিল না, ছিল শিক্ষকের আন্তরিকতা। অথচ লেখায় তিনি স্ববিরোধী কথাই বললেন। তিনি সোক্রাতিস-পদ্ধতিকে খুব অনুমোদন করেছিলেন। উপরি-উপরি জ্ঞান বা ভাবনাবিহীন বুদ্ধি কোন কাজের নয়, কাজের কথা হ'চ্ছে—সত্য এবং বুদ্ধিকে উৎসারিত করা। তবে সোক্রাতিসের পদ্ধতি, যারা কিছুটা শিখেছে তাদের বেলাতেই খাটানো যায় বলে তাঁর বিশ্বাস। প্রকাশের দিক, ভাষার দিক আয়ত্ত করতে না পারলে এই পদ্ধতিতে তাদের জ্ঞানার্জন করানো যায় না।

তা ছাড়া তাঁর মতে, প্রাথমিক জ্ঞানকে তিন ধারায় চালনা করা উচিত—শব্দ অর্থাৎ ভাষা, প্রতীক বা লেখা এবং আঁকা, আর সংখ্যা বা জোখা। তবে, সবার উপরের কথা হচ্ছে, স্বজ্ঞার (intuition) চর্চা করা। এই স্বজ্ঞাত-শিক্ষণে তিনি ছেলেদের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে ব্যবহার করাতেন, তাদের মনের গতি বৃদ্ধি ক'রে শিক্ষাকে এগিয়ে নিতেন। এইভাবে মূর্ত চিন্তা থেকে তাদের স্বজ্ঞাত-প্রেরণায় বিমূর্ত চিন্তায় পৌছে দিতেন; বর্তমান থেকে অতীতে, নিকট থেকে দূরে তাদের মনকে চালনা করতেন। বার্গডোর্ফের ইস্কুল দেখে

দর্শকেরা তো অবাকই হতেন, এত হাসি—এত খেলা—এত স্ফূর্তি! যেন এরা বলতে চায়,

"এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,—প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥"

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার ইভার্দুন (Yverdun)-এ ইস্কুল স্থাপনা করলেন, একথা আগেই বলেছি; এই ইস্কুলকে অবশ্য প্রাথমিক ইস্কুল বলা যায় না, অনেকটা মাধ্যমিক ইস্কুলের মতো।

পেস্তালৎজীর শিক্ষা-পদ্ধতি সাম্য-রূপ নিতে পারে নি, অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন, অনেকটা যেন অন্ধকারে হাতড়ানো মতো। তবে সব সময়েই সতর্ক। তার কারণ, যুক্তি-অনুসারী তাঁর পদ্ধতি নয়, পদ্ধতি ছিল স্বজ্ঞাত। অনেক আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু নিজের ছাড়া অন্য কারও উপদেশ নেন নি। তার কারণও বোধ হয় আছে। তাঁর ধারণাই ছিল অন্য ব্যক্তি বা সমাজ তাঁকে বুঝতে পারে নি, বুঝতে চায় না। ফরাসী দেশে গিয়ে বোনাপার্টের কাছেই তো তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন; শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন—বোনাপার্ট ভাগিয়ে দিলেন এই বলে, "ও-সব এ, বি, সি নিয়ে ভাবনার চেয়ে তাঁর আরও অনেক কিছু ভাবনার আছে।" তিনি শিক্ষাকে যেভাবে দেখেছিলেন, সমাজের বিধাতারা ততখানি গুরুত্ব দিতে পারেন নি। তাঁর কথাগুলিও যেন সে যুগের পক্ষে বিচিত্র ধরণের:

"স্মৃতি থেকে বুদ্ধির উপর আবেদন ক'রে শিক্ষা দাও। শিশুর বৃদ্ধি ঘটাও, কুকুরকে শিক্ষা দেওয়ার মতো তাকে শিক্ষা দিতে যেও না। ভাষা পড়াতে স্বজ্ঞার উপর নির্ভর কর, বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে এনে ভাষা শেখাও; বিষয়বস্তু বুঝতে পারলেই, প্রকাশভঙ্গী আসবে। ভূগোল পড়াতে আগে স্থানটি দেখাও, তারপর মানচিত্র মডেল ইত্যাদি। পড়বার আগে শিশুকে বলতে শেখাও। লেখার আগে আঁকা।" তবে তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে যত দানই থাকুক একটা অভাবের কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি মননবিদ্যাকে উপেক্ষা করেছিলেন—যেমন কাল্পনিক কাহিনী, বিবরণ, ইতিহাস, সাহিত্য। অথচ

এই সব বিষয়ের সঙ্গেই তো মানুষের নৈতিক চরিত্র বিজড়িত। যে-শিক্ষাবিদ্ এই মননবিদ্যাকে উপেক্ষা করেন—তাঁকে আর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাদাতা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তবু বলতে হয়, তিনিই জার্মানীতে লোকপ্রিয় শিক্ষাকে প্রচলন করেছিলেন; বোনাপার্ট তাঁকে যতই অপমান করুন ফিথ্‌টে কিন্তু বলেছিলেন, "পেস্তালৎজীর এই শিক্ষায়তন থেকেই আমি মনে করি নতুন জার্মানীর উদ্ভব হবে।"

ফ্রোয়েবেল: (জন্ম ১৭৮২ - মৃত্যু ১৮৫২)

ফ্রোয়েবেলের শৈশব পেস্তালৎজীর একেবারে বিপরীত; অর্থাৎ, ফ্রোয়েবেল শৈশবেই মাতৃহারা হলেন—অতএব শিক্ষা তাঁর সুরু হ'ল বাপ-খুড়োর তত্ত্বাবধানে। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বাপ্নিক, ধার্মিক। ইনিও প্রকৃতি-বাদী। তাঁর মতে প্রকৃতিকে ভালো মতো বুঝতে পারলে পাপপুণ্য বোধ জন্মে। কথাটা বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, তবে বোধহয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, প্রকৃতি তো নিরপেক্ষ; নীতিশিক্ষা সে দেয় ব'লে—কবিরা হয়ত বলতে পারেন, কিন্তু সামাজিক মানুষ স্বীকার করবে না; সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ে-অরণ্যে কি ফৌজদারী মামলা হয় না! 'বুঝতে পারা'ই যদি বড় কথা হয়, তবে ব্যক্তির কথা এসে পড়বেই।

পেস্তালৎজীর মতো তিনিও দরিদ্র, চঞ্চল আর অব্যবস্থিত মনের। অনেক কিছু পড়েছেন—আইন, খনিজবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, অঙ্ক। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্টে (Frank fort) তিনি শিক্ষকতা সুরু করলেন। প্রথমত তিনি ছিলেন একেবারেই আনাড়ী, পরে পেস্তালৎজীর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হ'ন; ঐকান্তিক ভক্তি নিয়ে তিনি পেস্তালৎজীর নির্দেশ মানতে সুরু করলেন। পেস্তালৎজীর স্বজ্ঞাত (intuitive) শিক্ষাকেই তিনি অগাধ বিশ্বাসে গ্রহণ করলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পেস্তালৎজীর সাক্ষাৎ সঙ্গ নিতে গেলেন। কিন্তু পেস্তালৎজীর সঙ্গে তাঁর চালচলনে পার্থক্য ছিল। পেস্তালৎজী দেখতেও যেমন কুৎসিত, তেমনি পোষাক আর ব্যবহারেও আনাড়ী; কিন্তু ফ্রোয়েবেল পোষাক-আশাক সম্পর্কে বেশ মনোযোগী ছিলেন। পেস্তালৎজীর মতো ভাগ্যকে তিনি দোষারোপ করতেন না।

সবই ভালো, কিন্তু ১৮১১ সালে তিনি যে ঐ গোলক-সংক্রান্ত বইখানি লিখলেন (Treatise on Sphericity) ওতেই শিক্ষাব্রতীরা স্তব্ধ হয়ে গেল। ফ্রোয়েবেল কি রহস্যবাদী ? কি বলতে চান তিনি ? এ যে একেবারে বল্গা-ছাড়া ঘোড়া ! তিনি বললেন,

"এই গোলক হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব-বস্তুর ঐক্যের প্রতীক। এর মধ্যে দেখ, কোন কোণ নেই, কোন সরলরেখা নেই, কোন তল নেই, কোন পৃষ্ঠদেশ নেই, অথচ এর সবই আছে।" তা ছাড়াও বললেন, "আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এই গোলকের এক রহস্যময় সংস্রব আছে; নৈতিক জীবন পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এই গোলক।" আবার, "বিবেক নিয়ে যদি এই গোলক বস্তুটির সম্ভাবনার বিকাশকে বোঝা যায়—তা হ'লে জীবন বিকাশের শিক্ষাকে বোঝা যাবে।"

বেড়াতে গিয়ে বাগান দেখতে গেলেন, 'কি যেন নেই কি যেন নেই'? পরিশেষে বোঝা গেল, লিলি ফুল নেই। কি ক'রে তাঁর মনটি এই অপূর্ণতা বুঝতে পারল ? না, তাঁব মন অখণ্ড সৌন্দর্যকে চায়। আর লিলি তো শান্ত স্নিগ্ধ অন্তঃকরণের, জীবনের সুসঙ্গতি, আত্মাব পবিত্রতার প্রতীক। তাঁর সৌমনস্য মন তাকেই খুঁজেছিল, কিন্তু পায় নি। এই ভাবেই তিনি বলেন, কাঠের গোলক হচ্ছে গতির প্রতীক, আর ঘনক (cube) হচ্ছে স্থিরতার; তিনি বলেন, "শিশুর চরিত্রে এই গতি আর স্থিরতা এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাব খেলা করে; সে বুঝতে পারে—তার স্বভাব কি, তার গতিপথ কোথায়।" যে মেয়েটি পুতুল খেলা করে সে তার মধ্যে এই গোলক আর ঘনকের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।

রহস্যবাদিতার এই ব্যাপারটি চমৎকার বটে, কিন্তু বিষয়টি যেন শিক্ষা-সম্পর্কে অজ্ঞতার স্তূপ। এইজন্যই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাব্রতীদের শ্রদ্ধা থাকলেও, তাঁর যুক্তিকে অনেকেই অগ্রাহ্য করেন। এইখানেই ফ্রোয়েবেলের ব্যর্থতা। ১৮১৪তে ফ্রোয়েবেল বার্লিনে ফিরে এসে খনিজ-প্রদর্শশালায় কাজ নিলেন; তা ছাড়া জ্যামিতি পড়তে সুরু করলেন। আবার সুরু হ'ল জ্যামিতিক রেখাচিত্র নিয়ে প্রতীকতার ভাবনা। আর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে এইটিই

কাজে লাগালেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি ইস্কুল খুললেন। কেইলহাউ (Keilhau) এর ইস্কুলেই তাঁর সাধনার সুরু। প্রথম ছিল ৫ জনা শিক্ষার্থী। তারপর দশবৎসরে হ'ল পঞ্চাশজন। পেস্তালৎজীর পদ্ধতিই তিনি এখানে প্রয়োগ করেন। শারীরিক, বৌদ্ধিক, এবং নৈতিক এই তিনধারায় এখানে শিক্ষা চলতে থাকল। ১৮২৬-এ তিনি প্রকাশ করলেন, 'দি এডুকেসন অব ম্যান' (The Eduction of Man)। এ পুস্তক পড়ে বোঝা কিছুই যায় না, তবে একটা শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে কিছু যে তিনি বলতে চান—একথা বোঝা যায়। অবশ্য গ্রন্থটিকে মোটামুটি তিনটি বক্তব্যে ভাগ করা যায়—দর্শন, মনোবিদ্যা আর শিক্ষাশাস্ত্র। দর্শনে তিনি বলেছেন—মানুষের সব কিছুই ঈশ্বর থেকে। প্রকৃতিও সেই দৈবীশক্তির প্রকাশ। এই ধারণা থেকেই মনোবিদ্যা বিভাগে বলেন—মানুষের মধ্যে সবই ভালো, কারণ ঈশ্বরই তো তার প্রেরণাদাতা। শিশুরা অল্পবয়স থেকেই ন্যায় এবং সত্যকে গ্রহণ ক'রে থাকে। অতএব শিক্ষাশাস্ত্রে তিনি বলতে বাধ্য হন—শিক্ষা প্রধানত হবে স্বাধীনতা আর স্বতঃস্ফূর্তির ক্ষেত্র। কাজেই শিশুর উপর শিক্ষা না চাপিয়ে তার মনকে বুঝে, সেই মনকে প্রকাশিত হবার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। কাজেই শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শিক্ষার্থীর পক্ষে তিনি মানলেন।

ফ্রোয়েবেল কোন রকম থাপছাড়া শিক্ষার পক্ষপাতী নন; একটি অখণ্ড শিক্ষাকে চাই। কাজেই তিনি রুশোর নির্ধারিত জীবনকে বিভিন্ন বয়সের স্তরে ভাগ করলেন না, তিনি জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে চাইলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'কিণ্ডারগার্টেন' কথাটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর মতে শিশু হচ্ছে চারাগাছ, ইস্কুল হচ্ছে উদ্যান, আর শিক্ষকেরা মালী। কিন্তু শিশুকে কি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়? চারাগাছ কি স্থান বা পরিবেশ বদল করতে পারে? চারাগাছের জীবন-অভিজ্ঞতা কি মানবশিশুর মতো চলিষ্ণু আর পরিবর্তনশীল? মানবশিশুর মতো চারাগাছের কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে? তবে সে কথা ফ্রোয়েবেল বোধহয় ভাবতে পারেন নি। মনীষী হোক আর আনাড়ীই হোক—সবাই নিজের জীবন-পরিবেশ থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান আয়ত্ত করে; ফ্রোয়েবেলের জীবনেও তাই ঘটল। অনেকে বলেন,

কামেনিয়াস থেকেই ফ্রোয়েবেল এই কিণ্ডারগার্টেনের কল্পনা নিয়েছিলেন। তবে কামেনিয়াসের সঙ্গে ফ্রোয়েবেলের স্বাতন্ত্র্য আছে ; কামেনিয়াস মাতাকেই শিশুর ভার দিয়েছিলেন, আর ফ্রোয়েবেল দিলেন শিক্ষককে। কিণ্ডারগার্টেনে তাঁর নির্দেশ থাকল—শিশুকে আবশ্যিকভাবে খেলতে দিতে হবে। আর খেলবে ঐ ফুটবল বা বল—কারণ সেটি গোলক। কাজেই বল হচ্ছে অখণ্ডতার প্রতীক। শুধু এই নয়, তিনি জার্মানী ভাষাকেও এই মরমীবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা সুরু করলেন।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা-বস্তু মাধ্যমের (Gifts) মধ্যে ছিল : (১) বল, (২) গোলক, ঘনক, (৩) সমান আট অংশে বিভক্ত করা ঘনক (৪) সৃষ্টিশীলতার চর্চার জন্য—আয়ত ক্ষেত্র হিসাবে এই ঘনককে বিভক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল—ইটের মতো হবে তাদের চেহারা, (৫) ২১ অংশে বিভক্ত ঘনক, এর মধ্যে ত্রিশির আকারও আছে। এ ছাড়া থাকল— কাঠের একটি কাঠি, আর গড়নের জন্য দ্বিতীয় শলাকা ; তা ছাড়া কিছু টুকরো কাগজ। এই শিক্ষা-বস্তু মাধ্যমে শিশুর প্রেরণা আসবে, নীতিশিক্ষা আসবে—মনের অখণ্ডতা সৃষ্টি হবে। তাঁর মরমীবাদকে তাঁর শিষ্যেরা গ্রহণ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর এই শিক্ষা-বস্তু মাধ্যমকে সবাই স্বীকার ক'রে নিলেন।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাসূত্রে তা হলে ছিল—হাতের কাজ করানো, ইন্দ্রিয়কে শাণিত করা, সৃজনশীল করা, শিল্পী করা। তা ছাড়া ক্রীড়ার স্থান থাকল সর্বাগ্রে—তাঁর মতে এই ক্রীড়াই তার সমগ্রজীবনকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহৎ চিন্তা, চরিত্র-উপাদান প্রভৃতি।

যাই হোক, ফ্রোয়েবেলের অনেক ত্রুটি থাকলেও একথা স্বীকার করতে হবে—শিক্ষার্থীর আত্ম-ক্রিয়াজ শিক্ষাকেই তিনি প্রধানভাবে ধরেছেন। এই আত্মক্রিয়াজ (Self-activity) শিক্ষানীতিকে আজও মান্য করা হয়। তিনি বানান শেখাননি, অঙ্ককে উপেক্ষা করেছেন—কিন্তু শিশুর আত্মবিকাশকে স্বীকার করেছেন তিনিই। তারা খেলুক, খেলুক—খেলতে খেলতে শিক্ষার স্পৃহা ফিরে পাক। এই হচ্ছে ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি।

হার্বার্ট : (জন্ম ১৭৭৬—মৃত্যু ১৮৪১)।

বেকন চিন্তাশীলদের তিনটি প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, (১) মাকড়সা, (২) পিপীলিকা এবং (৩) মৌমাছি। নিজদের অন্তরের জ্ঞানকেই বাইরে এনে যারা ব্যবহার করে তাদের মাকড়সার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে; যারা নির্বিচারে চিন্তার বা জ্ঞানের সমস্ত কিছু আহরণ করে তাদের সঙ্গে পিপীলিকার এবং যারা জ্ঞানের সব কিছু আহরণ ক'রে নতুন কিছু সৃষ্টি করে তাদের মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একজন শিক্ষাবিদ পেস্তালৎজীকে মাকড়সার সঙ্গে এই সূত্র ধ'রে তুলনা করেছিলেন। তিনি অন্তরের শক্তি দিয়েই শিক্ষানীতিকে চালু করতে চান। কিন্তু হার্বার্ট এই শিক্ষানীতিকে মনোবিদ্যা সম্মত ক'রে দাঁড় করালেন।

পেস্তালৎজী কামেনিয়াস-রুশোর মতবাদকে গ্রহণ ক'রে বলেছিলেন, ইন্দ্রিয় শক্তিকে ব্যবহার করা, পর্যবেক্ষণশক্তি-কে ব্যবহার করা, সহজ মূর্ত বিষয়কে আলোচনা করা—এই তিনটির উপরই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা নির্ভর করে। কিন্তু এই জ্ঞানকে ব্যবহার করা যাবে কি ক'রে? এর প্রকৃতি কি? এই জ্ঞান প্রকাশ করার লগ্ন মুহূর্ত কি হবে? এরই উত্তর দিলেন জাঁ ফ্রেডারিক হার্বার্ট (Jean Frederic Herbart)। ওলডেনবুর্গে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গোটিনজেন-এ দেহত্যাগ করেন। সমগ্র জার্মানীতেই তিনি প্রায় পরিভ্রমণ করেছেন, জার্মানীর অনেক দেখেছেন। ১৭৮৮-থেকে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওলডেনবুর্গের জিমনাসিয়ামে লেখাপড়া শেখেন; এখানে তাঁর পিতামহই প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৭৯৪ থেকে ৯৮ পর্যন্ত জেনা বিশ্ববিদ্যালযে পড়াশুনা করলেন ফিখ্‌টের ছাত্র হয়ে। ১৭৯৭ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোন এক গভর্ণরের তিন পুত্রকে ব্যক্তিগতভাবে পড়ান। ১৭৯৮ তেই তিনি বার্গডোর্ফে পেস্তালৎজীর সঙ্গে পরিচিত হ'ন। ১৮০২ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত তিনি গোটিনজেনে বাস করতে সুরু করেন। এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপর তাঁর ডক্টরেট থিসিস দেন, এবং প্রাইভেট লেক্‌চারার হিসাবে এখানে কাজ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত বইপত্তর প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১৮৩৫-এ 'আউটলাইন অফ

পেডাগজিকাল লেকচার্স' (Outline of Pedagogical Lectures) প্রকাশিত হ'ল; এই পুস্তকই তাঁকে গৌরবের উচ্চশিখরে স্থাপিত করে। কেবল তাইই নয়, তিনি কোনিগ্‌সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্টের মৃত্যুর পর প্রবীণ অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই হচ্ছে হার্বার্টের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী। কিন্তু শিক্ষাশাস্ত্রে তাঁর দান এত সঙ্ক্ষিপ্ত নয়, এত সরল নয়।

হার্বার্ট শিক্ষার লক্ষ্যটিকে স্পষ্ট ক'রে ধ'রেছিলেন। এই লক্ষ্যটি কি? হার্বার্টের পূর্বে শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষার রাজ্যে নির্দেশ দিতেন—(১) ছেলেদের বুদ্ধিকে শাণিত কর, (২) কাজে-কর্মে তারা খাটাতে পারে এমন জ্ঞানদান কর, (৩) শিক্ষালাভের ভিত্তিগুলো, যেমন লেখা বা পড়া, স্থির ক'রে দাও, (৪) তাদের নীতিগত বা ধর্মগত শিক্ষায় দিনের কিছুটা সময় ব্যয় কর। কিন্তু এদের মধ্যে ঐক্য নেই। কেন এসব করা হবে? হার্বার্ট সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ক'রে বললেন, চরিত্র গঠনের জন্য। চরিত্রগঠন অর্থ ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি পড়িয়ে কি চরিত্রগঠন করা যায়? শিক্ষকের পক্ষে এ ব্যাপার কি সহজসাধ্য? তিনি এইখানেই জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তারা পারে। এই শক্তিকে জাগানোর জন্যই তিনি পড়ানোর পদ্ধতিতে যে-কয়টি বিষয়ে মন দিলেন তা হচ্ছে, অনুরাগ সৃষ্টি করা (interest), সংপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধান নেওয়া (apperception)। শিক্ষাশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর অভিপ্রায়ে তিনি কোনিগ্‌সবুর্গে প্রয়োগ-ইস্কুল এবং শিক্ষাসম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা-চক্রের সৃষ্টি করলেন।

অনুরাগ সৃষ্টি আর সংপ্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝবার আগে দেখা যাক তিনি মনোবিদ্যাকে কিভাবে বুঝেছেন। তাঁর সময়ে মানুষের মনকে কতগুলি শক্তির জোট (faculties) হিসাবে পরিগণিত করা হ'ত; যেমন স্মৃতিশক্তি, যুক্তিশক্তি প্রভৃতি। এই শক্তিগুলির অনুশীলন করাই মূল উদ্দেশ্য ধরা হয়েছিল (mental discipline or formal culture of the intellect)। হার্বার্ট এই মতবাদকে অস্বীকার ক'রে মনোবিদ্যাকে আধিবিদ্যা (metaphysics), সংখ্যাতত্ত্ব (mathematics) এবং অভিজ্ঞতার (Experience) উপর দাঁড়

করালেন। আমরা মনোবিদ্যার অভিজ্ঞতা-ভিত্তিকে একটু আলোচনা করে নিলেই 'সংপ্রত্যক্ষ' ব্যাপারটি কিছু বুঝতে পারব। হার্বার্টের কথায়—আত্মা সমৃদ্ধ হয় বিষয়ের সান্নিধ্যে এসে, কোন মানসিক-শক্তি (faculties) দ্বারা নয়; বিষয় যখন মনে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে তখনই আত্মিক দিক উন্নত হয়। কাজেই চিন্তনীয় বিষয়কে বাদ দিয়ে ছাত্রের মানসিক-শক্তি বৃদ্ধি ক'রে শিক্ষিত করা একেবারেই নিরর্থক; এই জন্যই তাদের চরিত্রগঠন হ'তে পারে না। হার্বার্ট চিন্তা-বিষয় মনের উপর কিরূপভাবে প্রতিফলিত হয় এবং তার থেকে নতুন কি অভিজ্ঞতার উদ্ভব হয়, এ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় কতখানি তিনি লাইবনীজের 'মোনাড্' মতবাদ, কতখানি কাণ্টের মতবাদ মেনেছেন বা খণ্ডন ক'রেছেন—সে সব দার্শনিক তত্ত্ব কথা আমরা এখানে তুলব না। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যায়,—বস্তু আছে, না, মন আছে; বস্তুর ক'টা দিক আছে; মনের সান্নিধ্যে বস্তু এসে কি পরিণতি লাভ করে; মনের কোন্ শক্তি বস্তুর সংস্পর্শে এসে কেমন কাজ করে; বস্তু মনের কাছে ইন্দ্রিয়-গ্রাম মারফৎ কেমন ভাবে আসে প্রভৃতি বিতর্ক দার্শনিকদের মধ্যে বহুকাল থেকে আছে। এই বিতর্ক থেকেই প্রত্যক্ষ (perception) এবং সংপ্রত্যক্ষ (apperception) কথাটা উঠে এসেছিল। লাইবনীজ্ বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ হচ্ছে সার্বিক – কিন্তু প্রত্যক্ষের অনেকগুলি স্তর আছে, অথচ প্রত্যক্ষ আর সংবেদন (Sensation) এক নয়; নিম্নস্তরের প্রাণীদের 'প্রত্যক্ষ' অত্যন্ত ক্ষুদ্র রকমের, সূক্ষ্মভাবের, অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাতসারে ঘটে থাকে; কিন্তু মানুষের 'প্রত্যক্ষ' যেমন স্পষ্ট তেমনি সচেতন। এইখানেই প্রত্যক্ষের সঙ্গে সংপ্রত্যক্ষের স্বাতন্ত্র্য। মানুষের এই সংপ্রত্যক্ষ দিক আছে।

হার্বার্ট লাইবনীজ থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে বললেন, জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ আমরা যা দেখি তাই কিন্তু সত্য দেখা নয়; কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফৎ যে-বস্তুটি আসে তার অনেক 'গুণ' আছে। প্রত্যেকটি বস্তুই পরম-বস্তু। তা হলে, আমরা সেই পরমটি সবাই দেখতে পাইনা কেন? আমরা কি দুধ দেখি, না, শুভ্র বর্ণের বিস্তৃতি দেখি? ইত্যাদি রকমের আলোচনা থেকে বস্তুর পরিবর্তিত

রূপ সম্পর্কে এসে বললেন, যদিও বস্তু পরম, কিন্তু তার মধ্যেই আছে কার্য-কারণ যোগ, যার ফলে সেই পরম-কে সে ভেঙে দিয়ে 'বহু' ক'রে ফেলে ; অথচ ঐ কার্য-কারণ ব্যাপারটি বস্তু-গত ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তুর মধ্যেই তার অস্তিত্ব – আর তাকেই তিনি বললেন আত্ম-সংরক্ষণ ক্রিয়া (Self preservation)। যদিও ঐ নামটি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে ; তবু বলতে হবে হার্বার্টের ঐ আত্মসংরক্ষণ ধর্মের উপর ভিত্তি করেই 'অভিজ্ঞতা' দাঁড়িয়ে আছে। কি ভাবে আছে ? বস্তুর পরিবর্তন-ক্রিয়ার মধ্যে তার উত্তর মিলবে। ইনি বলেন, বস্তুর প্রত্যক্ষে পরিবর্তন ঘটে না, ঘটে তার সম্পর্কটি নির্ণয়ে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যে-যোগ হচ্ছে, সেইখানেই চলছে অবিরাম পরিবর্তনের স্ফুট-ক্রিয়া। জ্যামিতি থেকে এ ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ক-খ-গ বৃত্তের স্পর্শক, চ-ছ-জ বৃত্তের ব্যাসার্ধ হয়েও দাঁড়ায়। ফুটবল মাঠে আজ যিনি গোলে খেলছেন, কাল তিনি ফরোয়ার্ডে খেলতে পারেন। আমার বন্ধু যিনি তিনি আমার শত্রুরও শত্রু। নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাছে যিনি সাপ, তাঁর কর্তার কাছে তিনি কেঁচো। কাজেই বস্তুর পরিবর্তন না ঘটলেও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তাই হার্বার্ট মনের ধর্ম নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি শিক্ষাশাস্ত্রে আনলেন— কি ভাবে বস্তুর প্রতিফলন হয়, বস্তু যখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেশে তখন কোন্ রূপ নিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে, অভিজ্ঞতার মিশ্রণ কি ভাবে ঘটে, ভাবের কি ভাবে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। সংপ্রত্যক্ষ বলতে হার্বার্ট তাই বলেন, পূর্ব ভাব বা ধারণা যা আছে তার সঙ্গে নতুন ভাবের আত্তীকরণ। মনের মধ্যে এই যে পূর্ব-ধারণা আছে সেইখানে শিক্ষকের করণীয় কিছু নেই ; যা আছে তার সঙ্গে কাজ করাই শিক্ষকের কর্ম ; অর্থাৎ শিক্ষক নতুন কিছু তৈরী করতে প্রাক্ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নেবেন ; তাঁর প্রাথমিক কাজ হবে জ্ঞান দান করা, এবং তা এমনভাবে যাতে দ্রুত অনিবার্য এবং প্রয়োজনীয় ভাবে আত্তীকরণের সাহায্য করে। এইজন্য ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান এবং অনুরাগ জেনে নিতে হবে ; উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার মতো ক'রে পাঠ-বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে ; ছাত্রের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়-বস্তু সাজিয়ে নিতে হবে ; অর্থাৎ বিষয় এবং মন যেন সমান তালে চলতে পায়। তা ছাড়া পদ্ধতিটি এমন ভাবে, যাতে যেমন

দ্রুত কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে তেমনি ফল যেন স্থায়ী হয়। হার্বার্ট তাঁর দার্শনিকতা থেকে এমনি ক'রে শিক্ষকের কাজে কর্মে তাঁর আলোচনার আলো ফেললেন। এই ভাবে তিনি শিক্ষাতত্ত্বকে কাজের মধ্যে আনতে গিয়ে অনুরাগ সম্পর্কে এবং ইস্কুল পরিচালনা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তাঁর সংপ্রত্যক্ষ নিয়ে তাঁর শিষ্যরা বিশেষ ক'রে স্টেইনথল, এবং হবূন্ অনেক বলেছেন, সে-সব বাদ দিয়ে আমরা তাঁর অনুরাগ ব্যাপারটি একটু দেখতে চেষ্টা করি।

অনুরাগ সঞ্চার করা কাকে বলে? খুব সহজ ক'রে জলবৎ তরল করে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা? হার্বার্ট তা বলেন না। তিনি বলেন, শিক্ষা অন্তর্ভেদী আলোক বিশেষ, মনকে সে উন্নীত করবে। চিন্তাশক্তিকে উন্নত করা, সেই উন্নতি স্থায়ী করা, মনকে এবং শিক্ষার্থীকে স্বাধীন ক'রে দেওয়া—এই সব প্রক্রিয়াই অনুরাগ সৃষ্টির ধর্ম। অনুরাগ ক্ষণিক হবে না, অনুরাগ বর্তমান পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সে ব্যাপক, সে বিস্তৃত, সে স্থায়ী। হার্বার্ট তাই অনুরাগকে মূলত দু'টি শ্রেণীতে ফেললেন: (১) জ্ঞান থেকে যে অনুরাগ আর (২) পরিবার ইস্কুল, ধর্মস্থান, সমাজ প্রভৃতি থেকে জাত যে অনুরাগ।

বৈচিত্র্য থেকে, জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক থেকে মন উত্তেজিত হ'লে অনুরাগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার এইটি প্রাথমিক কথা বটে। এরই উপর নির্ভর ক'রে চলে প্রাথমিক ইস্কুল কিণ্ডারগার্টেনের কার্যতালিকা। যেন শিশুদের বিক্ষিপ্ত মনকে সংহত করিয়ে আনবার এ এক পদ্ধতিবিশেষ। এই পদ্ধতি ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ এ 'সংবেদন'-এর আবর্তে না পড়ে! কারণ সে সময় শিশুরা পড়াশুনার সবকিছু বর্জন ক'রে কেবল চটকদারী দিকেই মন নিবদ্ধ করে। এই ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অনেক ইস্কুলে সাজ-পোষাকের চটকদারীত্বে বা মনভোলানো রূপে তাদের আকর্ষণ করা হয়; এমনি রঙের জামা পরবে, এমনি ক'রে ফিতে বাঁধবে প্রভৃতি কত কি! এর ভালো দিক হচ্ছে—পরস্পরের মধ্যে ঐক্য আনা; কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে ধনী-নির্ধন একসঙ্গে পড়বে এই যদি হয় উদ্দেশ্য তবে তা অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে যায়। গণতান্ত্রিকেরা যে একথা জানেন না সেকথা নয়, তবু এমন ব্যবস্থা করেন—কারণ ছাত্র এবং অভিভাবকেরা এই সব বৈচিত্র্যে সাময়িক আনন্দ পায়—যার ফলে ইস্কুলের পড়াশোনার

অবনতিকে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে দেখবার সুযোগ পান না। ঐ একই কারণে অনুষ্ঠান-গত কার্য কলাপ অনেক ইস্কুলে বাড়িয়ে দেয়। হার্বার্ট ঐ চটকদারীত্বে অনুরাগ অনুমোদন করেন নি।

আর আছে দূরকল্পী অনুরাগ। আকাশের নক্ষত্র দেখে অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে দু'রকমে; সংবেদন থেকে আর কার্য-কারণ কল্পনা ক'রে। দূরকল্পী অনুরাগের মধ্যে আছে চিন্তাশক্তির ব্যবহার। এই অনুরাগই অনুমোদন করেন হার্বার্ট। এই অনুরাগই সঞ্চার করতে হবে শিক্ষার্থীর মনে। এই যে যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক অনুরাগ, এই-ই তো শিক্ষার মূল কথা। বলতে বাধা নেই, সমাজের জটিল অবস্থায় এই দূরকল্পী অনুরাগের দিক বর্জিত হ'তে বসেছে। তাই বুঝি আমরা ছাত্রদের মনের প্রবণতা সামর্থ্য নবরীতিতে পরিমাপ ক'রে বিষয়বস্তু ভাগ ভাগ ক'রে দিচ্ছি। শিক্ষার্থীর মনে যদি এই দূরকল্পী অনুরাগের সৃষ্টি প্রথম থেকেই করা যেত—তবে অত ঝাড়াই-বাছাই করতে হত না। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ শিক্ষাবিদ হে'ওয়ার্ড বলেছিলেন 'ধর্মযাজকেরা আত্মাকে নরক আর পাপ থেকে রক্ষা করে; আইনবিদ সম্পদ আর খ্যাতিকে রক্ষা করে; ডাক্তার শরীরকে নিরাময় করে; প্রত্যেকেই যেন একটা-না-একটা নেতিবাচক কাজ করে; কিন্তু শিক্ষার কাজ সৃষ্টি করা; নতুন কিছু তৈরী করা; শিক্ষার কাজ নির্মাণ, কিন্তু রক্ষা বা নিরাময় করা নয়।' নির্মিতে-তে উপকরণ দরকার বটে, কিন্তু এ উপকরণ যে মন; আবার সেই মনে শিক্ষা আসছে বাইরে থেকে; কাজেই মনের ক্ষমতাই যদি কথা হয়, তবে সে ক্ষমতা বিষয় অনুযায়ী স্বতন্ত্র হ'তে পারে না—সে একটা দীপ্তি। এই দীপ্তিই সৃষ্টি হয় অনুরাগ থেকে। মনের সে আলোকের যদি সৃষ্টি করে না থাকতে পারি—তবে সে ইস্কুলের দোষ, ছাত্রের নয়।

সৌন্দর্যজ্ঞান বা রস-অনুভূতির অনুরাগও আছে। এই অনুরাগ বৈচিত্র্য থেকে নয়, দূরকল্পনা থেকেও নয়। এ আসে ধ্যান থেকে; ইন্দ্রিয় থেকে যে-বস্তুটি এসে পৌঁছল তার রূপ-কল্পের উপর ধ্যান করা থেকেই এই অনুরাগের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে আসে স্বভাব, আসে নীতি, আসে কর্মচাঞ্চল্য।

অন্যের সংস্পর্শ থেকে প্রথমেই আসে সহযোগিতার অনুরাগ, সহানুভূতি। পরিবার থেকেই এর সূত্রপাত। কিণ্ডারগার্টেনে তাই প্রথমে শেখানো উচিত—সহযোগিতা আর সহমর্মিতা থেকে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, তাই। ইস্কুলে যদি কোন ছাত্র অন্যের থেকে অভিনব এবং মূল্যবান পোষাক পরে আসে—তবে সে অন্যের সঙ্গে মিশতে পায়না; সেই থেকে তার আনন্দের ক্ষতি জন্মে যায়। সে সবার সঙ্গে এক হওয়ার চেষ্টা করে, এই থেকে আসে সমাজ-অনুরাগ। খেলা, গান করা, কাজকরা—সবাই মিলে। এই যে সামাজীকরণ এই থেকে তাদের সামাজিক দিক সম্পর্কে অনুরাগ জন্মে। এমনি ক'রে ধর্মীয় অনুরাগ, জাতি-চেতনা, প্রভৃতি সমস্ত কিছুতেই যদি অনুরাগ সঞ্চার করা যায় তবে শিক্ষার্থীর জীবন-বোধ জন্মে, তার নীতির দিকটি সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে।

সংপ্রত্যক্ষ আর অনুরাগ এই দু'টি তত্ত্বের উপরই হার্বার্ট শিক্ষাপদ্ধতির ছক কসলেন। অবশ্য প্রথমে চারটি স্তর স্থির করেছিলেন: (১) স্পষ্টতা (clearness), (২) অনুষঙ্গ (association), (৩) প্রণালী (System), (৪) পদ্ধতি। স্পষ্টতার স্তরে ছাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়টি উপলব্ধি করবে; অনুষঙ্গ স্তরে—যা প্রত্যক্ষ করা হ'ল তার সঙ্গে এখনও অপ্রত্যক্ষ যা আছে তার মিলন ঘটাতে হবে, অর্থাৎ, চিন্তনের দিকটি ঘটবে; প্রণালীর স্তরে—বস্তুর অন্তর্নিহিত অংশগুলিকে বিন্যাস ক'রে নেবে; পদ্ধতি স্তরে থাকবে ছেলেদের স্বাধীন কাজ অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুর প্রয়োগ করা।

এই ছক-কে বিস্তারিত করলেন তাঁর শিষ্য জিলার; আর জিলারের শিষ্য ডক্টর রেইন (Dr. Rein) এই ছককে পাঁচটি স্তরে ফেললেন; যেমন, (১) প্রস্তুতি (Preparation) অর্থাৎ পূর্বজ্ঞান বিশ্লেষণ মূলক, (২) উপস্থাপন (Presentation) অর্থাৎ সংশ্লেষণ মূলক, (৩) অনুষঙ্গ, (৪) প্রণালী (System) (৫) অভিযোজন (application)।

যাইহোক, হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতি যে কেবল জার্মানীর শিক্ষাকেই প্রভাবিত করল তা নয়, তাঁর শিক্ষারীতি ইয়োরোপ-আমেরিকার সর্বত্র অনুসৃত হ'তে থাকল। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, একথা বলতে হয়, জার্মানী-ই যেন

পৃথিবীর বর্তমান শিক্ষারীতির উদ্‌গাতা; কেবল শিক্ষারীতিরই নয়, ইস্কুল সম্পর্কেও এঁরা অনেক পরিবর্তন ঘটালেন।

ইয়োরোপের শিক্ষা-ইতিহাস শেষ করবার পূর্বে আর-একজন শিক্ষাব্রতীর নাম করতেই হয়। ইনি ইতালীর মারিয়া মন্তেসরী।

মন্তেসরী:

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। গ্যারিবল্ডী এবং কেভূরের যুগ। ইতালীর ঐক্য সংগ্রামের শেষ দিক। এই যুগসন্ধিক্ষণে—জন্মগ্রহণ করলেন মন্তেসরী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান, অবস্থা তত ভালো নয়।

তৎকালের সমস্ত সংস্কার বর্জন ক'রে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে লাগলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডক্টর উপাধি পেলেন। কোন নারীর পক্ষে এই ডিগ্রী লাভ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম। ওখানেই সহকারী চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হ'লেন। এখানকার উন্মাদাগারের মনোবিকল শিশুদের সম্বন্ধে আগ্রহও জন্মাল। তাঁর মনে হল, শিশুদের মানসিক বিকলতা কাটানো চিকিৎসার চেয়ে শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব বেশী।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তুরানের শিক্ষা-কংগ্রেসে তিনি এই কথা প্রচার করলেন। ফলে, রোমের শিক্ষকদের মধ্যে প্রচার করবার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগীয় উপদেষ্টা কর্তৃক আহূত হ'লেন।

সেই থেকে অর্থোফ্রেনিক ইস্কুলের উদ্ভব। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত শিশুরা এইখানে শিক্ষা পেতে লাগল। দুই বৎসর ধ'রে মন্তেসরী নিজের তত্ত্বাবধানে এই ইস্কুল পরিচালনা করলেন (১৮৯৮-১৯০০)। এই সময় তিনি ইংল্যণ্ডে এবং প্যারিসে ভ্রমণ করলেন। অতঃপর তাঁর ধারণা হ'ল, শিক্ষার এই পদ্ধতিতে সুস্থ শিশুদেরও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে; তা'ছাড়া এই পদ্ধতি নতুন ইস্কুলের পক্ষে ব্যক্তিগত দিক (ছাত্রের), ব্যক্তিবিকাশের দিক নজর দেবার উপযোগী হবে।

এই জন্য তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে কাজ করা ছেড়ে দিয়ে দর্শন ও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান পড়বার জন্য পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরিচালনায় 'চিলড্রেনস হাউস' নামে এক বিত্তালয় প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অনতিবিলম্বেই এখানে তিনি তাঁর পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন করলেন।

তাঁর শিক্ষানীতি আর পদ্ধতি কি? মনের শূন্যতার উপর তাঁর পদ্ধতি দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে মনের মুক্তির উপর। জ্ঞান প্রবেশ করানো নয়, জ্ঞানলাভের সুস্থ আর অনুকূল আবহাওয়ায় বা পরিবেশ প্রস্তুত করা। যাঁরা শিক্ষার অন্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন নন তাঁরা মন্তেসরীর সঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করবেন, ইস্কুল আর বাড়ীর পুঞ্জীভূত কার্যক্রমের মধ্যে, আর দল-গত পড়ানোর পদ্ধতিতে, শিশুদের মন বিরক্ত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু তাঁর সমালোচনা আর শিক্ষা-পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিশুদের এই অবস্থা থেকে তিনও ঠিক মতো বাঁচাতে পারেন নি। কারণ, এ বিষয়ে জীবন সম্বন্ধে সত্যকার ধারণা থাকা চাই; এবং এই জীবন-দর্শন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে তেমন দেখা গেল না। এইখানে মন্তেসরী ব্যর্থ।

পেস্তালৎজী যা পেরেছিলেন—সেই সুফল-প্রসবী এবং সন্নিবদ্ধ চিন্তার ঐক্যের উদ্ভব তাঁর পরীক্ষা কার্যে দেখা গেল না। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি তো একটি সমগ্র পদ্ধতি নয়, কতগুলি পদ্ধতির সমবায়। এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে পরস্পর ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু এদের একটির সঙ্গে অন্যটির আত্মিক যোগ নেই।

এরূপ হওয়ার কারণ? তিনি সমালোচকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরীক্ষিত প্রক্রিয়াগুলি একসঙ্গে জুড়ে ব্যবহার করতে চাইলেন, নতুন কিছু করবার সাহস হ'ল না। ফলে, পদ্ধতিগুলি নিরেট বা ঐক্যযুক্ত না হ'য়ে সকলের মনোরঞ্জক এক বিচিত্র পদ্ধাতির সৃষ্টি হ'ল।

তাঁর পদ্ধতির মধ্যে চারটি পৃথক ধারা দেখতে পাওয়া যায়:

(১) ফরাসী শিক্ষাবিদ্ সেগাইঁ (Seguin)-এর পদ্ধতি তিনি কার্যোপযোগী ক'রে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করলেন।

সেগাইঁ সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। ইনি কিছুদিন ওয়েভার্লির (Waverley) ইস্কুলের প্রধান ছিলেন; আবার ওয়েভার্লির ম্যাসাস্যুসেট্‌স ইনস্টিটিউসন ফর ফীব্‌ল্‌-মাইণ্ডেড্‌-এর কার্যাধ্যক্ষ ডক্টর ফার্নাল্ড (Fernald)

অনেক আগেই অনেকগুলো যন্ত্র-পাতি প্রয়োগ ক'রে শিক্ষাকার্য চালাচ্ছিলেন; তাঁর বহু যন্ত্রই মন্তেসরীর ব্যবহারে দেখতে পাওয়া গেছে। কাজেই মন্তেসরীর ঋণের বোঝা-ই যে কেবল বেড়েছে তা নয়, মন্তেসরীকে এ পদ্ধতির আবিষ্কার করার মর্যাদাও বোধ হয় দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, পরীক্ষা-প্রধান শিক্ষাশাস্ত্র মইম্যান (Meumann) বহু পূর্বেই ব্যবহার করছিলেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, সকল পদ্ধতিকে একযোগে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন মন্তেসরীই প্রথম, (But before Montessori no one had produced a system in which the elements named above were combined—H. W. Holmes.)।

(২) স্বাধীনতা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। এই বিষয় শিক্ষা দিতে কি পরিকল্পনা করা যায়? দৈনন্দিন কার্য, নম্রবস্তুর গড়ন, জ্ঞানেন্দ্রিয় চর্চা প্রভৃতি বহু কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে লাগলেন।

(৩) বেদিতা (Sensibility) অনুশীলন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন।

(৪) লেখা, পড়া আর অঙ্ক কসার মধ্য দিয়ে ভবিষ্য জীবনের উপযোগী ক'রে তাদের প্রস্তুত করতে হবে ব'লেও মনে করলেন।

আবার, এই চারটি পদ্ধতি-ধারা থেকে দুটো প্রধান দিক বেশ লক্ষ্য করা গেল:

(ক) বিকাশমান শিশুর স্বাধীনতা এবং কার্যে স্বতঃস্ফূর্ততা।

(খ) প্রাথমিক স্তরে শিশুর পেশী ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে প্রাধান্য দেওয়া।

মোটামুটি বলা যায়, তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল তিনটি—ব্যক্তিতা (Individuality), স্বাধীনতা আর জ্ঞানেন্দ্রিয় চর্চা।

এখন একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আসতে পারে যে, স্বাধীনতা অর্থে তিনি কি বুঝেছেন?

এই স্বাধীনতা জীব-বিজ্ঞানের। শাশ্বত জীবন-ধর্মের প্রকাশই শিশুর চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। অতএব তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। শিশুর শরীর ও মনের বৃদ্ধি ঘটে শাশ্বত জীবনধর্মের প্রেরণায়—এই প্রেরণা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করে।

এইজন্যই অবাধে তাকে এই শক্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সুযোগ-মূলক বৃদ্ধি (Favourable development) তার সমগ্র ব্যক্তিতা-কে গঠন করে। এরই মধ্যে আছে তার আত্মনির্ভর হ'তে শেখা। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন, শিশুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সক্রিয় পন্থা; এই দিকটি এমন ভাবে পরিচালিত হবে যাতে সে আত্মনির্ভর হ'তে শেখে। স্বাধীনতার মধ্যে শারীরিক আর মানসিক দুটি দিক আছে। মন্তেসরী বলেন, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন শারীরিক ব্যাধির জন্য তার পায়ের জুতো খুলতে পারে না, তেমনি রাজাও সামাজিক মর্যাদার ভয়ে এই ব্যাপারটি করতে সাহস পায় না —দু'জনই একই স্তরে নেমে এল, একজনও স্বাধীন নয়।

মন্তেসরী রাজা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি, অনেক মোটা মাইনের কর্মচারী বাইরে থেকে বাড়াতে এসে চাকরকে ডেকে জুতো মোজা না খুলিয়ে মনের শান্তি পান না। চাকর না থাকলে পত্নী আছেন। আর, জুতো খোলাবার সময় তাঁদের মনের কত তৃপ্তিই না অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে।

মন্তেসরীর মতে শরীর মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের ব্যবহারও জড়িত হ'য়ে পড়ে। শিক্ষাব্রতীকে জীবনের পূজারী হ'তে হবে (inspired by a deep worship of life); এই জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার দিকই শিশুর জীবন-বিকাশ পর্যবেক্ষণ করবার শক্তি দেবে। শিশুর জীবন তো আর কাল্পনিক বা অবাস্তব নয়। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিশুরই জীবন! আর এই ব্যক্তি-শিশু হচ্ছে জীবন-কর্মে ব্যাপৃত (living individual)। তার শরীর বাড়ে আর মন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।

তা হ'লে পরিবেশ কি? পরিবেশ হচ্ছে দ্বিতীয় দিক। পরিবেশ তার জীবনকে প্রভাবিত করে বটে, কিন্তু জীবনবৃদ্ধির পক্ষে পরিবেশ হয় বাধা-স্বরূপ, নতুবা সহায়ক; এ ছাড়া পরিবেশ কখনও তার জীবনে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না (it can modify in that it can help or hinder, but it can never create)।

মন্তেসরী বোধহয় ড্ ভ্রাইসের (De Vries) জীব-বিদ্যার সূত্রকে মান্য করতেন। এঁরা অন্তর্নিহিত এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কতগুলি বিশেষ নির্দিষ্ট শক্তি-

বাদে বিশ্বাসী। এঁদের মতে, কোন প্রাণীর জাতিকে (Species) কোন পরিবেশ দিয়ে রূপান্তরিত করা যায় না; সেই নির্দিষ্ট শক্তিই তাকে জাতিতে রূপ দেয়; তবে ব্যক্তিতার সহায়ক (individual) হিসাবে পরিবেশকে ব্যবহার করা যায়।

"যখন শিশু কেবল ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠতে চায়, তখন তার স্বতঃবৃত্তিকে রোধ করবার পরিণাম আমরা চিন্তা করি না বটে, কিন্তু পরিণামে এ ব্যাপারে মনই ধ্বংস হয়ে যায়।" এই জন্যই মন্তেসরী কোনরূপ বলপ্রয়োগে শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। বিদ্যালয়ের এই রীতিকে তিনি সংশোধন করতে ব্যগ্র হ'লেন।

তাঁর শিক্ষাযতনে কোনরকম স্থায়ী বা অনড় বেঞ্চ থাকত না। এগুলি এমন হালকা যে শিশুরা অনায়াসে সেগুলো সরিয়ে বাইরে এনে ব্যবহার করতে পারত। শিক্ষাবিষয়েও তারা নিজ নিজ কাজ করতে জানত, এবং নিজ নিজ আচরণের সংশোধন করতে শিখত। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, একে বলা যায় স্বয়ং-শিক্ষা। কতগুলি বিষয় বাদে—অন্যগুলিতে তারা ইচ্ছা অনুযায়ী যোগ দিতে পারে। কোথায়ও শ্রেণীগত শিক্ষা তাদের দেওয়া হ'ত না। একই জিনিস ছাঁচে-ঢালা ক'রে প্রত্যেকের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রথা উঠিয়ে দিলেন। যখন তাদের ইচ্ছা—শিখত; যখন তাদের খুসী ছুটি নিত। অবশ্য সব সময়েই একজন পরিচালিকা থাকতেন, কিন্তু মূলত তিনি কেবল দর্শিকা, শিক্ষিকা নন।

এর দ্বারা এই প্রমাণ হচ্ছে না যে, এখানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একটি লক্ষ্যের দিকে শিক্ষাকে অগ্রসর করানো হয় না। এ দ্বারা কেবল এইটুকুই পরিবর্তন করা হ'ল যে, ইচ্ছাশক্তি অন্তর থেকে আসবে, বাইরে থেকে নয়।

শৃঙ্খলাবিধানও বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, ভেতর থেকেই আসবে। তাঁর মতে, স্বাধীন মনের সঙ্গে যদি এই শৃঙ্খলাকে জড়িয়ে নেওয়া যায়, তবে শৃঙ্খলা সক্রিয় হতে বাধ্য (If discipline is founded upon liberty, the discipline itself must necessarily be active)। ক্লাশে চুপ ক'রে থাকলেই কি আর তাকে ভালো ছেলে বলা যায়? ঐ নীরব

ছেলেটি ভয়ে বোবা হয়েছে, বোবা হ'য়ে বুদ্ধিমান হয় নি, বোবা হয়েও নিয়মানুবর্তী হয় নি। তার নিজের উপরই নিজের কর্তৃত্ব দাও; সে এইভাবে যখন জীবনযাত্রার নিয়ম বুঝতে পারবে—তখন নিজের স্বভাব নিজেই নিয়ন্ত্রণ ক'রে নেবে। এই সক্রিয় নিয়মানুবর্তিতা সিদ্ধ করতে হ'লে, শিক্ষককে মনে রাখতে হবে—শিশু এখন বসে থাকতে চায় না, সে চলাফেরা করতে চায়। কাজেই সে ইস্কুলের জন্য নয়, সে জীবনের জন্য। তা যদি হয়, তবে তো ইস্কুলের শৃঙ্খলা ব'লে কোন কিছু অবাস্তব জিনিস নেই, আছে সামাজিক শৃঙ্খলা—সমাজের মধ্য থেকেই শিশু তার জীবনযাত্রার নিয়ম পাবে। অতএব, ইস্কুলের শৃঙ্খলা সমাজের শৃঙ্খলায় ব্যাপ্ত হ'তে বাধ্য।

এই দিক দিয়ে মন্তেসরী-উদ্ভাবিত 'টাপ্‌টুপ্‌ নিশ্চুপ্‌ খেলা' (Games of Silence) খুব উপযোগী। বিধি-নিষেধ, নিয়ম-অনিয়ম, তারা এইভাবে প্রত্যেক খেলার মধ্য থেকেই শিখতে পায়। সংযম আত্মশুদ্ধির পথ দিয়েই আসবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশের খেলার মধ্য দিয়েও তারা নিজ ত্রুটি লক্ষ্য ক'রে নিজেরাই সংশোধন করতে শেখে।

দৈনন্দিন কার্য-বিধি তাদের স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দেয়। তারা বস্ত্র ব্যবহার করতে, পরিষ্কার রাখতে, ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন রাখতে, ইস্কুলের আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখতে এমন ভাবে অভ্যস্ত হয় যে, প্রত্যেকটির মধ্য থেকেই তারা একটা নিয়ম আর সংযম খুঁজে পায়। বাগান-দেখা, বপন করা, গাছ পরিচর্যা করা প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই তাদের সেই শৃঙ্খলাবোধ। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারের সঙ্গে মন্তেসরীর আসল প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য অনেক সমালোচক খুঁজে পান নি।

মন্তেসরী শিক্ষান্তরকে নিরূপিত করেছেন এইভাবে: শিশুকে হাত ধ'রে পেশী পরিচালনা শিক্ষার মধ্য দিয়ে, স্নায়ু-শক্তি বৃদ্ধি শিক্ষার মধ্যে নিতে হবে। সেই স্তর থেকে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় শিক্ষায় নিতে হবে; সেখান থেকে স্বাভাবিক বৃত্তিতে, তারপর বিমূর্ত চিন্তা-পদ্ধতিতে—তারপর নৈতিকতায়।

সেগাইঁ কিন্তু এইরূপ স্তর-বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। সামগ্রিক ঐক্যই ছিল তাঁর লক্ষ্য; মনের সাধারণ ক্রিয়াশক্তি থেকে এগুলিকে পৃথক

করা যায় না; যদি পার্থক্য করাই হয় তবে সে পার্থক্য-বিধান অস্থায়ী; যখনই কোন ক্ষমতা আয়ত্ত করা গেল তখনই তা এক মানসিক শক্তিতে পরিণত হ'য়ে অস্মিতার (Personality) সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যায়। এইখানে সেগাইঁ থেকে মন্তেসরী বিরুদ্ধ পথে এলেন অজ্ঞাতসারে, কারণ বিরুদ্ধতা স্বীকার করেন নি।

তত্ত্বের দিক দিয়ে অবশ্য মন্তেসরী স্বীকার করেন যে, শারীরিক চর্চা মানসিকতাকেই বৃদ্ধি করে, কিন্তু কার্যত তিনি এই মত মেনে নেন নি। তিনি কেবল পৃথক পৃথক ভাবে কার্য-ব্যবহারকেই মানিয়েছেন; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্তত সামগ্রিতাকে স্বীকার ক'রে উঠতে পারেন নি। যখনই শারীরিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, তখনই তার ফল যে আর-একটি শারীরিক ত্রুটিতে দেখা দেয়—তাইই বলেছেন; মনের উপর যে প্রভাব আনে—তা বলেন নি। যদিও সেই চিন্তাই ছিল তাঁর গোড়ার কথায়। সেগাইঁ মানবিকতার এই ঐক্যের কথাই বলেছেন। অতএব মন্তেসরীর ব্যবহারিক দিক এই মতবাদের বিরুদ্ধেই যায়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বর্ধন প্রসঙ্গে মন্তেসরীর প্রধান কথা হচ্ছে, (১) "জ্ঞানেন্দ্রিয় চর্চার প্রধান লক্ষ্য—বারবার এই অভ্যাসে উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।"

এই বিষয়ে তিনটি অংশ আছে:

(ক) প্রথমে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে নামকরণ করতে গিয়ে যে অনুষঙ্গ জ্ঞান; যেমন—এটি **লাল**,

(খ) বস্তুর সঙ্গে নামটির পরিচয়; যেমন—**লালটি** দাও,

(গ) বস্তুর নামটি স্মৃতিতে রাখা; যেমন— এটি কি?—**লাল**।

(২) ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বর্ধন শিক্ষা হবে—স্বয়ং শিক্ষা। এটি মন্তেসরী আবিষ্কৃত শিক্ষা-যন্ত্রের (Didactic Apparatus) সাহায্যে সাধিত হবে।

(৩) কয়েকটি নিয়ম: প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অন্য থেকে পৃথক ভাবে দিতে হবে, যাতে সর্বশেষে সবগুলির শিক্ষা এক সামগ্রিকতারই পরিপোষক হ'তে পারে।

সর্বদা চোখ-বাঁধা অবস্থায় এই সব অনুশীলনের প্রয়োজন। এতে খেলাগুলি চিত্তাকর্ষক হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনুশীলন করতে সর্বদা দুটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু নিয়ে দিতে হয়। যেমন বর্ণভেদে—লাল এবং নীল। তারপর এই তারতম্যের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে—যে পর্যন্ত না শিশু অতি সূক্ষ্ম প্রভেদটি ধরতে শেখে।

কিন্তু মন্তেসরী শরীর ও মনের বৃদ্ধি ঘটাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিয়ে এত বিশেষ ক'রে ভাবলেন কেন? তাঁর ধারণা, ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের শিশুরা শরীরের দিক দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত বাড়ে (কথাটি আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত বটে)। বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, এই হচ্ছে সময়, যখন ইন্দ্রিয়কে শাণিত করা উচিত। আবার নিষ্ক্রিয় ঔৎসুক্যের সঙ্গে পরিবেশকেও সে বুঝতে চায়। কিন্তু পরিবেশের যুক্তির দিকে নয়, উদ্দীপকের (Stimuli) দিকেই তার মন ধেয়ে চলে। কাজেই তিনি মনে করেন, এই সময়েই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ উদ্দীপককে এমন ভাবে পরিচালিত করা উচিত, যাতে ঐ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যুক্তিপথ অনুসরণ করতেই এগিয়ে চলে।

চিরাচরিত শিক্ষায় তাঁর আপত্তির কারণ হচ্ছে, আমরা ভাবকল্প নিয়ে শিক্ষার সুরু করি, তারপর কর্মেন্দ্রিয় অনুশীলনে এগোই। অর্থাৎ, বুদ্ধি খাটিয়ে পড়া সুরু করিয়ে তারপর পাঠের হেতু আব নীতির দিকে যাই।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছেন ভালো। ধরুন, ঠাকুরকে (দেবতা নয়, পাচক) বললাম—ওহে বাজার থেকে সব সময় টাটকা মাছ কিনবে। ঠাকুর মাথা ঝাঁকিয়ে, মাথা খাটিয়ে, টাটকা মাছ কিনতে উদ্যোগী হ'ল। এখন, যতই নিষ্ঠা থাকুক—ঠাকুবেব যদি দৃষ্টি আর নাসিকার এমন শিক্ষা না থাকে যাতে টাটকা আর পচা মাছের তফাৎ টের পেতে পারে—তবে সে টাটকা মাছের ধারণা নিয়ে কতদিন বিশ্বস্ত থাকতে পারবে! এই রকম ব্যাপার তো আজকাল হামেসাই হয়, যখন পাকপ্রণালী দেখে রান্না করতে যান মেয়েরা। অতএব ইন্দ্রিয়জ্ঞান-শিক্ষা বিশেষ দরকার।

এইজন্য মন্তেসরী ২৬ প্রকারের শিক্ষাযন্ত্রের ব্যবহার করেছেন। এতে সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মে; তবে স্বাদ এবং গন্ধ বিষয়ের কোন খেলা নেই (পচা মাছের গন্ধ টের পাওয়ার জ্ঞান ঠাকুরের হ'ল না, পচা মাছ খেয়ে টের

পাওয়ার মতো শিক্ষা মনিবের হ'ল না—বাঁচা গেল!)। এই খেলা আরম্ভ হয় তার ৩ বছর বয়স থেকে। প্রক্রিয়াটি অনেকটা এই রকম :

(১) ছিদ্রযুক্ত কতগুলি কাঠের খোল আছে (মৃদঙ্গ নয়) ; এ দিয়ে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা হয়।

ওজন করবার জন্য রাসায়নিকাগারে যেসব বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেই রকম কাঠের ছোট ছোট ওজন।

(২) এর পরই বড় বড় জিনিস—এগুলিতে একটু শরীর এবং পেশীর চালনা প্রয়োজন।

(৩) যে-সব উদ্দীপক সম্পর্কে শিশু এই স্তরে জ্ঞান পেয়েছে—তার তারতম্য বুঝতে চেষ্টা করে। যেমন ; অমসৃণতা, মসৃণতা—প্রভৃতি। এ কাজ কতগুলি কাগজের সাহায্যে নির্বাহ করা হয়।

(৪) এই স্তরে শ্রবণশক্তির ব্যবহার করানো হয়। কানে শুনিয়ে বাদ্য-যন্ত্রের প্রকৃতি ধরতে শেখানোই প্রধান।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সঙ্গে মন্তেসরীর পদ্ধতির অনেক অংশে সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি বৈপরীত্যও আছে। প্রধান পার্থক্য হচ্ছে : মন্তেসরীর ছেলেরা নিজদের ইচ্ছামতো, ব্যক্তিগত পরিচালনায়, সর্বসময়েই বস্তুকে নাড়াচাড়া করে ; কিন্তু কিণ্ডারগার্টেনের ছেলেরা যৌথভাবে কাজ এবং খেলায় একটা কল্পনার আবেদন নিয়ে নিজদের নিযুক্ত রাখে। কিণ্ডারগার্টেনের এই ক্রটিতেই দেখা গেছে, ছেলেরা জ্যামিতিক বিশ্লেষণের কাজে এবং কাঠাম গড়নের কাজে বেশী তাড়াতাড়ি ক্লান্তি-বোধ করে ; তাদের যেন ঐ কাজে আর আগ্রহ থাকে না।

মন্তেসরীর মতবাদের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। তার মধ্যে, শ্রেণীগত পড়ানো আজকের দিনে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে পড়ানো যায় কি না, ইস্কুলের পড়ানোয় সেরূপ করা উচিত কি না ; কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যেই সব কিছু শিক্ষার পথ পরিষ্কার করা যায় কি না। তাঁর শিক্ষাযন্ত্র শিক্ষার পক্ষে একান্ত কি না—ইত্যাদি।

একটা কথা ভাবতে হবে। মন্তেসরী রোমের যে-ইস্কুলে কাজ ক'রে তাঁর

পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, অনুরূপ ইস্কুল অন্যান্য মহানগরীতে স্থাপন করা চলে কিনা। তিনি ইস্কুলে সারা দিনমান ছেলেদের রাখতে পারতেন—অর্থাৎ যতক্ষণ তারা জেগে থাকে ততক্ষণই মন্তেসরী তাদের কাছে পেতেন। ছেলেরাও আসত সাধারণত শ্রমিক শ্রেণী থেকে। আর আমাদের নগরে সাধারণত ছেলেদের রাখা যায় বড় জোর পাঁচ ঘণ্টা। কাজেই তাঁর ঐ পদ্ধতি এই অল্প সময়ে প্রয়োগ ক'রে তাঁর অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির আশা না করাই উচিত। তা ছাড়া, এখানে তো কেবল এক সমাজের ছেলেরাই আসে না! নানাকারণে তারা নানা মন এবং ক্ষমতা পেয়ে আসতে বাধ্য। কাজেই মন্তেসরীর পদ্ধতি যদি নিতেই হয়, তবে সমাজের চরিত্র অনুযায়ী তাকে শোধিত ক'রে নিতে হবে।

তাই বলে যে, মন্তেসরীর প্রথায় শিক্ষা দেওয়া চলবেই না সেকথা ঠিক নয়। বরং যে সব মহানগরী অত্যন্ত ঘিঞ্জী, যেখানে অত্যন্ত দরিদ্রশ্রেণী থাকতে বাধ্য, যেখানে গৃহ-পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা—সেখানে মন্তেসরীর মতবাদ এবং সে ধরণের ইস্কুল একান্তই প্রয়োজন। তাঁর অন্য যে কার্যপদ্ধতিই বাদ দেওয়া যাক না কেন, ঐ যে দুটি মূলনীতি আছে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনুশীলন—ঐ দুটি রাখতেই হবে।

সমাজ, গণতন্ত্র সমাজ, সামাজিকতা নিয়ে বর্তমান কালে হুলুস্থুল পড়ে গেছে, কিন্তু ব্যক্তিতাকে তো একেবারে চেপে দিলে সমাজ বাঁচবে না। কাজেই মন্তেসরীর সেই ব্যক্তিতাধর্মী আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যদি কিছু বা ঘাটতি থাকেই, তবু তাকে বরণ করা উচিত এই জন্য যে, দুটোকে মিলিয়ে নিতে যদি কোনদিন পারি, তবে শিক্ষার ধারাটি 'ধারাপাত' না হ'য়ে দেবতার আশীর্বাদ হিসাবেই দেশের উপর বর্ষিত হবে। তিনি তাঁর সমাজকে মানতে বাধ্য হয়েছেন, যুগকে মানতে বাধ্য হয়েছেন—কিন্তু সব কিছু মেনেও তিনি দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম ক'রে শিশুদের শিক্ষার এমন একটি ধারা দিয়েছেন যে, তাকে অনুসরণ করা কোন দেশের পক্ষেই তেমন কিছু কঠিন নয়।

॥ আমেরিকাতে ॥

নীহারিকা ঘুরছে, ছায়াপথ ঘুরছে, সূর্য ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, চন্দ্র ঘুরছে। এই অসীম অবিরাম বিচিত্র ঘূর্ণনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে পৃথিবীর বিশেষ জীবটুকু এই মানুষ। চতুর্মাত্রিক মহাশূন্যে তার স্থান কোথায় আর কতটুকুই বা। তার কোন দিক নেই, ঊর্ধ নেই, অধঃ নেই। আছে শুধু পৃথিবীর নিজস্ব বিপ্লবধারার অন্তর্বর্তী কালের মধ্যে ঘোরাফেরা। কিন্তু এই জীবটুকু আর একটি ঘূর্ণনের সৃষ্টি ক'রে নিল। এই ঘূর্ণন তার মানসিক রাজ্যে। ভাবলে অবাক হ'তে হয়, সে এই পৃথিবীতে যুগ যুগ ধ'রে বাস করছে। বাস করছে - কারণ, মনকে সৃষ্টি করেছে। তার সঙ্গীত আছে, কৌতুক আছে, শ্রম আছে, আদর্শ আছে, দার্শনিকতা আছে, ঈশ্বরও আছে। আছে তার প্রবঞ্চনা, জীবনসংগ্রাম, খাদ্যান্বেষণ, বংশবৃদ্ধির প্রবণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কোথায় এর সীমা জানি না, কিন্তু তার রহস্যটি একটি বস্তুর মতো রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ তাকে বাস্তবতার ব্যাখ্যায় নিতান্ত সরল ক'রে নিয়ে আসা যায় না।

আমেরিকার কথাই ধরুন। সেই লগ-ক্যাবিনের যুগ থেকে আজ সে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। যার হাতিয়ার বিহনে জীবন নিরাপদ ছিল না, সে আজ আমেরিকার ভূমিকে ধন-গৌরবে মহিমময় ক'রে তুলেছে; যে-ছিল ছন্নছাড়া, সে আজ গণতন্ত্রের বিশেষ আদর্শ তুলে ধ'রে জগতকে তাক লাগিয়ে দিল। যে ছিল সৈনিক, সে আজ জীবন গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই সন্ধিক্ষণের কথা তো বিনা ব্যাখ্যায় সরিয়ে দেওয়া যায় না! যার হাতে কিছুকালের জন্যও অত বড় মারণাস্ত্র ছিল, সে সেই পাশুপত অস্ত্রকে দ্বিতীয় বার ব্যবহার করেনি। অসংযমী ধনতন্ত্রের দেশ ধনলিপ্সার প্রচণ্ডতাকে হাতের কাছে পেয়েও সংযত করল। যে-জাতির সংস্কৃতি বলতে প্রায় কিছু নেই, সেই এগিয়ে

আসে সংস্কৃতি গর্বী প্রাচীন দেশের উলঙ্গ আক্রমণের হাত থেকে অন্যকে বাঁচাতে। যদি শুধু আমেরিকা হিসাবে একে দেখা যায়, তবে এই মানসিক রহস্যের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যাবে; কিন্তু যদি মানব-সমাজ হিসাবে এ দেশের অধিবাসীকে ধরা যায় তা হ'লে মানুষের মনের বিচিত্র বিকাশ, রহস্য, সৌন্দর্য, মনকে রমণীয় করবেই।

এই যে মানুষের মানসিক রহস্য, একে কি ইস্কুলের মধ্য দিয়ে বিকশিত করা যায়, ইস্কুলের শিক্ষায় এমন কি তৈরী করা যায়? জানি না এর উত্তর কি হবে। তবে যুগে যুগে মানুষ অল্প-অল্প ক'রে এমন শিক্ষাই দিতে চেয়েছে। পারেনি ব'লেই আবার সে শিক্ষা-সংস্কারে মন দিল। আমেরিকা অধীর হয়ে ইয়োরোপের সমস্ত রীতিকে বরবাদ ক'রে এত বড় মনকেই ইস্কুলের আওতায় ধরতে চাইল। সেইজন্য আমেরিকা ইস্কুল সম্পর্কে যত না ভেবেছে, তার চেয়ে বেশী ভেবেছে শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে। ইয়োরোপে আছে ইস্কুলের হাট, এখানে আছে পদ্ধতির অরণ্য। এই সব পদ্ধতির ব্যর্থতা আছে, থাকবেও সে জানে—তবু পদ্ধতি আবিষ্কারে সে কার্পণ্য করেনি। আমেরিকার শিক্ষাব্রতীরা ক্ষ্যাপার মতো পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে; খুঁজে বেড়ানোই তার কাজ নয়, খুঁজে পেতে চায় সে।

কিন্তু সমাজ তো একধরণের লোক নিয়েই গঠিত নয়। কাজেই বাধা যখন আসে মূল থেকেই আসে। এইখানেই আমাদের সমালোচনায় হয় অসুবিধা। সমাজের দীপ্তি আর সমাজ এক নয়; যেমন এক নয় চন্দ্রের প্রতিফলিত আলোক আর চন্দ্র-বস্তুটি। সমাজের মধ্যেকার শ্রেণী গঠন দিয়ে মনুষ্য-সমাজের কার্যধারাকে বোঝা যায় না। মানুষ অবশ্য উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত জীব, কিন্তু মনুষ্যত্ব তা নয়। 'মানুষ' শব্দটি থেকে 'মনুষ্যত্ব' এলেও, দুটি রূপের তফাৎ আছে। একথা বলবার উদ্দেশ্য শুধু এই, ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সামাজিক উদ্দেশ্য আমরা নিশ্চয়ই বিচার করব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, সেই উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্যই মানুষ শিক্ষানীতিতে থেমে থাকে না। আমাদের এই আলোচনা দু'টো দিকেরই সন্ধান নিয়ে চলবে।

প্রথম প্রশ্নই হবে—মানুষের মনের যখন এত বিস্তার, তখন মানুষ এমন

সঙ্কীর্ণ বিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারই সতীর্থকে দুর্দশায় ফেলে কেন? মানুষ কি মূলত অত্যাচারী? মানুষ যে মূলত উৎপীড়নকারী নয় তার প্রথম প্রমাণ, মানুষ মানুষের সাহচর্য ছাড়া চলতে পারেনা। সে যা কিছুই করে, ব্যবসায়ই হোক,আর বিজ্ঞানচর্চাই হোক—সমষ্টিগত ভাবে মানুষের জন্যই করে। মানুষকে দিয়েই তার ব্যবসা, মানুষকে দিয়েই তার গবেষণা, মানুষের মধ্য দিয়েই তার অসীম মনকে সে উদ্‌ঘাটিত করে। তবু কেন এমন হয়?

এ কথার বোধহয় একটা উত্তর এই যে, মানুষ সহসাই অভ্যাসের আবর্তে পড়ে যায়। এই অভ্যাস আসে তার যুগ-যুগান্তরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে। সে যেমন চলে, তেমনি সে অনড়ও বটে। কাল এবং স্থান তাকে সীমিত করে দেয়; আর সীমিত করে তার প্রাপ্ত মানসিক গঠন। আবার নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'য়ে সে জীবন-মান অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়-সত্য বা সৌন্দর্য বোধকে পরিবর্তন ক'রে চলে। কিন্তু এই পরির্তন এক লহমাতেই আসতে পারে না। সময়ের প্রয়োজন, স্থানের প্রয়োজন। এই জন্য, ধর্মগুরুদের নতুন মতবাদ গৃহীত হ'তে এত সময় নেয়, এত বাধা পায়। এই জন্যই দেশে দেশে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সমস্ত দিকের বোধের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এই যে পরিবর্তন করবার নীতি এ-ও অভ্যাসের সঙ্গে গাঁথা হয়, কারণ—সমাজের প্রচলিত এবং স্বীকৃত বস্তুর মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে আসতে হবে। মানুষের মনের এবং পরিবর্তনের চলতার এইটিই হচ্ছে স্থিরতার দিক। মুক্তি আর আকর্ষণ এই দুইটি সমস্ত সৃষ্টিরই মূলে; ঐ দুটির যখন সমন্বয় ঘটে তখনই একটা নির্দিষ্ট কক্ষ রচিত হয়, কক্ষপথে তার গতি থাকলেও নির্দিষ্ট যখনই হয়ে গেল, তখনই তাকে আমরা স্থির বলি। নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করাকেই আমরা বলব সম-ভাবের বা সংলগ্ন অবস্থার; আর তখনই সেটি সত্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা হলে কি সেই নির্দিষ্ট কক্ষের আর পরিবর্তন হয় না? হয় বৈকি, তবে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে, কারণ মানুষের মাপের সময় বড় অল্প, তাই ধীরে ধীরে; নতুবা ধীরে ধীরে কথাটায় অত ধীরতা নেই। পৃথিবীর আপন

গতিই তিনটি, নিজের ঘূর্ণনপথ দুটি, তার সঙ্গে অক্ষটির ঘূর্ণন। এই অক্ষের ঘূর্ণন আমাদের ধারণায় যত মন্থরই হোক মহাকালের মাপে মন্থর নয়; কারণ তার চেয়েও ধীরে সূর্যের আবর্তন ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘুরে, তারও কম ছায়াপথের ঘূর্ণন এবং স্থানান্তরণ। তবু এ গতিবেগ কম নয়। মানুষের মনের পরিবর্তনের গতিবেগও এই রকম। সূর্য পৃথিবীর চারপাশে না ঘুরে পৃথিবীটাই ঘুরছে, এই কথাটি বিশ্বাস করতেই মানুষের কতদিনই না লেগেছে!

এইজন্য যে সব ব্যক্তি ঠিক নির্দিষ্ট কালের আগেভাগে জন্ম নিয়ে আজকের সত্য কথা বলে গেছেন, তাঁদের কথা আমরা মানি নি, তাঁদের বলেছি —তাঁরা বড় বেশী আগে জন্মেছেন, তাই তাঁদের এই দুর্দশা। অর্থাৎ, 'পার যদি কেউ জন্ম না কো বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।' কিন্তু এমন জন্ম ও হামেসাই ঘটে।

আবার এই বিশ্বাস আর জ্ঞানের সীমায় বাঁধা না পড়লেও চলেনা। কারণ এই সীমাই আমাদের বলে দেয়, কি আমাদের করতে হবে, কেমন ক'রে করতে হবে, চিন্তাকে কোন্ দিকে সমৃদ্ধ করব। ব্যবহারিক জীবনে ঐ বিশ্বাস আর জ্ঞানের সীমা থেকেই নৈতিক এবং সামাজিক আইন-কানুন রচনা ক'রে নিই। এই বিশ্বাস আর জ্ঞানের সীমাই হচ্ছে আমাদের দিগদর্শন যন্ত্র।

জীবনের বাস্তবতাই এই সীমাকে টেনে দেয়। আর সেই বাস্তব জ্ঞান এবং বস্তু-মাধ্যম আমাদের চক্রের মতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আমাদের আহ্নিক গতি আর বর্ষিক গতি হয়, আমাদের ঋতু পরিক্রমা হয়, সমাজের ফসল ফলে।

কাজেই আশু লব্ধ যে-বস্তুর সান্নিধ্যে আমরা আসি, তা আমাদের মনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে, অভ্যস্ত করে। আর সেই বস্তুর সান্নিধ্যের আশায় আমরা মন থেকে পিছ-পা হ'য়ে তার দিকে ছুটে যাই। বস্তু পাই কি না, জানি না; কিন্তু মানসিকতার আকর্ষণ আমাদের অশান্তি এনে দেয়, অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

তাই অনেকে বলেন, মানুষ চিন্তা এবং প্রত্যয়-জ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ করে না. করে সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে বাস করতে করতে। আর এই জন্য জীবনের এত জয়গান ; জীবন অর্থ, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী আর সুসভ্য নাগরিকের তার থেকে বিচ্যুতি বা উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবধানের পরিমাপ। এইজন্য সমাজকে বাদ দিয়ে শিক্ষা লাভ হয়না. দর্শন হয় না, আইন কানুন হয় না। আমেরিকার বর্তমান শিক্ষানীতিতে তাই দেখতে পাই—সমাজীকরণের দিকে যত নজর, অন্য কিছুতে তত নয়। তার ইস্কুলের পাঠ-পদ্ধতির মধ্যে এই মূল সুরটি লক্ষ্য করবার মতো। হয়ত, এ মনোভাব তাদের হঠাৎ পাওয়া নয়, হয়ত অন্য দেশের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে তারা এসব পেয়েছে, কিন্তু তারা যে এ বিষয়টিতেই একান্তভাবে জোর দিল সে কথা ভুলবার নয়।

জোর দেওয়া অর্থে বলছি—প্রচেষ্টা। কারণ প্রচেষ্টার মধ্যে আছে সংগ্রামের সুর। সংগ্রাম হচ্ছে, ইতিহাসের এবং দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ।

প্রধান সম্প্রদায় হচ্ছে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়। এদের জীবন-নীতি কি, বিশ্বাস কি ? এক কথায় ব্যবসায়ের কায়েমী স্বার্থ,যে স্বার্থ মনকে পোষাকী ক'রে দেয়, কৃত্রিম গৌরব এনে দেয়। কৃত্রিমতা যত ন্যক্কার-জনকই হোক, তার সঙ্গে গৌরব যদি এসে হাত মেলায়, তবে তাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। সেই গৌরব থেকে জাত হয় বিচিত্র রকমের অভ্যাস। এই অভ্যাসকেই বলব কায়েমী-স্বার্থের অভ্যাস, যা ছিল মিশরে লিপিকারদের, গ্রীসে অভিজাতদের, খৃষ্টান যুগে ধর্ম-যাজকদের, মধ্যযুগে রাজাদের, তারপর শিল্পপতিদের, আর পরিশেষে রাজনীতিজ্ঞদের।

ব্যবসায়িকদের রীতি হচ্ছে, লাভ করা। লাভ আসে বস্তু বিক্রয় থেকে। কাজেই বস্তুর সত্যকার মূল্য থেকে বিক্রীর মূল্য উঁচুতে রাখা প্রয়োজন। তা করতে হলে, প্রচুর মাল সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিতে হয় ; শুধু তাই নয়, চাহিদার মনোবিকার তৈরীও করতে হবে ; ক্রেতাদের মনে ক্রয় করবার বাসনাকে যেন তেন প্রকারে বাড়িয়ে দিতে হবে ; তাদের মধ্যে কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করতে হবে। এর সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে, অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে

কারবার করা। এই বস্তুটির একটি নির্ধারিত উৎপাদন হার থাকবে। নির্ধারণ যে-নীতিতে করা হয় তা হচ্ছে, যোগান চাহিদার চেয়ে কম হবে।

এমনি নীতি হচ্ছে বণিকদের। তারা টাকা করতে চায়, মাল তৈরী করতে নয়। মাল তৈরী হয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, আর টাকা তৈরী হয় বিক্রয়ের মাধ্যমে। কাজেই সবচেয়ে বেশী টাকা হয়, কখন ? না, যখন 'কিছু-নাই' থেকে 'অনেক কিছু' পাওয়া যায়, (The highest achievement in business is the nearest approach to getting something for nothing--Veblen)।

কাজেই উৎপাদন যখন কম করাই নীতি, তখন দেশে বেকার-সমস্যা বজায় রাখা এদের প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিচালনায় বেকারত্ব বজায় রাখা একটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিশেষ (Unemployment is an ordinary and normal phenomenon—Veblen)। কাজেই ব্যক্তিগত ব্যবসায় হচ্ছে,—ব্যবসা কর, কারখানা বেশী খুল না অর্থাৎ খুলতে দিও না।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে 'কিছু নাই' থেকে 'কিছু', অর্থ ? ব্যবসায়ে কোন খরচ নেই ? তা কিন্তু নয়, এই কায়েমী-স্বার্থ বজায় রাখতে ব্যযবাহুল্যই ঘটে। কায়েমী-স্বার্থ হচ্ছে, বস্তুনিরপেক্ষ ধন, এবং অপ্রত্যক্ষ সম্পত্তি। এই ধন আর সম্পত্তির উৎস 'ভেবলেন' তিনটি ভাগে ফেলেছেন : (১) যোগান কমাতে হবে যাতে লাভে বিক্রী করা যায়, (খ) সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে লাভে বিক্রী হয়, (৩) আড়ম্বরপূর্ণ প্রচার করতে হবে বেশী লাভ করবার জন্য। এগুলো হচ্ছে বিক্রেতার নৈপুণ্য, উৎপাদনকারী বা শ্রমিকের নৈপুণ্য থেকে এদের উৎপত্তি নয়। কাজেই বলা যায়, উৎপাদনের নীতির উপর এই কলাকৌশল দাঁড়িযে নেই, দাঁড়িযে আছে বিক্রয়কারীর নীতির উপর। আমেরিকার শিক্ষানীতির মধ্যে বুদ্ধির বিকাশের যে একটা ধারা আছে, তার মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের অসাধু উদ্দেশ্যকে ধরতে পারবার মতো বুদ্ধি শিক্ষার্থীর আছে কিনা তা দেখতে চেষ্টা করা।

এই যে অভ্যাস—এই অভ্যাসের মধ্যে স্বাবলম্বন সম্পর্কে যত কথাই থাকুক, সাধারণের প্রতি সদিচ্ছা এতে থাকতে পারে না। এই মনোবৃত্তিটি বুঝতে হ'লে সমাজের নেতৃত্ব দরকার; আর নেতার মতো মনকে তৈরী করানোর জন্য

আমেরিকার ইস্কুলের শিক্ষায় একটি বড় উদ্দেশ্য। আমেরিকায় এই ধণিকদের আধিপত্য অত্যন্ত বেশী।

কেবল তাই নয়, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সংখ্যালঘু আরও অনেক সম্প্রদায় আছে। সেখানেও বৈষম্য কম নয়। সাধারণত এই বৈষম্য-সমস্যাকে আমেরিকা ভূমিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; (১) নিগ্রো সম্প্রদায়, (২) ধর্মীয় বিভেদ—য়িহুদীদের বিরুদ্ধে, (৩) কৃষিজীবীদের সম্পর্কে বৈষম্য—কারণ এই সম্প্রদায়কে অনেক খানি নির্ভর করতে হয় শিল্পপতি আর আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন শ্রেণীদের উপর। অনেকে বলেন, এগুলো দক্ষিণ আমেরিকার সমস্যা; কিন্তু এ সমস্যা উত্তরাঞ্চলেও সংক্রমিত হ'য়েছে। তাছাড়া সমস্ত সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও একটা ফাটল আছে—এই ফাটল আসছে আর্থিক সঙ্গতি আর অনটন থেকে; যারা অনটনের মধ্যে, তারা যে কেবল হীনস্বাস্থ্যতাতেই ভুগছে তা নয়, দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের দুরবস্থার অন্ত নেই। কেন এমন হয়? রাস্কিন তার উত্তর দিয়েছেন: 'মানুষকে হয় তুমি যন্ত্র তৈরী করতে পার, অথবা মানুষ; দুটি একসঙ্গে করা যায় না। মানুষ যন্ত্রের মতো নির্ভুল কাজ করতে পারে না, তাদের কাজে-কর্মে অসঙ্গতিকে বর্জন ক'রে উঠতে পারে না; যদি তাদের এই অসঙ্গতি দূর করে নির্ভুল হিসাব করে কাজ করতে বলো—তা হ'লে তাকে আগে অমানুষ করে দিতে হবে।' এই অমানুষের সংখ্যা আমেরিকার ভূখণ্ডে কম নয়। আর অমানুষ কেমন ক'রে ব্যুমেরাঙের মতো নিজদের আক্রমণ করে, তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দক্ষিণের অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব। তাঁরা সহজেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের উত্তরে পাঠিয়ে কলেজে পড়াতে পারেন। কিন্তু তা তাঁরা করবেন না; কারণ তাঁদের ভয়, তাহ'লে উত্তর থেকে দাসত্ব-প্রথা বিরোধী মনোভাব অর্জন করে বসবে। কাজেই দেখা গেছে, ১৮৫০ সালের আদম সুমারীতে—দক্ষিণে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, সেখানে ভালো গ্রন্থাগার পর্যন্ত নেই; এমনকি শ্বেতাঙ্গদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও প্রতি দশজনের একজন মাত্র ইস্কুলে পড়তে পায়। সেখানে নিগ্রোদের ইস্কুল থাকা তো একরকমের অপরাধ ছিল। সেখানকার নিগ্রোদের চার্চের উপরও শ্বেতাঙ্গেরা কড়া পাহারা দেয়। এমনি ক'রে নতুন যুগের মানুষ তার চার্চকেও

ভয় পেতে শিখল। পাছে মানুষ্যত্বের ছোঁয়াচ তারা লাগিয়ে বসে; আর, চার্চও এখানে সত্যের পূজারী হয়ে এগিয়ে আসছে। মানুষের রাজ্যের এই খেলাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে কি উপায় আছে!

অন্তর্যুদ্ধ ঘটেছিল বৈকি! কিন্তু তাতে উৎপাদন শক্তির যে উন্নতি ঘটানো হয়েছিল, অন্য কোন দিকে সে উন্নতি আসতে পায় নি। লাস্কি সেই জন্য বলেছেন—দক্ষিণাঞ্চল যেন নিগ্রোদের কারাগার বিশেষ, সর্বপ্রকারে তাদের প্রবঞ্চিত করা হয়। কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা, সব কিছুতেই (He is exploited as citizen, as consumer, as producer. Whatever institution can be operated as to effect his being driven to a consciousness of inferioity and a sense of hopelessness, they are operated. Even for the educated or wealthy Negro the south is a prison.—The American Democracy : Laski.)।

১৯১১ সালেও এফ. টি. মার্টিন স্পষ্ট কথা বলেছেন, "কোন্ রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতায় বসবে, কি কোন্ প্রেসিডেণ্ট শাসন-রজ্জু ধরবে—তাতে বিন্দুমাত্রও আসে যায় না। আমরা রাজনীতিজ্ঞও নই, চিন্তা-নায়কও নই। আমরা ধনী সম্প্রদায়, আমরা আমেরিকাকে অধিকার করেছি; আমরা তা পেয়েছিও। ঈশ্বর জানেন, কেমন ক'রে এসব আমরা পেলাম; কিন্তু পেলাম যখন, তখন তা বজায় রাখতেই হবে—যেমন করেই হোক; আমাদের বিরাট সমর্থনশক্তি এক দিকে চালিয়ে, আমাদের প্রভাব খাটিয়ে, আমাদের টাকা খাটিয়ে, আমাদেরকে রাজনৈতিক সংস্পর্শে জড়িয়ে, আমাদেব কিনে-নেওয়া সেনেটরদের দিয়ে, আমাদের ক্ষুধিত কংগ্রেসের নায়কদের বশ ক'রে, জনসাধারণের বক্তৃতা-বাগীশদের হাত করে—যে ক'রেই হোক এসব আমাদেব বজায় রাখতেই হবে।" এমনি ক'রে ক্ষমতাব গৌরব নিযে মানুষ অভ্যস্ত পথে চলতে চেয়েছিল।

শুধু এই মাত্র নয়। আমেরিকার অধিবাসী লাতিন-গ্রীককে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল, কারণ ঐ ভাষা দুটিতে নাকি স্মৃতির উন্নতি ঘটায়। থর্ণডাইক

বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ে দিলেন—সে কথা সত্য নয়। আলোচনা চলতে থাকল, পরিবেশ-শক্তি বড় কি উত্তরাধিকারী সূত্র বড়; গবেষণা হল—কোন্ ধরণের পরীক্ষা-পদ্ধতি ভালো। এমনি নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে আমেরিকাকে পথ ক'রে চলতে হয়েছে। আমেরিকার শিক্ষাব্রতীরা যথেষ্ট ভেবেছেন—কি ক'রে গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা দেওয়া যায়; এ ধরণের শিক্ষা তখনই সম্ভব যখন নতুন ধরনের সমাজ গঠিত হবে। এই পরিবর্তিত সমাজকে কি আমেরিকা লাভ করেছে? তাঁরা বলেন, না লাভ করিনি—তবে ব্যর্থ হয়েছি কিনা সে হিসাব নেওয়ার সময়ও আমাদের আসে নি, আমরা সেই পরিবর্তিত সমাজ পেতে চাই, এই মাত্র বলতে পারি। আবার অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই স্বীকার করেন; এঁদের মধ্যে কিলপ্যাট্রিকের উক্তি প্রণিধান-যোগ্য, "আমাদের গণতন্ত্রের ধারণা অনেকটা অতীতের সঙ্গে যুক্ত আর খানিকটা বর্তমান অবস্থা থেকে পাওয়া, তার ফলে আমাদের গণতন্ত্রের সম্মানজনক দার্শনিক বিচার আদৌ হয় নি (Our notion of democracy is in part a hang-over from the past and in part a product of modern conditions, which means that we have no respectable philosophy of democracy at all—Kilpatrick.)।

এই ব্যর্থতার কারণ জর্জ কাউণ্টসের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়। 'বর্তমান আকারের যে পুঁজিবাদ আছে তা কেবল নির্দয় এবং অমানুষিকই নয়, এ রূপটি অপচয়ের এবং অকর্মণ্যতারও বটে।'

লাস্কি আমেরিকার ইস্কুল দেখে এর প্রতিকার সম্পর্কে গুটিকতক কথা বলে গেছেন। হয়ত সব দেশের পক্ষেই সে কথা ভাববার বলে কিছু অংশের মর্ম তুলে দিচ্ছি। লাস্কি বলেছেন,

'১৫ থেকে ১৯ বছরের যে সব তরুণেরা ইস্কুল ছেড়ে বেরোচ্ছে তাদের এমন বিশেষজ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, প্রয়োজনও নয়, যাতে তারা শ্রমিকের বাজারে এসে আশু শ্রম বিক্রয় করতে পারে, আর এইভাবে এখানে তাদের কর্ম-অবসর কাল পর্যন্ত থাকতে হবে। তাদের প্রয়োজন কি? জগৎ-সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা, অন্যের সাহচর্যে বাস করতে

শেখা, পৃথিবীর সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে বোধ থাকা, আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজদের চলতে-ফিরতে পারার মতো অন্তর্দৃষ্টি থাকা। কিশোর বয়সে অপরিণত বয়সে এই যে কোন বিশেষ দিকের বিশেষ জ্ঞান, বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া, এর মতো চরিত্র বা মানসিক ধ্বংসাত্মক আর কিছু থাকতে পারে না।

'সাধারণ অর্থনৈতিক আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেয়ে বেশী জ্ঞান দিয়ে কোন উপার্জনের ক্ষমতা অর্জিত করানোর মতো ইস্কুলের ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতি আর নেই। আমেরিকার পাবলিক ইস্কুলে শিক্ষার আধুনিক উপকরণ যথা, রেডিও, সিনেমা, অন্যান্য চার্ট এখনও দুষ্প্রাপ্য; শিক্ষকদের মাইনেও তুলনায় এত কম যে, ভালো লোক এখানে আসে না।

'বুদ্ধির যে-কয়টি সাধারণ উপকরণ—পড়া, বলা, লেখা, অঙ্ক কসা—তার ঠিকমত চর্চা করাই তো হচ্ছে না এখানে। এমনও তো দেখা গেছে, ১৯ বছরের ছেলে একখানা পুস্তক সম্পূর্ণ ক'রে পড়তে পারেনা, যুক্তি দিয়ে একটি ভালো রচনা লিখতে পারে না, গ্রন্থাগারের ব্যবহার তো একেবারেই কম। গরীবের ছেলেরা তো বই পত্তরই পায় না। আর পাঠ্য-সূচীর বহরও বড় বেশী, সে সবের মধ্যে না আছে বাঁধুনি, না আছে সংলগ্নতা কেমন যেন খাপছাড়া গোছের। কোন কোন রাজ্য শিক্ষাকে এমন জবর শাসনের আওতায় এনে ফেলেছে, শিক্ষকদের এত বেশী করণিকের কাজ করতে হয় যে, তাতে তারা না পায় সময়, না পায় আগ্রহ, আবার কতগুলি রাজ্যে এগুলির পরিচালনায় মনোযোগ এতই কম যে,ঠিকমতো ইস্কুল চলছে কিনা তার হিসাবও রাখে না। নিউ ইয়র্কের মতো অঞ্চলেও একঘর, দুইঘরের ইস্কুলের এত প্রাচুর্য যে, শিক্ষকেরা সঙ্গীর অভাবে মনমরা হয়ে থাকেন, বাসের উপযুক্ত ঘরও পান না। শিক্ষকদের তো ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া উচিত, গবেষণার সুযোগ দেওয়া উচিত! শিক্ষকদের উপর বিধি নিষেধও কম নয়। তাঁরা তো ধর্মমত রাজনৈতিক মতবাদ এবং নিজদের আচরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে রীতিমত ভয়ে ভয়ে চলেন।'

লাস্কি এমনি ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমেরিকার ইস্কুল-ব্যবস্থাকে দেখে

গেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকারও করেছেন—আমেরিকার অধিবাসী সত্যিই কর্মপাগল, নিষ্ঠাবান এবং ব্যবহারিক-জ্ঞান বৃদ্ধির অভিলাষী। হয়ত তাদের বিদ্যার গভীরতা নেই, কিন্তু সে বিদ্যার সামাজিক বিস্তৃতি আছে।

আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার এই ত্রুটির কথা কেবল যে লাস্কিই বলেছেন তা নয়, আমেরিকার শিক্ষবিদ জে. এল, মার্সেল (J. L. Mursell)-ও ১৯৪৩ সালে এই কথাই বলেছেন। তাঁর কাছে কয়েকটি সমস্যা—সবচেয়ে বেশী ছেলে যেখানে সেখানেই সবচেয়ে কম টাকা। যেমন ধরুন—উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাতির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছেলেমেয়ে, আর জাতীয় আয় সেখানে ৪৩%, সুদূর পশ্চিমে ছেলেমেয়ে ৫% কিন্তু আয় ৯%, মধ্য-পশ্চিমে ছেলেমেয়ে ২৬%, আয় ২৮%, উত্তর-পশ্চিমে ছেলেমেয়ে ৬%, আয় ৫%। দ্বিতীয় সমস্যা প্রতি ১০০০ বয়স্কের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের অনুপাত সংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ৬৪। যে-অঞ্চল সবচেয়ে উর্বর সেখানে শিক্ষাখাতে ব্যয় সবচেয়ে কম অথচ ছেলেমেয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সহর আর গ্রামের মধ্যেও এই রকম বৈষম্য। আমেরিকার গ্রামগুলিতে জাতির ছেলেমেয়েদের প্রায় অর্ধাংশ রয়েছে; আবার শান্তির সময়ে এদের মধ্যে অর্ধেক সহরে এসে যায়, অথচ সহরে ছেলেদের সংখ্যা কম; কাজেই ধ'রে নেওয়া যায় আমেরিকার সমগ্র জাতীয় জীবনে গ্রামের ইস্কুলের প্রভাব বেশী পড়বে। অথচ গ্রামের ইস্কুলের অবস্থা যেমন কোথায়ও ভালো, তেমনি কোথাও অত্যন্ত খারাপ। গ্রামেই তো এক-ঘর, দুইঘরের ইস্কুল বেশী।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে—আমেরিকার অধিবাসীরা বড় বেশী সচল; এক যায়গা থেকে আর-এক যায়গা চলে যায়। হয়ত অর্থনৈতিক কারণেই তাদের এই প্রবণতা। সমাজের স্থিতিস্থাপকতা না-থাকলে, বাঁধুনি না থাকলে—শিক্ষাও যেমন বিশেষ নিয়মে চলতে পারে না, ছেলেদের চরিত্রেও তেমনি দৃঢ়তা আসতে পারে না।

চতুর্থ সমস্যা হ'ল—নিগ্রো সমস্যা। নিগ্রোদের সমস্যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু জাতির চরিত্রে এই সমস্যা কেমন প্রভাবিত করে—তা বুঝবার

জন্ম কয়েকটি হিসাব জানা দরকার। যেমন ১৯৪০ সালে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছিল—১১৮, ২১৩, ২৮৭. আর নিগ্রোদের সংখ্যা ১৩,৪৫৫, ৯৮৮। প্রায় এগারো ভাগের এক ভাগ। এরা দক্ষিণ থেকে ক্রমাগত উত্তরে চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৩০ সালে এই সংখ্যার ২৯% ভাগ এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলে, তার মধ্যে ৮৮% ভাগই থাকে সহরে। আবার এই নিগ্রোর ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ অষ্টম-মানের উপর লেখাপড়া শিখতে পায়। অনেক যায়গায় তা-ও নয়।

সমস্যার কথা এ-ভাবে আলোচনা করতে হ'ল শুধু আমেরিকার সামাজিক নীতি, শিক্ষানীতি বুঝবার জন্ম। এরপর আমরা শুধু আমেরিকার ইস্কুল-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব; কিন্তু এই সমস্যাগুলির কথা মনে রাখলে বুঝতে পারব—আমেরিকা ইস্কুলের শিক্ষায কেন তাদের আশানুরূপ ফল পাচ্ছেনা, আর ফল পাচ্ছেনা ব'লেই থেমে থাকছে না কেন? তাদের যে ফল পেতেই হবে—নতুবা সমস্ত জাতি, সমস্ত শিক্ষা তাদের ভেঙে পড়বে। এই জন্ম, তারা শিক্ষাসংক্রান্ত নানা পরীক্ষা অকৃপণ ভাবে এবং মহা উৎসাহে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সমস্যার পৃষ্ঠপটেই তাদের ইস্কুলকে দেখতে হবে; অন্য কোন দেশে যদি এই সমস্যা না-থাকে তবে তারা দৌড়চ্ছে ব'লেই সে দেশের লোকদেরও দৌড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমেরিকার সমস্যার বিস্তৃত রূপ ব্যাখ্যা চলতে পারে না, তবু প্রতি দেশের শিক্ষাব্রতীদেরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সমস্যা আলোচনা করা দরকার।

আমেরিকার ইস্কুল-ব্যবস্থাকে বুঝবার জন্ম গোড়ার দিকে শিক্ষা-ইতিহাসকে চারটি যুগে ভাগ ক'রে নেওয়া যাক।

প্রথম— ঔপনিবেশিক যুগ—১৬০৭-১৭৫০ সাল পর্যন্ত

দ্বিতীয়— যুগসন্ধিক্ষণ— ১৭৫০-১৮৫০ ,, ,,

তৃতীয়— বৃদ্ধির যুগ— ১৮৫০-১৮৯০ ,, ,,

চতুর্থ— প্রসারণের যুগ— ১৮৯০—বর্তমান সময় পর্যন্ত।

প্রথম যুগে ধর্মের সহায়ক হিসাবে শিক্ষাকে গণ্য করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইয়োরোপের 'কর্তার ভুত' চলতে থাকল। পড়বে কেন? না, ধর্মসূত্র বুঝবার

জন্য। শিক্ষার চরিত্র এর ফলে তিন রকমের দাঁড়াল: (১) স্থানীয় চার্চের চরিত্র, (২) দরিদ্রদের ইস্কুল, (৩) আবশ্যিকতা।

প্রথম চরিত্রটির মধ্যে দেখা গেল, চার্চ এবং স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় ইস্কুল চালানো হবে, রাষ্ট্রের সাহায্য তারা পাবে না, রাষ্ট্রের বিধিও তারা মানবে না। দ্বিতীয় চরিত্রেও ইস্কুলের বেসরকারী বা চার্চের কর্তৃত্ব থাকল, তবে রাষ্ট্র এখন চায় যে অনাথ শিশুদের শিক্ষা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, আর তারা যেন কতগুলি দরকারী ব্যবসায়-বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। তৃতীয় চরিত্রস্তরে—চার্চ এবং রাষ্ট্র সমান অংশীদার হল। রাষ্ট্র কতগুলি নিয়ম কানুন করল—বিশেষ করে নাম করতে হয় ম্যাসাস্যুসেট্‌সের ১৬৪২ এবং ১৬৪৭এর আইনের কথা। এই আইনে অধিবাসীকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতেই হবে—নতুবা জরিমানা দিতে হবে। এই দুটি আইনেই শিক্ষা-কর ধার্য করবার অধিকার রাষ্ট্রের থাকল (ম্যাসাস্যুসেটস), আর প্রাথমিক জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর ইস্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকল—রাষ্ট্র অবশ্য এই কারণে অধিবাসীর কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবে।

প্রথম যুগের প্রথম দিকে লেখাপড়া বাড়ীর মধ্যে চলত, গৃহের পরিবেশে। বৃদ্ধা মহিলারা পড়াতেন (Dame Schools), কিছু কিছু শিক্ষানবিশীর কাজ করানো হ'ত। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বোস্টন লাতিন ইস্কুল স্থাপিত হয়—তারপর ক্যাম্ব্রিজ কলেজ, পরবর্তী কালে এই কলেজের নামই হ'ল—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। নামকরণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, তাঁরা অতীত দেশের স্মৃতি ভুলতে পারছেন না। এ সব ইস্কুলে যে ভালো ভাবে পড়ানো হ'ত—তা কিন্তু নয়। এখনও সমাজ স্থিতি লাভ করে নি, কাজেই সমাজের এই চরিত্র ইস্কুলের শিক্ষাতেও প্রতিফলিত হ'তে থাকে। কাজেই ধর্ম-ই এই সমাজের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য এগিয়ে আসে। ইস্কুলের শিক্ষায় তাই ধর্মের প্রভাব স্বীকৃত হ'ল। ১৬৪২এর আইনেও প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—ধর্মসূত্র বুঝতে পারা, এবং রাজ্যের আইনের সাধারণ নীতি পড়তে পারা।

এই যুগের আর-একটা দিক লক্ষ্য করবার। ধনী-ছেলেরা বাড়ীতেই লেখাপড়া করত, তবে সময়-সময় তারা ইস্কুলে এসে দরিদ্রদের সঙ্গে পড়ত বটে,

কিন্তু মেলামেশা খুব একটা করত না। উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ খুব কম লোকেরই ছিল।

এরই পাশাপাশি অনেকগুলি দিনের এবং সন্ধ্যাকালের ইস্কুল খুলে দেওয়া হ'ল। এখানে পদস্থ কর্মচারীদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী না মেনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় পড়ানো হ'তে থাকল—যেমন; পড়া, লেখা, অঙ্ক কসা, হিসাবরক্ষণ, নৌবিজ্ঞান, পাকপ্রণালী, ফরাসী ভাষা, সীবনবিদ্যা—ইত্যাদি।

১৬৪৭এর আইনে ছিল, ৫০জন গৃহস্থ যেই সহরে সেখানে অন্তত একটি প্রাথমিক ইস্কুল খুলতে হবে; ১০০জন গৃহস্থ যে সহরে, সেখানে একটি গ্রামার ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এই গ্রামার ইস্কুল অনেকটা কলেজ-পাঠ প্রস্তুতির বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

প্রাথমিক ইস্কুলের কোন সার্বজনীন রূপ ছিল না, না পরিচালনায়, না পাঠ্যসূচীতে। দক্ষিণ এবং মধ্য প্রান্তের প্রাথমিক ইস্কুলগুলো ছিল বিনা-বেতনের, নিউ ইংল্যাণ্ডে বেতন দিতে যারা সক্ষম তাদের কাছ থেকে নেওয়া হ'ত, যারা পারত না তাদের বেতন পৌরসভা দিত, বড়লোকের ছেলেরা ব্যক্তিগত বেসরকারী ইস্কুলেই পড়ত বেশী। পড়ানোর কাজ পাঠ্যসূচী হিসাবে প্রধান, লেখা সর্বজনীন নয়, অঙ্ক উপেক্ষিত। পড়ানোর উপর জোর, কারণ ধর্মসূত্র পড়াই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কাজেই শিক্ষার রাজ্যে এ যুগে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ছিল (এখনও আছে কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ভাবে), শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা বর্বরোচিত।

গ্রামার ইস্কুলের গঠন-প্রকৃতিতে ইয়োরোপের ছাপই ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল ভর্তি বিষয়ে প্রবঞ্চনা আর ছলচাতুরীর আশ্রয়।

দ্বিতীয় যুগে চার্চ-নিয়ন্ত্রণ কমে গিয়ে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেল। দরিদ্রদের ইস্কুল উঠে গিয়ে কর-সমর্থিত (tax supported) ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কেবল তাই নয়, প্রশাসনিকের জন্য রাষ্ট্রের শিক্ষাকর্মচারীও নিযুক্ত হ'ল। নিউ-ইয়র্কে ১৮১২ সালে প্রথম প্রধান স্টেট-স্কুল অফিসার নিযুক্ত হলেন। ১৮৩৭এ ম্যাসাসুসেটস প্রথম 'স্টেট্ বোর্ড অব এডুকেসন' স্থাপন করল। এই বোর্ড একজন সেক্রেটারীও নিয়োগ করল; তাঁর কাজ অনেকটা স্টেট্-স্কুল

অফিসারের মতো ; বোর্ডকে তিনি ইস্কুল সম্পর্কে অবহিত করবেন, সেই খবর যাবে আইন সভায় এবং লোকের প্রতিনিধিদের মধ্যে। এই বোর্ডের প্রথম সেক্রেটারী হ'লেন আমেরিকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হোরেস্ ম্যান্ (Horace Mann)। ১৮৫০ সালে ৩১টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি রাজ্যে পদাধিকার বলে স্টেট-স্কুল-অফিসার নিযুক্ত হ'লেন, ৭টি রাজ্যে এঁরা নির্বাচনের ভিতর দিয়ে নিযুক্ত হ'লেন। এঁদের কাজ হল, ইস্কুল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, ইস্কুল-বিধির ব্যাখ্যা করা, আঞ্চলিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া। ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা এঁদের হাতে এসে যেতে লাগল। এই যুগের শিক্ষানীতির মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) অবৈতনিক এবং সর্বজনীন শিক্ষা পাওয়া রাজ্যের সমস্ত ছেলেদের পক্ষেই জন্মগত অধিকার, (২) ধর্মীয় আলোচনা ইস্কুল থেকে বহিষ্করণ।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এই দ্বিতীয় যুগেই ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়া একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এইটিই ছিল নতুন ধরণের ইস্কুল। মামুলী ধরণের ইস্কুলকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি ফিলাডেলফিয়াতে এসে মুদ্রাকর, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের উৎসাহিত করলেন। তারাই এই নতুন ধরণের ইস্কুলের জন্য আন্দোলন সুরু করল। তিনি তাঁর ইস্কুলে প্রাচীন ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা রেখেও নতুন এবং আধুনিক কালের উপযোগী বিষয় সন্নিবিষ্ট করলেন, যেমন—ফরাসী, জার্মানী, ইংরেজি গ্রামার, ছন্দ-অলঙ্কার এবং সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান। মাধ্যমিক ইস্কুল পর্যায়ে এই ইস্কুলই লাতিন গ্রামার ইস্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। আর তারপর থেকেই বেসরকারী ইস্কুলগুলোতে এইসব বিষয় পড়ানোর ধুম লেগে গেল। কাজেই শিক্ষা পরিচালকেরা এই ধরণের ইস্কুলকে অনুমোদিত করতে বাধ্য হ'লেন। অনুমোদন না করে তো উপায়ও ছিল না। এই ইস্কুল জনচিত্তে প্রচণ্ড সাড়া আনল। উনবিংশ শতাব্দীর ইস্কুলেও এর প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়।

১৭৭৬ সাল থেকে আমেরিকার সমাজে দুটো পরিবর্তন ঘটল—এ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অব্ নেশনস' পুস্তক প্রকাশে এবং আমেরিকা

উপনিবেশ প্রধানভূখণ্ড অর্থাৎ ইয়োরোপের হাত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করায়।

আমেরিকা এবার রাজনীতি এবং সমাজনীতির সমস্যা নিয়ে না ভেবে ভাবতে সুরু করল কি ক'রে বেশী অর্থ উপায় করা যায়। কাজেই শিক্ষার-ক্ষেত্রেও তার ধাক্কা এসে পৌছল। এই সময়কার গণতন্ত্রকে আমেরিকার শিক্ষাবিদ পরিমাণ-গত গণতন্ত্র (Quantitative democracy) বলেছেন।

১৮২০ এর পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকার ইস্কুলের অবস্থা ভালো ছিল না। সন্তানের অনুপাতে ট্যাক্স দিয়ে ইস্কুলকে পোষণ করতে লাগল অভিভাবকেরা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দেশ তো! একজন অন্যজনের প্রজনন-পরিমাণের জন্য দায়ী হবে কেন? ফলে ইস্কুলের আয় বেশ কমে যেতে লাগল। লেখাপড়া নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে গেল; প্রয়োজন বোধ কর পড়াও, খরচ কর। টাকা নেই তো এ মুখো হইও না! রাজ্য ভাণ্ডার থেকে খুব বেশী সাহায্য করা হ'ত না।

ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রভৃতি মনীষীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিক্ষা সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনও দেশে যথেষ্ট আছে। সানডে ইস্কুল, ল্যাঙ্কাস্টার বা মনিটরিয়াল ইস্কুল, লিসিয়াম (Lyceum) প্রভৃতি দেশের লোককে যেন খোঁচা দিতে লাগল। এই সময় সাধারণের ইস্কুল প্রবর্তন বিষয় নিয়ে সংগ্রাম সুরু করলেন হোরেস্ ম্যান্, হেনরি বার্নার্ড। কিন্তু টাকার পরিমাণ নিয়ে যে-দেশ ভাবতে সুরু করেছে তার কাছে মানবিকতার আদর্শ তত কার্যকরী তো নয়। হোরেস ম্যান-ও এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন করবেন ব'লে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

শিশু-শ্রমিকদের দুর্বিষহ কাজই হোরেস ম্যানকে ক্ষিপ্ত করে দেয়। ১১ ঘণ্টা ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে হ'ত তাদের। আর শ্রমিকদের $\frac{২}{৫}$ ভাগই হচ্ছে শিশু-শ্রমিক। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেই হোরেস ম্যান এবং অন্যান্য মানবিকতাবাদী মনীষীরা একজোট হ'লেন।

হোরেস ম্যান প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের মতো তাঁর অভিযান চালালেন। কারণ তিনি মস্তিষ্ক-বিদ্যায় (Phrenology) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস

করতেন, মানুষের মন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কতগুলি গুণের (faculties) সমষ্টি মাত্র। কাজেই অসুস্থ চিন্তা ধারাকে উৎপাটিত করা জাতীয় জীবনে সম্ভব নয়, তবে ধীরে ধীরে পরিবেশকে যদি বদলে আনা যায় তবে এই প্রবণতার প্রকোপ অনেকটা কেটে যেতে পারে। এই সংস্কারকেরা তাই কু-অভ্যাসকে গোড়াশুদ্ধ তুলে ফেলতে চান নি, তাঁরা চেয়েছেন উৎস-কে ধীরে ধীরে স্তিমিত ক'রে ফেলতে। তাঁরা ভাবতেন, মানুষকে সৎ এবং প্রাজ্ঞ ক'রে তুলতে পারলেই মানুষের স্বাধীনতা আসবে (মহাত্মাজীও অন্তরের পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন) ; কাজেই তাঁরা চেয়েছেন শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে।

সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক মহলে হোরেস ম্যান প্রচার করতে সুরু করলেন, শিক্ষাও বিক্রীত হ'তে পারে, শিক্ষাকেও টাকার মতো ব্যবহার করা যেতে পারে ; শিক্ষা হচ্ছে সম্পদ বিশেষ। এই সব তুলনার পিছনে হোরেস ম্যান্ যথাসাধ্য বাণিজ্যিক যুক্তিও প্রয়োগ করতেন।

শিক্ষাব্রতীরা দেশকে আরও বুঝিয়ে দিলেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, নাগরিক সভ্যতার উৎকর্ষের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন।

মোট কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষানীতিতে ব্যক্তিবাদই বড় হয়ে চলছিল ; আমেরিকায় বর্তমান শিক্ষানীতিতে শ্রেণী কক্ষে পড়ানোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যা আমরা দেখতে পাই, তা যে কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৌলতেই এসেছে তা নয়, সমাজের ইতিহাসে তার পলিমাটি রয়ে গেছে। সেই ইতিহাস বা সমাজ-মানসই শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত হয়েছে কিনা কে বলতে পারে !

যাই হোক, নিরপেক্ষ-নীতি থেকে (Laissez Faire) ইস্কুলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিক্রমা থেকে, আমরা বেশ বুঝতে পারি ঐ নিরপেক্ষ নীতির একটি কোণ টেনে শিক্ষাব্রতীরা বেশ কাজে লাগিয়েছিলেন।

এই সব আন্দোলনের ফলেই ১৮২০ থেকে সাধারণের প্রাথমিক ইস্কুলের রূপ একটি নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভাব ঘটল ; পাঠ্যসূচী সম্প্রসারিত হ'ল, ন্যায় ভূগোল, অঙ্কন, সঙ্গীত, শারীরবিজ্ঞান, দেশের ইতিহাস এবং শাসনতন্ত্র। প্রাথমিক ইস্কুলের শ্রেণী-সংখ্যাও বেড়ে গেল ; প্রস্তুতি শ্রেণী যুক্ত হল

(preparatory department), আঞ্চলিক লোক-শিক্ষালয়, প্রাথমিকের সঙ্গে মধ্যবর্তী শ্রেণী প্রভৃতিও স্থান পেল। অবশ্য তখনও বয়স-আনুপাতিক শ্রেণী-বিন্যাস কল্পনা আসেনি, আমাদেরই দেশের মতো শিক্ষকদের সে-এক সমস্যার বিষয়, একই শ্রেণীতে নানাবয়সী ছেলে; এখানকার মতোই শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের ডেকে ডেস্কের উপর বই রেখে পিছন ফিরে পাঠ মুখস্থ ব'লিয়ে নিতেন। সহরে অবশ্য ইস্কুলে ৮ বছরী ইস্কুল অনেকটা স্থিতি লাভ করেছিল।

তৃতীয় যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়মিত ভাবে বেড়ে চলল। ১৮৭২ এর পর থেকে ফ্রি হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। এই সময় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠাও হ'ল। নর্মাল ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও এই যুগেই উপলব্ধি হয়। ৪৩টি রাজ্যের মধ্যে ২৭টি রাজ্যেই আবশ্যিক ভাবে ইস্কুলে যোগদানের বিধিটি চালু হয় (১৮৯০ সালের মধ্যে), ইস্কুলের শিক্ষা এই যুগে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করে। স্টেট-স্কুল অথরিটি বা রাজ্য-ইস্কুল কর্তৃপক্ষ তথা স্টেট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং স্টেট বোর্ডের ক্ষমতা এবং করণীয় দিক ক্রমশই বেড়ে চলতে সুরু করে এই যুগ থেকে। ১৮৮০ সালে ৩৮টি রাজ্যই স্টেট বোর্ডের কাজে মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করে। ১৩টি রাজ্যে তো এই স্টেট বোর্ড প্রধানত শিক্ষকদের নিয়েই গঠিত হয়।

চতুর্থ যুগে আমেরিকায় যেমন রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং সামাজিক জীবনে সম্প্রসারণ ঘটালো, তেমনি শিক্ষানীতিতেও। রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসনিক বিভাগ এবার সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করল, কোন্ কোন্ দিকে এই প্রসারণ ঘটেছে তা নীচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে: শরীর এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হ'লেন, শিশু মঙ্গলের পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টর: স্বাস্থ্য পরিদর্শক; কৃষি বিদ্যা শিক্ষার ডিরেক্টর বা পরিচালক; গ্রামের শিক্ষার ডিরেক্টর এবং ইন্সপেক্টর, বৃত্তি, শ্রমশিল্প, এবং বাণিজ্য বিষয় শিক্ষার ডিরেক্টর; গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের ডিরেক্টর; শিল্পাঞ্চলের পুনর্বাসন বিভাগের ডিরেক্টর; নিগ্রোদের শিক্ষার ডিরেক্টর; অন্ধদের শিক্ষার ডিরেক্টর; বয়স্ক শিক্ষার ডিরেক্টর। এমনি করে শিক্ষা

প্রসারণ বিভাগ, কনটিন্যুয়েসন বা অব্যাহত বিদ্যালয়, আংশিক কালের (সান্ধ্য ইস্কুল প্রভৃতি) শিক্ষার প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেরই পরিচালকরাই নিযুক্ত হ'লেন।

এবার আমরা আমেরিকার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক একটা আলোচনা করতে পারি।

প্রাথমিক ইস্কুল

কি ক'রে অবৈতনিক প্রাথমিক ইস্কুল আমেরিকায় এল, তার খবর অনেকটা আমরা পূর্বে নিয়েছি। আমরা দেখেছি প্রথমদিকে, (১)—দক্ষিণাঞ্চলে অভিজাতদের নিজস্ব ইস্কুল ছিল, (২) মধ্য অঞ্চলে চার্চ-শাসিত ইস্কুল ছিল, (৩) নিউ ইংল্যাণ্ডে কর-নির্ধারিত ইস্কুল ছিল। তারপর ম্যাসাস্যুসেটস-এর ১৬৪২ আর ১৬৪৭ এর বিধিও কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু সংবিধান থেকেই যে কেবল এই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এসেছে তা বললে ভুল হবে। এর পিছনে ধর্মযাজকেরা অনেক সাহায্য করেছিলেন; অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ছেলেমেয়ে বাইবেল পড়বার মতো অধিকার অর্জন করুক। কিন্তু তাঁরাই আবার বিরুদ্ধে গেলেন যখন দেখলেন বিধর্মীদের জন্য ইস্কুল করতে তাঁদের কর দিতে হ'বে; তাঁরা তো তাঁদের নিজদের দলের ছেলেমেয়ের জন্য ইস্কুল করেছেনই। সেই মানসিক অভ্যাস। দ্বিতীয় বিরোধী দলে এলেন নিঃসন্তান ব্যক্তি; তাঁরা কেন অন্যের পুত্রসন্তানের জন্য শিক্ষা-কর বহন করবেন (কর-নীতির বড় বিপদই হচ্ছে, কর নিলেই করদাতাদের কিছু কিছু কাজ দিতেই হয়। অবশ্য সে-নিয়ম সব সময় যে মানা যায় না তা' সব দেশেই স্বীকার করে)। তৃতীয় বিরোধী দলে থাকল, 'চিন্তাশীল নরহরি'-রা। তারা ভাবল, ফ্রি ইস্কুল মানে দানের চাল-কলা-মূলোর মতো; ঐসব ইস্কুলে পড়ানো মানে হাত পেতে ভিক্ষা করার মতো; রাজ্য-শাসকেরা কি তাদের সবাইকে ভিক্ষুক মনে করে! ইস্কুলের পক্ষেও বিপদ; দেশের লোকের কাছে অপ্রিয় হ'লে ইস্কুল চলবে কি করে?

কিন্তু প্রলোভন এল, ল্যাঙ্কাস্টার-উদ্ভাবিত সর্দার-পোড়ো প্রথার ইস্কুল থেকে। ১৮০৬ সাল থেকেই আমেরিকার ফ্রি-ইস্কুল সোসাইটি এই ইস্কুলের নানা সুযোগ-সুবিধার কথা প্রচারিত করতে থাকে। একজন শিক্ষককে

ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হ'ল—এই প্রথার শিক্ষা শিখে আসতে। পরবর্তীকালে ল্যাঙ্কাস্টারের পদ্ধতি নিউইয়র্ক থেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল; এমন কি মাধ্যমিক ইস্কুলেও এই নিয়মে পড়ানো চালু হয়ে গেল প্রায় ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত।

ল্যাঙ্কাস্টারের ইস্কুলই হ'ল প্রাথমিক ইস্কুলের সূত্রপাত। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই স্কুল বাড়তে বাড়তে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এখন এই প্রাথমিক ইস্কুলে ছাত্র আসে ৬ বৎসর বয়সে, তারপর ৬ থেকে ৮ বছর ধ'রে পড়ে চলে। এখন আর সেই প্রাচীন যুগ নেই। এসব ইস্কুলে পড়ানোর কত নতুন ব্যবস্থা, কত রকম ভাবে পরিবেশ সৃষ্টি, এখানে এখন তারা বিষয়জ্ঞান শেখে, অভ্যাস গঠন করে, নিপুণতা বাড়ায়, রসগ্রহণ ক্ষমতা আয়ত্ত করে। এখনও চার্চ আছে, গৃহ আছে, আরও আছে সিনেমা, হাস্য কৌতুক, রেডিও; কিন্তু সবই আছে এই ইস্কুলের শিক্ষার অনুপূরক হিসাবে।

কিন্তু ইস্কুলের শ্রেণী-বিন্যাসে এখনও ইস্কুলের মধ্যে সমতা দেখতে পাওয়া যায় না। মামুলী প্রাথমিক ইস্কুলে ছেলেরা প্রথম শ্রেণীতে (grade) ভর্তি হয় ৬ থেকে ৭ বছর বয়সে; তারপর ৮টি শ্রেণী তাদের অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু সময় সময় ছেলেদের এই ৮টি শ্রেণী অতিক্রম করতে ৮ বছরের বেশীও লাগে। গ্রামে এক-ঘরের ইস্কুল ছাড়াও কিছু কিছু এই ৮ম শ্রেণী সম্বলিত প্রাথমিক ইস্কুলও দেখা যাচ্ছে; এই ৮ম শ্রেণী অতিক্রম করার পর সেখানে আর ৪ বছর হাই ইস্কুলের স্তর অতিক্রম করার সুবিধা আছে। অর্থাৎ ১২টি শ্রেণীর ব্যবস্থাও চালু। কিন্তু সহরের ইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বৎসর আর মাধ্যমিক শিক্ষা ৬ বৎসর। কতগুলি ইস্কুলে কিণ্ডারগার্টেন এবং নার্শারী ইস্কুলের বিভাগও থাকে।

প্রাথমিক ইস্কুলের সবচেয়ে সরল সংস্করণ হচ্ছে একঘরের ইস্কুল। গ্রামেই এর সংখ্যা বেশী। এর পরিচালনা করে একটি নির্বাচিত স্কুলবোর্ড। শিক্ষকের উপরই ইস্কুলের সব ভার। তাঁকে সমগ্র ছাত্রকে সকল বিষয়ই পড়াতে হয়—তা ছাড়া ইস্কুলের বাড়ীঘরদোর সম্বন্ধেও তার দায়িত্ব থাকে। লাস্কি এইজন্যই বোধহয় এত বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন।

এর চেয়ে সহরের ইস্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা অনেক ভালো। এই ইস্কুল পরিচালনার জন্য বোর্ডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন, তাঁর সহকারী আছেন, প্রিন্সিপ্যাল আছেন। তাঁদের অর্থ সরবরাহের দিকই বলুন, বইয়ের কথাই বলুন, আর ইস্কুল বাড়ীর কথাই বলুন, কিছুই ভাবতে হয় না। শুধু উপর থেকে যেটুকু করতে বলা হয়, সেইটুকু মাত্র করেন। মাইনেও অনেক বেশী তাঁদের। মনে হয়, গণতন্ত্র এখানে খুব কার্যকরী নয়।

ছাত্রদের পরিচালনা নিয়েও বৈষম্য আছে। পুরনো ইস্কুলে একটি শ্রেণীতে একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত থাকেন। সমস্ত দিনই তাঁকে সেই শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে হয়। নানা বিষয়-সান্নিধ্যে তিনি তাদের নিয়ে আসেন। আবার কোন কোন ইস্কুলে এই রকম ভাবে একটি শিক্ষক (বা শিক্ষয়িত্রী)-কে সারাবছর ধরে একটি শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। অবশ্য কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষকও আছেন। গ্রন্থাগারে একজন শিক্ষক থাকেন; সেখানে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (শিক্ষক বলছি, কিন্তু আমেরিকার প্রাথমিক ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীই বেশী) তাঁর ছাত্রদের নিয়ে আসেন; গ্রন্থাগারের শিক্ষক তাদের পুস্তক বিষয়ে সমস্ত সাহায্য করেন বটে, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হয়। কেবল গ্রন্থাগার কেন—শিল্প-কক্ষ, সঙ্গীত-কক্ষ প্রভৃতি সর্বত্রই তাঁর এই কাজ।

কতগুলো ইস্কুলে আবার একজন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক থাকেন; তিনিই সময় সময় গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভাগ ক'রে ছেলেদের বিশেষ বিষয় শিখবার জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকক্ষে ঐ কক্ষের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

আর এক ধরণের ছাত্রপরিচালনা আছে—তাকে বলা হয় প্লেটুন বিভাগ। এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে নাম দেওয়া যায়, কাজ-পড়া-খেলা ইস্কুল। যখন ইস্কুলে ভীড় বাড়ে, ছাত্র সংখ্যা বাড়ে, তখন এই ব্যবস্থা কার্যকরী। ছেলেদের দুটো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হ'ল; অর্ধেক থাকল—তাদের কক্ষের শিক্ষকের কাছে; তারা এখানে তাদের সাধারণ বিষয়গুলি (যেগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের দরকার নেই) পড়বে। অন্য অর্ধেক যাবে বিশেষ-বিষয় কক্ষে, প্রতি ঘণ্টার শেষে তারা এমনি কক্ষান্তরে নিজেদের স্থান বদল ক'রে নেয়।

পাঠ্যসূচী নিয়েও বৈষম্য আছে। পুরনো শিক্ষকেরা বিষয়বস্তুর উপরই প্রাধান্য দেন বেশী, কিন্তু নতুন শিক্ষকেরা ছাত্রদের উপরে। ১৯২০ সালে পাঠ্যসূচী-কমিটির যে অনুমোদন ছাপা হ'ল, তা ব্যর্থ হ'ল এই কারণেই। সে অনুমোদনে ছিল বিষয়ের উপর প্রাধান্য। বর্তমান শিক্ষকেরা পাঠ্যসূচীকে নিয়েছেন শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে, কিন্তু উপকরণ হিসাবে নয়। শিক্ষার্থীর মনোগঠনের উপর নির্ভর করেই পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হবে, পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তাদের মানসিক স্তর গঠন করা হবে না। 'কোর্স শেষ হ'ল না' এ ধ্বনি তাঁদের নেই; তাঁরা দেখেন ছেলেদের কি হল, কতটা হল। এই হিসাবে দুটি নীতিতে পাঠ্যসূচীকে চালনা করা হ'ল :

(১) কর্মপ্রধান পাঠ্যসূচী : (activity carriculum) জার্মানীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে এই কর্ম-প্রধান কথাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমেরিকাতেও কিন্তু এক একটি ইস্কুলে 'কর্ম-প্রধান'কে এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করে। তবে সাধারণত, এর অর্থ, কাজ করায় ছেলেদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু কেবল কর্ম-দিকটির উপর প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্য-সূচী তৈরী করা তো ঠিক নয়; বিষয়-প্রধান পাঠ্যসূচীর যে দোষ, কর্মপ্রধান পাঠ্যসূচীরও সেই একগুঁয়েমির দোষ। পাঠ্যসূচী হবে—বিষযবস্তু এবং নিজস্ব সমস্যাকে সক্রিয় ভাবে এবং সৃষ্টিমূলক ভাবে কি ভাবে ব্যবহার করতে পারে, এবং ব্যবহার ক'রে কি অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করে—তার উপর নজর দিয়ে।

(২) সামগ্রিক পাঠ্যসূচী (Integrated curriculum) : সামগ্রিক পাঠ্যসূচীতেও গোলমাল আছে। কার সঙ্গে কার সমগ্রতাবোধ ঘটানো হবে? তিনটি অর্থ পাওয়া গেছে—(ক) সমগ্র বিষয়ের মধ্যে একটি অখণ্ড সম্বন্ধ আনা, (খ) সমস্ত বিষয় একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে রচিত হবে, (গ) শিক্ষার্থীর জীবন-অভিজ্ঞতাকে মিলিযে বিষয়বস্তুর সাহায্যে একটি সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এই তিন ধরণের অর্থ নিয়েই তিন রকম পাঠ্যসূচী বিভিন্ন ইস্কুলে দেখা যায়।

মাধ্যমিক ইস্কুল :

আমরা এই বিভাগের বোস্টন লাতিন ইস্কুলের কথা বলেছি, ফিলাডেল্‌ফিয়া একাডেমীর কথাও বলেছি। ইয়োরোপের লাতিন ইস্কুলের ছাঁচে এই বোস্টন ইস্কুল তৈরী করা হয়েছিল। এই ইস্কুল কেবল ছেলেদের জন্যই। ছেলেদের ভর্তি করা নিয়েও অনেক বাছ-বিচার ছিল, কাজেই ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। পাঠ্যসূচীতে ছিল কেবল লাতিন, গ্রীক আর সাহিত্য। শিক্ষা অবৈতনিক নয়। একাডেমিতে মেয়ে এবং ছেলে উভয়েই পড়ত। যারা কলেজে যাবে, তাদের প্রস্তুতির জন্যও যেমন এর পাঠ্যসূচী নির্মাণ, তেমনি যারা কলেজে যাবে না তাদের জন্যও পড়ানোর ব্যবস্থা এখানে চালু ছিল। পাঠ্য-সূচী অনেকটা লাতিন গ্রামার ইস্কুলের বিরোধী; দৈনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে এর পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা হ'ল। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায়, এই একাডেমীই পরবর্তীকালে পেনসিলভ্যানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইংরেজিই এখানে প্রধান ভাষা; অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এর পথ অনুসরণ ক'রে যেসব একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হ'ল—সেগুলি সবই বেসরকারী; এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইস্কুলগুলো আবার এমন যায়গায় স্থাপিত যে, ছেলেদের ইস্কুলেই থাকতে হত। কাজেই পড়ার খরচ পড়ত বেশী। ছাত্রবৃত্তি থেকেই ইস্কুলের ব্যয় নিবাহ করা হ'ত।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে বোস্টনে প্রথম পাবলিক হাই-ইস্কুল স্থাপিত হয়। তখন এর নাম ছিল—ইংলিস ক্লাসিক্যাল হাই ইস্কুল। এই ইস্কুলের উদ্দেশ্য কি? পিতামাতা চান তাঁদের ছেলে কর্মজগতের জন্য তৈরী হোক, চান তারা বৃত্তি বা ব্যবসায়ে বা কারিগরাতে খ্যাতি অর্জন করুক। কাজেই সাধারণ শিক্ষা থেকে একটু পৃথক ধরণের শিক্ষা দরকার। একমাত্র একাডেমির শিক্ষা এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু সেই একাডেমির শিক্ষা নিতে হ'লে ছেলেদের যে বাইরে থাকতে হয়। অতএব হাই ইস্কুল দরকার। ১৮৭০ সালের দিকে এই আন্দোলন বেশ প্রবল আকার নিল। এই হাই ইস্কুলের দুটি সুবিধা – (১) অবৈতনিক এবং (২) সীমানার মধ্যে যাতায়াতের পথে। পাঠ্যসূচী অনেকটা একাডেমির

মতোই, তবে কলেজ-পাঠেচ্ছুকদের খুব বেশী সুযোগ নেই। মেয়েদেরও সুযোগ থাকল না। তবে ১৮৫৬ সালের দিকেই সহশিক্ষা প্রচলিত হয়ে গেল (চিকাগোতে প্রথম)। বর্ত্তমানে কর-প্রথায় ইস্কুল চালানো হয় আর সকলেরই পড়বার অধিকার আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বেকার খবর। দেশের শতকরা ২৩ ভাগ মাধ্যমিক ইস্কুল—৪ শ্রেণীর বা ৪ বৎসরের ইস্কুল; এলিমেণ্টারী বা প্রাথমিক ৮ বছরের পর এই স্তর সুরু হয়। তা হ'লে ইস্কুল-কাল দাঁড়াচ্ছে ৮+৪ বৎসর। সাধারণ মাধ্যমিকের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ৬ বৎসর প্রাথমিক, ৩ বৎসর জুনিয়ার হাই ইস্কুল বা নিম্ন মাধ্যমিক আর ৩ বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক বা হাই ইস্কুল; অর্থাৎ, ৬+৩+৩; কতগুলির মাধ্যমিক, এই জুনিয়ার হাই ইস্কুলের সঙ্গে মিলিয়ে ৬ বৎসর। অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক দাঁড়াচ্ছে ৬+৬ বৎসর; আর একটি গঠন আছে—৬ বৎসর প্রাথমিক, ৪ বৎসর মাধ্যমিক, আর ৪ বৎসর কলেজ, অর্থাৎ—৬+৪+৪ বৎসর। এখানে হাই ইস্কুল সুরু হয় ৭ম শ্রেণী থেকে, শেষ হয় ১০ম শ্রেণীতে, কলেজ চলে ১১ থেকে ১৪ শ্রেণীতে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অধিকাংশ মাধ্যমিক স্তর ৭ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চলে, ১৩ এবং ১৪ শ্রেণী দুটিকেও মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ভিতর ধরা হয়।

প্রথম দিকে জুনিয়ার হাই ইস্কুল গঠিত হয়েছিল—প্রাথমিকের ৭ম এবং ৮ম শ্রেণী এবং হাই ইস্কুলের ৯ম শ্রেণীটিকে নিয়ে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-সমিতি (National Educational Association) ১৯০২ সনে একটি কমিটি নিয়োগ ক'রে এই ইস্কুলে নতুন শ্রেণী আনলেন ৭ম, ৮ম এবং ৯ম শ্রেণী। মনে রাখতে হবে—এই ব্যবস্থা নতুন শিক্ষাকে মেনে; পুরনো প্রাথমিক আর মাধ্যমিকের মিশ্রণে নয়।

১৯১০ সাল থেকে এই জুনিয়ার ইস্কুলের বৃদ্ধি ঘটে; আর তখন থেকেই ইস্কুলের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাকে মেনে নিয়ে ভাগ করা হ'ল—৬+৩+৩ শ্রেণীতে; অর্থাৎ ৬ বৎসর প্রাথমিক, ৩ বৎসর জুনিয়ার হাই, ৩ বৎসর হাই। এইটিই হ'ল আমেরিকার ইস্কুল ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম।

জুনিয়ার হাই ইস্কুলের জন্ম ঘটল অন্য ইস্কুলের স্থান-অসংকুলান হেতু। কারণ, প্রাথমিক আর মাধ্যমিক ইস্কুলে স্থান সঙ্কুলান হ'ত না। অথচ গৃহ-সমস্যাও খুব বেশী। কাজেই পৃথক ইস্কুল খুলে—ঐ দুটি ইস্কুলের ভার লাঘব করা হ'ল। পরবর্তী কালে—জুনিয়ার হাই ইস্কুলের ছাত্রদের বয়স, মনোগঠন এবং পাঠ্যসূচী নিয়ে পৃথক ধরণের পড়ানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হ'ল; এর স্বাতন্ত্র্য এল। আবার সেই কথা বলতে হয়, সমাজে যা এসে গেল তাকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা। অর্থাৎ,'ব্যাখ্যায় করিতে পারি ওলট-পালট।' নতুবা ইংল্যণ্ডে যেখানে পোস্ট প্রাইমারী উঠে গেল, প্রিপারেটরী ইস্কুল নিয়ে কর্তৃপক্ষদের ভঙ্গকুলীন আখ্যা, সেখানে জার্মানী মিটেল ইস্কুল—হাফট ইস্কুল রাখে, আমেরিকা জুনিয়ার হাই ইস্কুলের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে পায়। মূল কথা, বিজ্ঞান বিশেষ করে মানবিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান—ভূগোল এবং জাতিভেদ মেনে চলে। কিন্তু মানুষের সন্দেহ নিরসন তবু হয় না, তাই আবার তারা আপত্তি তোলে। সুবিধা হচ্ছে, মানুষের চিন্তারাজ্য একটি রহস্যময় দেশ, সেখানে একবার একটি চিন্তা-সূত্র ঢুকিয়ে দিতে পারলে, তার আপত্তিও সেই সূত্রকে অবলম্বন ক'রে ছোটে, কাজেই তাকে খণ্ডন করতেও চিন্তানায়কেরা সহজ-পথ নেয়। এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছে শিক্ষাসূত্র নিয়ে। মানুষ পশুদের পৃথক ব'লে দম্ভ প্রকাশ করে; কিন্তু কাজ চালানোর সুবিধার জন্য সে আবার পশুদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ঘটিয়ে মানুষের কাছাকাছি পশুশ্রেণী আবিষ্কার করেছে। সেই পশু অর্থাৎ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, মাছ, বানর-শিম্পাজীকে নিয়ে মানুষ শিক্ষাসূত্র আবিষ্কার করল। মানুষ কি সবই মেনে নিল? নেয় নি যে, ডক্টর ক্যারলের 'ম্যান দি আন-নোন্' বই খানাই তার প্রমাণ। কিন্তু আপত্তি যে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আর অস্পষ্ট হ'লেই মানুষ তাকে অকেজো মনে করে। যেমন দেখা যায় ভাগ্যগণনার ক্ষেত্রে। টলেমির বিশ্বজগৎ-কল্পনাকে নিয়ে গ্রহ-উপগ্রহের রশ্মিজাত ব্যক্তিত্বের আবিষ্কার করল ভারত-চীন-মধ্য প্রাচ্যের জ্যোতিষীরা, তারপর থেকে সেই যে বৈজ্ঞানিক-ব্যবসায় সুরু করল,সাধারণ মানুষ আজও সে ভুল পথ থেকে উদ্ধার পেল না। আকাশ আছে একথা মেনে নিয়ে কাজ করা যত সহজ,

আকাশ নেই আর আমরা চতুর্মাত্রিক মহাশূন্যে বাস করছি—সেকথা মান্য করা সহজ নয়; বেশী-আলোয় বেশী-আলো হয় একথা কাজের বিজ্ঞান, কিন্তু বেশী আলোয় যে অন্ধকারও হয়—সে কথা বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান হয়েই তোলা থাকল। অসম্ভবের সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ রোমান্স সৃষ্টি করে, সেইটিই তাদের রসের দিক। কিন্তু সেই অসম্ভব যদি একদিন সম্ভব হয়—তবে সে আহত হয়, তার রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মে, সে দুই হাত আর মাথা নাড়িয়ে বলতে থাকে—'না না—সে কি কথা।' ছবি চলে না, কিন্তু যদি চলে—আর চলেই; পর্বত মেঘ হয়ে উড়বেনা, অথচ ওড়ে যদি—ইত্যাদি নিয়ে কবিতা আমরা ভালোবাসি; কিন্তু কেউ যদি বলে— আলোক-কণার (Photon) অভিঘাতে ছবি বা পর্দার পরিবর্তন হয়; আর পরিবর্তন-কেই বলা হয় চলা। কেউ যদি বলে—বিচূর্নীভবন প্রক্রিয়ায় পর্বত একদিন উবে যায়, আর তারপর ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবার চলবে সৃষ্টির প্রক্রিয়া— তা হ'লে আমরা মাথা নেড়ে বলব, এ হচ্ছে এমন বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ-কারবার চলেনা। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে সইয়ে সইয়ে (মাঝে মাঝে হয়ত ভুল ব'লেও) মানুষের মধ্যে টেনে আনেন। এই সহ্যশক্তি নির্ভর করে সমাজ-মানস গঠনের উপর। তাই শিক্ষার কল্পনা নিয়ে আজও মানুষ সন্তুষ্ট হ'তে পারল না, অথচ সেই অসম্পূর্ণ আর অসার্থক জ্ঞান নিয়েই মানুষ শিক্ষাজগতকে সম্পূর্ণ করতে চায়, মানব-শিশুদের মনের ব্যাখ্যা করতে চায়। কাজেই আমেরিকাতেও জুনিয়ার হাই ইস্কুলের ছাত্রেরা মানসিক দিক দিয়ে যে স্বতন্ত্র ধরণের সেকথা বলতেই হবে।

এদের বয়স সাধারণত ১২ থেকে ১৪ (ছেলে এবং মেয়ে)। এই বয়সের ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক ইস্কুলের মাতৃ-স্নেহ সমন্বিত শিক্ষা পছন্দ করবে না (মাতৃস্নেহের দুর্ভাগ্য) আবার হাই ইস্কুলের বয়ঃপ্রাপ্তদের ব্যক্তিত্ব-বাদী শিক্ষার উপযুক্তও নয় (প্রচণ্ড আবিষ্কার! কেউ যদি বলেন 'বিলেতের মতো চালালেই চলে!'—তা হ'লে?), তা হ'লে এদের পৃথক ধরণের শিক্ষা দরকার। মনে রাখা দরকার, এই যুক্তিতে মনোবিদ্যা-সম্মত ছেলে এবং মেয়ের শরীর মন বুদ্ধির তারতম্যের কথা স্বীকার করা হ'ল না।

এখানে কি পড়ানো হবে? প্রাথমিক স্কুল থেকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর পাঠ্যসূচী, অর্থাৎ উঁচু স্তরের, আর হাই ইস্কুল থেকে ন্যূন (আর একটি আবিষ্কার)। পাঠ্য সূচীর প্রকৃতি অনেকটা সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসারী (general education)। ক্লাসের ঘণ্টা দীর্ঘ, বয়সের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়-বস্তু, কিছু কিছু প্রধান বিষয় যেমন—সমাজীয় হতে শেখা, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ব্যবহারিক শিল্প, চারুশিল্প, সঙ্গীত, অঙ্ক প্রভৃতি - কোন কিছুরই বিস্তৃত জ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞান। অর্থাৎ পাঠ্যসূচী এমনভাবে পরিচালনা করা হবে যাতে এই ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা সহজেই হাই ইস্কুলের পাঠ্যসূচীকে অধিকার বা আয়ত্ত করতে পারে। এখানে বীক্ষণাগার (Laboratory) আছে, সেখানে সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রিরা বিষয় সান্নিধ্যে আসে, আর তারপর তারা সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আয়ত্ত করে। সাহিত্যের ক্লাসে তারা সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ক'রে নেয়, কোন অঞ্চলের সাহিত্যই তাদের জানা বাকি থাকে না, অর্থাৎ বটের শিকড়ের মতো দূর বিস্তৃতি, কিন্তু গভীরে যায় না। কাজেই ভালো লাইব্রেরী থাকেই। ভূগোল, ইতিহাস, সামাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তারা পৃথক পৃথকভাবে পড়ে না, একটি সমগ্র বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে তারা পড়ে; এই সামগ্রিক রূপটিরই নাম সমাজ-পাঠ (Social Studies)। অঙ্ক সম্পর্কে তারা প্রাথমিক ইস্কুলের জ্ঞানকে আর একটু ঝালাই ক'রে নেয়। বিজ্ঞানের মোটামুটি ধারণা ক'রে হাই ইস্কুলের অপেক্ষায় থাকে।

প্রশাসনিক দিক দিয়েও বৈচিত্র্য আছে। একজন তো প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ আর, একজন উপদেষ্টা (Counsellor), তৃতীয় ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক (Librarian)। উপদেষ্টার কাজ, ছেলেদের কাজ সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া অর্থাৎ জুনিয়ার হাই ইস্কুলের উদ্দেশ্য এবং হাই ইস্কুলের কর্মতালিকা সম্পর্কে তাদের মনোগঠন করা, তা ছাড়া তিনি তাদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত নানা সমস্যাকে নিরসন করতে শেখান।

আমেরিকার শিক্ষাবিদরা বলেন, এই জুনিয়ার হাই ইস্কুলের উপযোগিতার কথা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না, তা 'অমৃত-সমান।' প্রথম সুবিধা হচ্ছে,

প্রাথমিক আর হাই-এর মাঝামাঝি ইস্কুল, উভয়ের সংযোগ সাধন করে। ঐ যে উপদেষ্টা উনি তো অনেক উপকার ক'রে থাকেন। এক বয়সের ছেলেমেয়ে একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাদের বিচিত্র মনকে তিনি সুন্দরভাবে পরিচালনা ক'রে দেন। ব্যক্তিগত তারতম্য মেনে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা চলে এখানে। অনুষ্ঠান-গত (extra-curricular activities) শিক্ষার অবসরও এখানে যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় সুবিধা—এই ইস্কুল একেবারে নতুন আদর্শে, এর কোন ঐতিহ্যের খুঁটি নেই, কাজেই শিক্ষাসংক্রান্ত নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে সহজেই চলতে পারে। জওহরলালজীর কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা আবার একথা শুনে না বলেন—তবে কি গিনিপীগের ইস্কুল! কিন্তু বিদ্রূপ করা গেলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে—গিনিপীগেরা না-থাকলে মানুষকে অনেক আগেই অযথা মরতে হ'ত! পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা ক্ষেত্র থাকা চাই-ই। সবাই আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে বায়ুস্তরের উপরে যেতে পারে না! সমাজে জুনিয়ার হাই ইস্কুল ব্যর্থ নয়, যদি অর্থ-সঙ্গতি থাকে, যদি নিষ্ঠার সঙ্গে উপদেষ্টা কাজ করেন, যদি ছেলেমেয়েদের প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি গবেষণাসুলভ মনোবৃত্তি থাকে। নতুবা হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। বিপদে পড়লে মানুষ শুয়ে পড়ে বটে, কিন্তু উপোষী ছারপোকার খাটে শুয়ে পড়েও বিপদ এড়ানো যায় না।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৮+৪এর ইস্কুল ব্যবস্থায়, সিনিয়র হাই ইস্কুলে থাকে নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী; কিন্তু ৬+৩+৩এর ইস্কুল ব্যবস্থায় ঐ নবম শ্রেণীটি নেই। প্রাথমিক ইস্কুল থেকে যারা সরাসরি এখানে নবম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হয়, তাদের নিয়ে অধ্যক্ষেরা হিমসিম খেয়ে যান। কারণ প্রাথমিকের সঙ্গে সিনিয়রের পঠন-পাঠন আর পাঠ্যসূচীতে এত স্বাতন্ত্র্য যে,ছেলেমেয়েরা কিছুতেই মানিয়ে উঠতে পারে না। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'এ রকম স্বাতন্ত্র্য না রাখলেই তো চলত।' আমেরিকার সমাজ থেকে যে ভাবে যা এসেছে তাকেই রক্ষা ক'রে চলা তার গণতন্ত্রের এক রীতি— এই কথাটা যদি মনে রাখা যায়,

তবে ঐ প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের এই 'ধুম'-কে সব সময় মনে রাখা দরকার।

যাই হোক, আমেরিকার এই ধরণের ইস্কুলে ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। হওয়ার কারণ আছে। আবশ্যিক পাঠ গ্রহণ; উত্তম পাঠ্যসূচী; লোকপ্রিয় শিক্ষা। এই তিনটি কারণেই এখানে এত ছাত্র পড়তে আসে।

বিচিত্র এর পাঠ্যসূচী। যারা কলেজে যাবে তাদের পাঠ্যসূচী আছে, যারা যাবে না তাদেরও আছে, যারা ব্যবসা করবে তাদেরও আছে। পাঠ্যসূচীর 'মাদুলী' নয়, বৈচিত্র্য! কাজেই সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচী যেমন আছে, তেমনি আছে কলেজ-গমনেচ্ছুদের, তেমনি আছে বৃত্তি-ব্যবসায়ীদের। কেবল তাই নয়, বুদ্ধি বিকাশের তারতম্য মেনে, বুদ্ধি-স্তরের তারতম্য মেনেও পাঠ্যসূচীর বৈচিত্র্য সাধন করা হয়। কাজেই ব্যক্তিগত তারতম্য এখানে মানতে হবেই, স্যর জন এডাম্‌সের 'নিউ টীচিং'-এর গড়-ছেলেদের মুখাপেক্ষী হ'লে এখানে চলে না। আর তাই, উপদেষ্টা শিক্ষক অধ্যক্ষ নানা গবেষণা নিয়ে এখানে কাজে লাগেন। এই উৎসাহের আদি নেই, অন্ত নেই, উপসংহার নেই, স্থিরতা নেই। 'সত্য সেলুকাস—'। এখানে কাউন্সেলর আছেন, কেরীয়ার (career) উপদেষ্টা আছেন ছেলেদের জীবনের ঠিক পথে চালনা করবার জন্য। আলডাস হাকসলী 'এণ্ডস এণ্ড মীনস'-এ বর্তমান শিক্ষা আদর্শ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন—ওরা যখন সেই আদর্শ পরিবেশ ছেড়ে সেই আদর্শ নিয়ে বৃহত্তর সমাজে আসবে, তখন যে দেখবে তাদের সব আদর্শই অচল, তখন! দর্শনের অধ্যাপক জোয়াড্ বলেছিলেন,আদর্শগত শিক্ষা কি ক'রে হবে যেখানে সমাজই ভুল আদর্শ বরণ করেছে। তাঁরা দার্শনিক, তাঁরা কাজের ধারা জানেন না। সব মানলেও কাজ তো করতেই হবে। 'একদিন মরব' বলেই তো আর ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না! ছেলে 'মাতাল' হবে ভয়েই কি আর আইনানুগ মদের ব্যবসা করব না, ছেলে অপচয় করবে বলেই কি ছেলের জন্য টাকা জমাব না! হাকসলী একটু ভাবলেই বুঝবেন—'নিরাসক্ত মন' (non-attached personality) বা ব্যক্তিত্ব তৈরী ক'রেও ছেলেদের দিয়ে সমাজে

সুস্থভাবে বাস করানো যাবে না ; জোয়াড (ভাগ্যিস মরে গেছেন!) যদি ইতিহাস আর একটু গভীরভাবে পড়েন, তাহ'লেই বুঝবেন—সমাজের 'বিকাশ' হয়, সেই ভাবেই সমাজ-মনের বিবৃদ্ধি ঘটেছে—সেই মানসিকতা পরিবর্তন করা 'এ্যাটমিক এফেক্টে'ও সম্ভব নয়। ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন, সর্বত্র আছেন, কিন্তু ঈশ্বর পায়ের বুড়োআঙুলের ডগায় আছেন, একথা বললে, সমাজের লোক সে সাধুকে হত্যা করবে। ধরণীর এক কোণ বলে কিছু নেই ; ধনও চাই মানও চাই আর তার সঙ্গে কাজও চাই। সেই কাজেরই দর্শন চাই, কর্মী চাই, শিক্ষা চাই, ইস্কুল চাই। অন্ধকার রাত্রেও যদি আলো থাকে, যদি বায়ুস্তরের বিশেষ অক্সিজেন তখনও দ্যুতি প্রকাশ করে—তবু তাকে আমরা মেরুজ্যোতি বলব না, বলব সেটি আলো। এই হচ্ছে ভূ-খণ্ডের ত্রিশ-মাইল ত্বকের দৈনন্দিন কর্ম-নীতির দর্শন ; এই হচ্ছে মানুষ জীবটির রোমান্স। রোমান্সে হয়ত সত্য নেই, কিন্তু মাধুর্য আছে। আর জীনস তাই বলেন, 'মানুষ জাতি যে তার জীবনের কোটি কোটি অংশ পরিমাণ সমস্যারও সমাধান করতে পারেনি তার জন্য বিস্ময়ের কিছু নেই ; সমাধান করতে পারলে জীবন হয়ত আনন্দহীন হয়ে পড়ত, কারণ অধিকাংশের মনে এবং চিন্তায় আনন্দ দেয় জ্ঞান নয়, জ্ঞানের অনুসন্ধান মাত্র—লক্ষ্যে পৌছানোর চেয়ে আশা নিয়ে ভ্রমণ করাতেই আনন্দ'। তবু একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, লক্ষ্যই যদি স্থির না থাকল, কেবল যদি আশাই থাকল, তবে ঐ 'কেরিয়ার' বা ছেলেদের প্রবণতা মেপে বিষয়ের দিকে চালনা করায় ছেলেদের ক্ষতি করা হয় না তো! তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে, ক্ষতি করা হয় না, বাছাই করা হয় মাত্র।

এই ইস্কুলের পাঠ্যসূচীর ধারণা করতে লাটিন গ্রামার ইস্কুল এবং একাডেমি-র পাঠ্যসূচীর একটি যৌগিক ফল ধ'রে নিলেই চলবে। অর্থাৎ মামুলী বিষয়, যথা—প্রাচীন ইতিহাস, লাতিন, জ্যামিতি, ইংরেজি রচনা, আর বর্তমান বিষয় সমাজীয় হয়ে বাস করতে পারবার মত জ্ঞান, যথা—সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমস্যা ও ঘটনা ; গৃহ ও পরিবার সম্পর্ক ; আর এর সঙ্গে বৃত্তিগত শিক্ষা, যথা—কৃষি-বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, এবং ব্যবসায় ; তা ছাড়াও আছে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-পাঠ, শিল্প, সঙ্গীত, শরীর ও স্বাস্থ্য

প্রভৃতি। এক কথায়, প্রায় কিছুই বাদ নেই। সেই বটের শিকড়—বহুদূর তার প্রসারণ, বহু নীচে কিন্তু নয়।

কিন্তু এখান থেকে কলেজে যেতে হ'লে কতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন? সেদিক দিয়েও বড় একটা সমন্বয় ছিল না। একটি কমিটি প্রথম দিকে এই চাহিদার একটা মান কসতে চেয়েছিল, সেই কমিটিরই পরে নাম হয় 'কার্নেগী ইউনিট' বলে। এই কার্নেগী ইউনিট এমন মানই নির্ধারিত করলেন যে হাই ইস্কুলের কার্য-ক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে বসল; পরে ১৯৩০ সালে প্রোগ্রেসিভ-এডুকেশস এ্যাসোসিয়েসনের মারফৎ একটা মধ্যস্থতা করা হয়েছে।

তবে ইস্কুলের কার্যক্রমে কলেজের চাহিদা ছাড়া আর কতগুলি কাজের হদিস আছে। এই কাজগুলিই হচ্ছে অনুষ্ঠান-গত (Extra-curricular) কার্যক্রম। গ্র্যাজুয়েসন বা হাই ইস্কুল উত্তীর্ণ হওযার জন্য যে-সব কাজের হিসাব থাকবে না—তাকেই ইস্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, অনুষ্ঠান-গত কার্যক্রম (All activities in a high school that do not result in credit towards graduation)। এই অনুষ্ঠান-গত কার্যক্রম ইস্কুলের জীবনে একটি প্রযোজনীয অংশবিশেষ। এর মধ্যে আছে—সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা পড়া, আলোচনা করা, প্রকাশ করা; ছাত্রদের স্বয়ংশাসন কার্যপ্রণালী; সঙ্গীত বিষয়ক নানারকম ক্লব বা সঙ্ঘ (glee clubs, bands, orchestras, operas); সভাসমিতি, ক্রীড়াসংসদ, তা ছাড়া ভ্রাম্যমান সঙ্ঘ, নাটক সঙ্ঘ, ক্যামেরা ক্লাব—প্রভৃতি নানা দিকের অনুষ্ঠান-গত কাজ। কিন্তু সবার পিছনেই একজন ক'রে শিক্ষক পরিচালক হিসাবে থাকেন।

ইস্কুলের কমচারীও তাই কম নয: শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সহ অধ্যক্ষ, মেয়েদের উপদেষ্টা, ছেলেদের উপদেষ্টা (adviser), কাউন্সেলর, গ্রন্থাগারিক, নার্স, সঙ্গীতশালার বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক, শরীরচর্চার শিক্ষক, নাটক-পরিচালক, কাফেটারিযার ম্যানেজার প্রভৃতি বহু রকমের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

বর্তমান যুগের এই হাই-ইস্কুলের দিকে তাকিয়ে পিছন ফিরে সেই ঔপনিবেশিক যুগের গ্রামার ইস্কুলের কথা ভাবতেই পারা যায় না—কি বিরাট পরিবর্তন তার সর্বাঙ্গে ঘটে গেছে।

এই যে ইস্কুল ব্যবস্থা এর পিছনে আমেরিকার শিক্ষাব্রতীদের কয়েকটি নীতি কাজ করছে। যেমন তাঁরা চান প্রগতিমূলক শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষার প্রগতি কি? যে-শিক্ষা চলে, থেমে নেই। কেমন ক'রে চলে? অর্থাৎ শিশুদের শরীর ও মনের বৃদ্ধি ঘটিয়েই শিক্ষা, বিষয়বস্তু দিয়ে রুদ্ধ-বৃদ্ধি ঘটানো নয়। শিক্ষক বা শিক্ষিকা হবেন—পরিকল্পনাকারী, পরিচালক এবং সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি সদস্য।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এলিমেণ্টারী ইস্কুলের প্রথম কয়েকটী শ্রেণী তাই-ই বটে। নার্সারী আর কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই ভাবেই তো চলেন। সেখানে শিশুদের দিকটিই প্রথম ধরা হয়। সেখানে তাদের খেলার আনন্দ আছে, স্বাস্থ্যপরীক্ষা আছে, তাদের আচরণের পরিচালনা আছে—কোন বাঁধাধরা বিষযবস্তু নেই। কিন্তু তারপরের শ্রেণীগুলিতে তো এসব চলতে পারে না।

আর একটি নীতি হ'ল, শিক্ষা ছেলেদের প্রস্তুতির পথে কাজ করবে। তা বলা যায়, কারণ বৃত্তিগত শিক্ষায় সেই নীতিটিই থাকে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায়ও কি এই নীতি চলবে? তাঁরা বললেন, না-না প্রস্তুতি অর্থ তা নয়, প্রস্তুতি অর্থ—যে-ইস্কুলে পড়ছে আর যে-ইস্কুলে পড়তে যাবে এই দুটি মনে রেখে ভবিষ্যতের শিক্ষাগ্রহণের পথকে বর্তমান ইস্কুল সহজ-সরল ক'রে দেবে। তা হ'লে তো ভবিষ্যতই থাকল, বর্তমান-কর্তব্য প্রতিপালিত হয় না! ডিউয়ি নিজেও এবিষয়ে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন।

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতাগুলিকে বিকাশ করতে দাও। তাঁরা বলেন, জন্মেছে কতগুলি মানসিক শক্তি নিযে (faculties), সেই শক্তিগুলিকে বাড়িয়ে দাও। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে—কতগুলি অসম্পৃক্ত মানসিক শক্তির সমষ্টিই মানুষের মন নয, সেই শক্তির একটা অখণ্ড-পূর্ণতাই মানুষ। কাজেই শক্তি-অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় পড়ানো যায় না।

চতুর্থ নীতি হ'ল—স্ট্যান্‌লী হলের 'ব্যক্তির মধ্যে মানবসমাজের বিবর্তন-বাদের' অস্তিত্ব।

পঞ্চম নীতি হ'ল—জ্ঞানার্জনই শিক্ষার মূল। কিন্তু আমেরিকার শিক্ষা-

ব্রতী এ দুটিকেও যুক্তি আর গবেষণা দিয়ে খণ্ডন ক'রে দিলেন। তাঁরা প্রবর্তন করলেন শিক্ষার গণতান্ত্রিক দর্শন, অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিক্ষা, সমাজীয় হওয়ার শিক্ষা। এই গণতান্ত্রিক শিক্ষা-দর্শনের প্রচারক হচ্ছেন জন ডিউয়ি। মোটামুটি এই শিক্ষা-দর্শনের আলোচনা করতে হলে, প্রথম কথাই মনে রাখতে হবে—কামেনিয়াস থেকে এই চিন্তার উৎপত্তি। প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা, এই দাবীই তিনি করেছিলেন; কিন্তু ডিউয়ি আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর বক্তব্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়; পরিবেশ, বৃদ্ধি, চিন্তা, পরিচালনা, এবং অভিজ্ঞতা। জ্ঞান আহরণ করা সমাজ-নিরপেক্ষ হয়েও করা যায়, কিন্তু শিক্ষা সেভাবে হয় না। শিক্ষা মানেই বাস করা, অন্যের সঙ্গে, সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে বাস করতে শেখা; প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই আমরা শিখি না, পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবেই সব শিখি। কাজেই যত বিচিত্র স্তর এবং শ্রেণী থেকে ছেলেরা আসবে—ছেলেদের পরিবেশ ততই সমৃদ্ধ হবে। ইস্কুলে না থাকলেও, সমাজে সেই শ্রেণীস্তর তো আছেই। কাজেই সব স্তর থেকেই শিক্ষার্থীরা এসে ইস্কুলের পরিবেশকে সমৃদ্ধ করুক। এই পরিবেশকে এখন নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কাজেই এই পরিবেশ-বাছাই করে যেরূপ শিক্ষা দিতে হবে, সেই বিষয়-অনুসারী পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে। যেমন ছবি সম্পর্কে কিছু শেখাতে হ'লে চিত্রশালার পরিবেশে তাদের আনতে হবে, এখান থেকেই তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। এই যে নিয়ন্ত্রণ—এই নিয়ন্ত্রণের চরিত্রও পৃথক ধরণের; এই নিয়ন্ত্রণ আসবে সহযোগিতা আর সম-মনা ভাব থেকে।

বৃদ্ধি বলতে একটা কথা সমাজকে মনে রাখতে হবে—আজ ছেলেদের যে-ভাবে তৈরী করা হবে আগামীকাল ছেলেরা সমাজকে সেই ভাবেই তৈরী করবে। ছেলেরা কেন, প্রত্যেক মানুষই, আজকে থেকে কালকে অনেকটা বদলে যায়; এই যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া একেই বলা হয় বৃদ্ধি। ঠিকপথে এই বৃদ্ধি ঘটলে শিক্ষা সার্থক। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া ইস্কুলে যা সুরু হ'ল, ছেলেরা সমাজে পরিশেষে তাই-ই নিয়ে যাবে। শিক্ষা সেই মানসিক, আত্মিক এবং সামাজিক বৃদ্ধিরই সহায়ক হবে।

চিন্তা মানে এ নয় যে, কতখানি বিষয় সে মনে রাখতে পারে—চিন্তা অর্থে, বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি, যাকে বলা যায় বুদ্ধি। সেইজন্য তাদের চিন্তার স্বাধীনতা দিতে হবে। এই চিন্তার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা আসে; অভিজ্ঞতাও অপর চিন্তার উৎসাহের সঞ্চার করে। যে সব বিষয়ে তাদের আগ্রহ আছে—সেই সব থেকেই তারা চিন্তা করতে শিখুক। অভিজ্ঞতা আসে যখন শিশু কিছু বুঝতে পারে, আর সেই বোধের সঙ্গে তার মানসিক প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া জুড়তে যায়। এমনি ক'রে সে অভিজ্ঞতাকে সাজিযে, তৈরী করে, নানাভাবে দেখে; আর তাই থেকে তার শিক্ষা এগোয়।

পরিচালনা বলতে ইস্কুলের পক্ষে পরিবেশ পরিচালনা; পাঠ্যসূচীই হোক আর বিষয়বস্তুই হোক তাকে ছেলেদের প্রযোজন অনুসারে বিন্যাস ক'রে তুলে ধরতে হবে। সংক্ষেপে এই-ই হ'ল গণতন্ত্র শিক্ষা-দর্শন। ডিউযির এই মতবাদকেই ইস্কুল বেশী মান্য করে। হয়ত সমস্ত ইস্কুল সক্ষম হয় না, কিন্তু সক্ষম হ'তে চেষ্টা করে।

প্রশাসনিক দিক

এদিক দিযেও আমেরিকার বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা-সম্পর্কে ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্র শাসন-শক্তির কোন হাত নেই। শিক্ষা আমেরিকার ৪৮টি রাজ্যের নিজস্ব ব্যাপার। টমাস জেফারসন অথবা জর্জ ওযাশিংটন শিক্ষায় কেন্দ্রের ক্ষমতা রাখতে চান নি, তাঁরা চেযেছেন, রাজ্যগুলি আবশ্যিক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। ওযাশিংটন অবশ্য কেন্দ্র-শাসনাধীন বিশ্ববিদ্যালয় চেযেছিলেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালযের নাচের স্তরে কেন্দ্রকে টানতে চান নি, কাজেই যাকে বলে জাতীয়-শিক্ষা তার অস্তিত্ব নেই আমেরিকায়। এইজন্য রাজ্যে-রাজ্যে এমন কি সম্প্রদায-সম্প্রদাযেও ইস্কুল-নীতিতে একটু-আধটু বৈষম্য আছে। রাজ্যগুলি আঞ্চলিক (District) শিক্ষা-সংস্থা স্থাপিত ক'রে ইস্কুল-পরিচালনা করে। এমনি ক'রে আমেরিকা মনে করে, শিক্ষাকে একেবারে সর্বসাধারণের সহায়তায় তাদের ইচ্ছানুক্রমে চালানো হয়।

তবে কেন্দ্রীয়-ক্ষমতা যে একেবারেই উহ্য সেকথা বলা যায় না। যেমন

১৭৮৫ সালে শিক্ষার জন্য ভূমিপ্রদান ব্যবস্থা করা হল; ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ঐটিকেই আরও বলবৎ করা হয়। এই নির্দেশের প্রধান বক্তব্য "ধর্ম, নীতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই উত্তম রাজ্য-পরিচালনার লক্ষণ। কাজেই এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।' এই ভাবে পাবলিক ইস্কুলের জন্য সমস্ত সহরেরই কিছু অংশ প্রদান করা হয়। কিন্তু সব সহরের জমিরই তো সমান দাম নয়, তবে? কাজেই সমস্ত ভূমিই পরবর্তী-কালে রাজ্যকে সরাসরি দেওয়া হয়। তারাই এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করুক। সরকারের কতগুলি জমি আবার অনাবাদী এবং বসতি-বিহীন। কাজেই সেগুলির উন্নতির ব্যবস্থা ক'রে, বিলি ক'রে, তার থেকে টাকা নিয়ে, সেই টাকা রাজ্যকে দেওয়া হ'ল—আর সেই টাকার সুদেই ইস্কুলের ব্যয় নির্বাহ হ'তে থাকল।

ভূমি প্রদান ছাড়াও নগদ টাকার সাহায্যও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু দিল। যেমন ১৮৩৭ সালে প্রায় তিন কোটি ডলারের মতো উদ্বৃত্ত থাকল জাতীয়-আয়ে। এই টাকা রাজ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল, রাজ্যগুলি লোক-শিক্ষার খাতে সেই টাকা ব্যয় করল। তা ছাড়া লবণ, বন বা জলাভূমি রাজ্যকে দান ক'রেও রাজ্যকে শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে উপদেশ দেওয়া হ'ল। এ ছাড়াও ১৯২০ সালের 'মিনারেল লিজিং এ্যাক্ট' (Mineral Leasing Act) রাজ্যকে অনেকটা সাহায্য করল।

এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা-সংক্রান্ত তিনটি বিধান রচনা করেছিল—মরিল এ্যাক্ট ১৮৬২, হ্যাচ্ এ্যাক্ট ১৮৮৭, স্মিথ হিউজেস এ্যাক্ট ১৯১৭।

অন্তর্যুদ্ধের সময় দেখা গেল, দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক, কৃষি-বৈজ্ঞানিক এবং কারিগর শ্রেণীর বড় অভাব। সেই সময়ই দেশ বুঝতে পারল এই ধরণের ইস্কুল-কলেজ থাকা দরকার। মরিল এ্যাক্টে (Morrill Act) এই ধরণের কলেজ প্রতিষ্ঠার বিধান করা হ'ল! এই দরুন, বিভিন্ন রাজ্য ভূমি-খণ্ড পেয়ে তা বিক্রী ক'রে, ঐ রকম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তো চাই। কৃষিবিজ্ঞানে এই গবেষণা বিশেষ প্রয়োজন। কৃষি-বিদ্যার শিক্ষায়তন-সংলগ্ন এই গবেষণা বিভাগ থাকলে ভালো

হয় ; তাই ১৮৮৭ সালে হ্যাচ এ্যাক্টে (Hatch Act) বছরে প্রত্যেক রাজ্যকে ১৫০০০ ডলার দেওয়ার কথা হ'ল। ঐ টাকাতেই রাজ্য এইসব বিভাগ খুলবে।

বৃত্তিগত বিদ্যা শিক্ষার জন্য,শিল্প কারিগরী শিক্ষার জন্যও,শিক্ষায়তন দরকার। এই জন্যই স্মিথ-হিউজেস এ্যাকট (Smith Hughes Act) ১৯১৭ সালে রচিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারই অর্থ সাহায্য করল।

যখনই যে-বিষয়ের অভাব বোধ হয়েছে, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার আইন আর অর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, অন্ধদের, মূকবধিরদের —তা ছাড়া বিমান-চালনা, নাবিকের শিক্ষা প্রভৃতি নানা ধরণের অভাব কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করেছে। তবু কেন্দ্রীয় সরকারে কোন শিক্ষামন্ত্রী নেই, কোন পুস্তক বিভাগ নেই। অথচ হুভার কমিসন (Hoover Commission, 1931), কিংবা ১৯৪৯ সালের অর্থ-সাহায্যের আইন-খসড়া প্রমাণ করে, কেন্দ্রীয় সরকার এদিক দিয়ে উদাসীন নয়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে রাজ্য সরকার হয়ত নজর দিতে পারে না ; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নজর ঠিক আছে। কেমন ক'রে হয় ? হয়, কারণ শিক্ষামন্ত্রী না থাকলেও ১৮৬৭ সাল থেকেই একটি শিক্ষা-বিভাগ আছে। হেনরী বার্ণার্ড-ই ছিলেন শিক্ষার প্রথম কমিসনার। রাজ্যের ইস্কুল-ব্যবস্থার সমস্ত প্রকারের সংবাদ রাখাই এই বিভাগটির কাজ ছিল। ১৮৬৭ সালে এর নাম হ'ল অফিস অব এডুকেসন (Office of Education) ; তার পরের বছরই নাম হ'ল ব্যুরো অব্ এডুকেসন ; আবার ১৯২৯ সালে এর নাম হ'ল 'অফিস অব এডুকেসন'। ইস্কুল-ব্যবস্থার খবর রাখা তো কাজ ছিলই, তারপর ১৯০৩ সালে কর্তব্যের দিকও বাড়ল ঐ বৃত্তিগত শিক্ষা বিদ্যালয় প্রভৃতির পরিচালনা।

এরপরই আমাদের আলোচনা করতে হয়, বাধ্যতামূলক শিক্ষা-নীতির কথা।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা :

বাধ্যতামূলক ভাবে ইস্কুলে যোগদান করা অর্থ কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষা নয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা অর্থ প্রত্যেক শিশুকেই শিক্ষাদান করতে হবে।

আমেরিকার ১৬৪২-এর আইন ইস্কুলে যোগদানের কথা বলে নি; বলেছিল, প্রতি সহরের নির্বাচিত ব্যক্তিরা দেখবেন, কার কার ছেলে-মেয়ে শিক্ষা এবং কার্যে কি রকম ভাবে আছে। তাঁরা দেখবেন, সহরের ছেলেমেয়ে পড়তে পারে কিনা, ধর্ম এবং দেশের আইনকানুনের সঙ্গে পরিচিত কিনা। তারা কিভাবে পড়াশুনা করবে—সে কথার কোন হদিস নেই। ১৮৫২ সাল থেকে ইস্কুলে-যোগদান ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক করার দিকে মন দিল। বর্তমানে, ৪৮টি রাজ্যই এই 'বাধ্যতামূলক ইস্কুলে যোগদান' চালু করেছে। তবে কোন কোন ব্যাপারে এই নিয়ম শিথিলও করা হয়েছে; যেমন, বাড়ীতে পড়লে, শরীর মনের কতগুলি বাধা থাকলে, দারিদ্র থাকলে, ইস্কুল দূরে হ'লে, এবং কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকলে—ইস্কুলে যোগদান করতে বাধ্য করা হয় না।

কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার ধারণাটি কি ভাবে এল, সেকথা ভাববার।

অনেকে বলতেন, প্রুশিয়া থেকেই এই নীতিটির উদ্ভব। রাজাদের প্ররোচনায় যখন এই নীতির উদ্ভব, তখন স্বাধীন রাষ্ট্রে কি সে-নীতি মানা উচিত?

এই অভিমতের বিরুদ্ধে বলা হ'ল, রাজাদের ইচ্ছায় এ নীতি প্রবর্তিত হয় নি, হয়েছে—১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লুথারের অনুশাসন থেকে। এবং তাঁর কথাই অন্য প্রোটেস্টাণ্ট-ধর্মী দেশ, যথা জার্মাণী এবং ফ্রান্স, মেনে নিল। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ক্যালভিন জেনেভায় ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপন করতে বললেন, শিক্ষাকে করতে হবে সর্বজনীন।

কিন্তু প্রুশিয়াতে তো ১৭১৩-১৭১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই নীতির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল? বোধহয়, সে সময় এতটা কার্যকরী হয় নি।

অন্য একজন গবেষক বলেন (Ensign), এ নীতি প্রথমে ইংল্যাণ্ডেই দেখা যায়। তবে তিনি লুথার এবং ক্যালভিন-কে বাদ দেন নি; কিন্তু বলেছেন, আমেরিকাতে এই নীতি আনল ইংরেজ জাতি।

তিনি বলেন, ধর্মের সঙ্ঘর্ষ থেকে অর্থনৈতিক দিকই এই নীতিকে কার্যকরী করে আগে। সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়বার প্রাক্কালে ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে

যে অনুশাসন হ'ল—সেই অনুশাসনেই এর প্রথম সূত্র পাওয়া গেল। সেই অনুশাসনে ছিল, দেশের যুবকেরা যদি বাধ্যতামূলকভাবে পড়াশুনা না করে তবে তাদের কোন কাজে যোগ দিতে হবে। এই অনুশাসনটি অনুকরণ ক'রেই প্রুশিয়াতে ১৭১৭ সালে অনুরূপ বিধি প্রণয়ন করা হ'ল।

অষ্টম হেনরী ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষদের যে অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন, সে কথাও মনে রাখবার মতো। তিনি আদেশ করলেন, ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সের ছেলেরা যদি অলস ভাবে বা ভিক্ষা ক'রে দিন কাটায়, তবে তাদের যে-কোন কারখানাতে কাজ দাও, শিক্ষানবীশ থাকুক, আর এমন শিক্ষা দাও যাতে পরিণত বয়সে তারা নিজেরা কাজ কর্ম ক'রে খেতে পারে। একে বলা যায় বাধ্যতামূলক কারিগরী শিক্ষা। এই ব্যবস্থা সুনির্বাহ করবার জন্য কর-ও চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। এই কর-আইন ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে চালু হয়। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ এই আইনকে একটু সংশোধন করলেন। দরিদ্র-সন্তান-দের আবশ্যিক কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

আমেরিকা-তে এই ইংরাজ-পিউরিটানেরাই এই নীতি নিয়ে এল সাহিত্য-গত শিক্ষায়। প্রুশিয়ার ১৭১৭ সালের আইনের মতোই ম্যাসাস্যুসেট্-সের ১৮৫২ সালের আইন। তবে তখনও ঐ আইনটি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

ইয়োরোপে আমেরিকার প্রায় দুই শতাব্দী আগে থেকে এই নীতি প্রবর্তিত হ'লেও, এখনও কিণ্ডারগার্টেন এবং প্রাথমিক ইস্কুলের উপর স্তরে কার্যকরী হ'তে পারে নি। অর্থাৎ ৬ বয়স থেকে ১৪ বছর, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ বছর। কিন্তু এ-ও কম কথা নয়; এর ফলেই ইয়োরোপে নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। অবশ্য গ্রীস এখনও এই নিরক্ষর-সমস্যায় উদ্ব্যস্ত।

লাতিন আমেরিকাতে ১৯৩৪ এর আগে পর্যন্ত এ রকম বাধ্যতামূলক ইস্কুলের শিক্ষার কোন আইন ছিল না; তবে ১৯৪২ থেকে এই দিকে তারা মনোযোগী হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান সবাই এ দিক দিয়ে কিছু কিছু এগোচ্ছে।

ভারত এখনও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে, তবে এই নীতি অনুসরণ করবার দিকে অনেকটা পথ প্রস্তুত ক'রে এনেছে।

আমেরিকাতে এই নীতি সবাই যে সন্তোষের সঙ্গে প্রথম দিকে মেনে নিয়েছিল, তা নয়। এইজন্য, যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। দেখা গেছে, সব সময়েই জনমত ঠিক পথে চলবেই এমন কোন কথা নেই, রাষ্ট্রকে তখন গোঁয়ারের মতো কাজ করতেই হয়।

আমেরিকাতে প্রথম এগিয়ে এল, ম্যাসাস্যুসেটস। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য স্বীকার করল, যারা কারখানায় কাজ করছে তাদের অন্তত বছরে ১২ সপ্তাহ ইস্কুলে আসতেই হবে। এ বিষয়ে হোরেস ম্যান প্রথম দিকে বিরোধী হ'লেও, ইস্কুলের অবস্থা দেখে ১৮৪১ এর দিকেই মত পরিবর্তন করলেন। ১৮৫২ এর আইনে দেখা গেল, এই নীতি এই রাজ্যে কায়েমী হয়ে বসেছে। ১৮৭৩-এ বয়সের সীমাও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

তারপর এই পথে এল, কালেকটিকুট এবং নিউইয়র্ক। তবে এই দুই রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির সম্ভাবনা আগে থাকলেও, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক ছাড়া 'ইস্কুলে যোগদান' আইন চালু করা সম্ভব হয়নি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এই নীতির দ্রুত প্রসার ঘটে; নীচের দিকের বয়স যেমন কমিয়ে তেমনি উপরের দিকে বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

শিক্ষায় রাজ্যসরকার:

রাজ্য সরকারেরই সমস্ত ক্ষমতা ইস্কুল-স্থাপনার। রাজ্য সরকারই আইন কানুন তৈরী করে, আর তাই ইস্কুলকে মানতে হয়। রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন শিক্ষা-অঞ্চলে (School district) ইস্কুল-কর্মকর্তা সৃষ্টি হ'তে পারেনা। কোন ইস্কুল-বিভাগ রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া কর ধার্য করতে পারেনা, শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনা, পুস্তক খরিদ করতে পারেনা, শিক্ষায়তন নির্মাণ করতে পারেনা। শিক্ষকেরা ইস্কুলবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয় বটে, কিন্তু তারা রাজ্যসরকারেরই কর্মচারী। সরকারী শিক্ষা বিভাগ (State Department of Education) সরকারের বিধান বলে ক্ষমতা পায়। কিন্তু

আঞ্চলিক শিক্ষা সংস্থা (Local Districts) এই নির্দেশ সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে পায় না, পায় সরাসরি বিধানসভা থেকে। আঞ্চলিক শিক্ষা-সংস্থার সাহায্য করাই সরকারী শিক্ষা বিভাগের কাজ।

সরকারী শিক্ষাবোর্ড (State Board of Education):

এই বোর্ড গঠনে রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্য আছে। অনেক রাজ্যে একটি বোর্ড, অনেক রাজ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকগুলি। এই বোর্ডই রাজ্যের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ৯টি রাজ্যে কোন বোর্ড নেই। এই বোর্ড সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়েই কাজ-কাববার করে। এই বোর্ডে অনেক সদস্য পদাধিকার বলে, অনেকে গভর্ণব বা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত, অনেকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত। ৩০টি রাজ্যে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্য বেশী। সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ২১এর মধ্যে। নির্বাচিত সদস্য এবং সদস্য সংখ্যা নিয়ে বর্তমানে কিছু কিছু সমালোচনা চলছে।

শিক্ষাবোর্ডের কাজ নিয়ে রাজ্য থেকে রাজ্যে প্রভেদ আছে। কতগুলি রাজ্যে—রাজ্যের সাধারণ শিক্ষানীতি নিয়ে ভাবে, কতগুলি রাজ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ইস্কুল নিয়ে, কতগুলি রাজ্যে বৃত্তিগত শিক্ষা নিয়ে, কতকগুলি আবার উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে। ইস্কুলের প্রধান কর্মচারী এই বোর্ড-ই নিয়োগ করে।

ইস্কুলের প্রধান সরকারী কর্মচারী:

৪৮টি রাজ্যেই এই কর্মচারী আছেন। যদি এঁরা নির্বাচিত হন—তবে এঁদের নাম—লোকশিক্ষাব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent of Public Instruction), যদি মনোনীত হ'ন তবে নাম হয কমিসনার অব্ এডুকেসন। যেখানে বোর্ড নেই সেখানে তিনিই ইস্কুল-ব্যবস্থার সর্বেসর্বা। কার্যকাল ১ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত; সাধারণত ৪ বছর; মাহিনা? তা আছে। ৩৩০০ থেকে ২০,০০০ ডলার পর্যন্ত, এক-এক রাজ্যে এক-এক রকম মাইনে।

রাজ্যসরকার পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করে, সার্টিফিকেট দেয়, অর্থসাহায্য করে, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে, শিক্ষায়তন তৈরী করে। কাজেই এসবদিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা কমিসনারকে দেখতে হয়।

আঞ্চলিক শিক্ষা-সংস্থা :

রাজ্যসরকার কাজের সুবিধার জন্য রাজ্যকে ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করে নিয়েছে ; এদের নাম, কাউন্টি, টাউনশিপ, ডিষ্ট্রিক্ট ইত্যাদি। এদের মধ্য দিয়েই রাজ্যসরকার শিক্ষানীতি চালু করে।

এই বিভাগ একটি শিক্ষা-বোর্ড গঠন করে নির্বাচনের মাধ্যমে, সেই বোর্ড আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং শিক্ষক নিযোগ করে। এই বোর্ড—কর ধার্য করে, ব্যযের হিসাব পরিকল্পনা করে,—ইত্যাদি শিক্ষার যাবতীয় কাজই করে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই এগুলি দেখাশোনা করেন, তবে রাজ্যসরকারের অনুমোদন সবক্ষেত্রেই দরকার ; কিংবা রাজ্যসরকারেব শিক্ষানীতি মেনে চলতে হয়। আমেরিকাতে প্রায় ১২৫,০০০এর মতো আঞ্চলিক পরিষদ আছে। ২৪টি রাজ্যে এই বোর্ডের সদস্যসংখ্যা—৫ থেকে ১৫ ; ৮টিতে ৭ জন, ৬টিতে ৫ জন ; সদস্যদের নির্বাচনও করা হয, মনোনীতও করা হয় ; সদস্যদের কোন বেতন নেই। এই বোর্ড কেবল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিযুক্ত করে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী আছে, দপ্তরখানাও আছে। এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরই ইস্কুলের প্রত্যক্ষ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হচ্ছেন—প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ। এই অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আমেরিকার ইস্কুল-ব্যবস্থায় এই হচ্ছে প্রশাসনিক দিক। বহু ভাবে, বহু ভাগে বিভক্ত হযে ইস্কুল পরিচালনা করা হয।

পদ্ধতি :

প্রারম্ভে আমরা বলেছি, আমেরিকার ইস্কুলে পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে যত আন্দোলন তত অন্য কিছুতে নয। এই পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার একটু দরকার আছে।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মূলে আছেন—কামেনিয়াস, লক, রুশো, পেস্তালৎজী, ফ্রয়েবেল, হার্বার্ট। কামেনিয়াস সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম বলেছিলেন, সমস্ত পাঠ সতর্কতার সঙ্গে ভাগ ভাগ করা হবে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে পাঠদান করা হবে। তিনি চেয়েছিলেন, শিক্ষক ছাত্রদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে তাদের উপলব্ধির স্তরে পৌছবেন। কিন্তু ধর্মীয় বিরোধের আবর্তে প'ড়ে কামেনিয়াসের কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। লক বললেন, "মানুষের মন সাদা কাগজের মতো, ইন্দ্রিয়গ্রাম তথা সংবেদন এবং চিন্তাস্তরে যে-অভিজ্ঞতার ছাপ পড়বে—তাই-ই টিকে থাকবে।" তারপর রুশো তদানীন্তনকালের ইস্কুল শিক্ষা-পদ্ধতির অপচয়মূলক, অশিক্ষামূলক এবং কঠোর শৃঙ্খলামূলক পড়ানোর বিরোধিতা ক'রে প্রকৃতিবাদ প্রবর্তন করেন; রুশোর চিন্তাধারার অনেকটাই লকের থেকে নেওয়া। তিনি শিক্ষক হিসাবে তিনটি বিষয় তুলে ধ'রেছিলেন, প্রকৃতি, মানুষ এবং বস্তু। তারপর এলেন—জুরিখের পেস্তালৎজী। স্যুইটজারল্যাণ্ডে তাঁর কর্মস্থান ছিল ১৮০০ থেকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এখানেই সারা ইয়োরোপ আর আমেরিকার শিক্ষা-ব্রতীরা তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করতে ছুটে আসতেন। তিনি প্রচার করলেন—শিক্ষা হচ্ছে টেনে বের করা পদ্ধতি, কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। তিনি রুশোর প্রকৃতিবাদ এবং সংবেদজ জ্ঞানের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পেস্তালৎজীর পদ্ধতি যেমন খুব বৈজ্ঞানিক নয় তেমনি ব্যবহারিকের পক্ষেও সুবিধার নয়। তবু তাঁর প্রভাব ইয়োরোপ আর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পেস্তালৎজীর শিক্ষাপদ্ধতি আমেরিকায় এল। প্রাথমিক ইস্কুলে তাঁর পদ্ধতিই তখন মেনে নেওয়া হ'ত। পূর্বেকার মুখস্থ-বিদ্যা হ্রাস পেয়ে গেল, তার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনাও হ'ল। ছাত্রদের বয়োবৃদ্ধি মেনে বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করা হ'তে লাগল, তখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রভাব আসে নি। পেস্তালৎজীর পদ্ধতি সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর যতটা, ততটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নয়। এই হ'ল তাঁর ত্রুটি। তাঁর এই দিকটি সংশোধন করতে চাইলেন ফ্রয়েব্‌ল আর হার্বার্ট। ফ্রয়েব্‌ল প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করলেন, আর হার্বার্ট করলেন মাধ্যমিক-

শিক্ষাকে। আমেরিকার লাতিন গ্রামার ইস্কুলে তখন 'মানসিক শক্তি'-বাদ (faculty theory) এবং মুখস্থশক্তি খুব চলছিল। এই সময়েই হার্বার্টের পদ্ধতি এদেশে এল। ১৮৯০ থেকেই হার্বার্টের প্রভাব এদেশে আসে। হার্বার্ট মনকে শক্তিতে শক্তিতে বিভক্ত না করে—একটি সামগ্রিক, পূর্ণ ব'লে স্বীকার করলেন। কাজেই মানসিক শক্তিবাদ পিছু হটে গেল। তিনি ছেলেদের 'অনুরাগ' এবং বয়সের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাকে মেনেছিলেন, কিন্তু শিক্ষকদের কর্তব্যের উপরই তাঁর বেশী জোর পড়ল। তাঁর সেই পঞ্চ-স্কন্ধী পাঠটীকা আজও অনেক দেশে বেঁচে আছে, তবে আমেরিকাতে তাঁর প্রতিপত্তি গেল মরিসনের আক্রমণে। তাঁর ঐ সংপ্রত্যক্ষ-জ্ঞান কথাটি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষালয় বেশ মেনে নিল। তিনি মুখস্থবিদ্যাকে বরবাদ করেছেন, তিনি অনুমোদন করেছেন—উপলব্ধি এবং অনুষঙ্গ নির্মাণ। ১৯১০ সাল থেকেই হার্বার্টের পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযান চলে। জন ডিউয়ি তখন শিক্ষাক্ষেত্রে। হার্বার্ট শিক্ষকের উপর জোর দিয়েছিলেন, জন ডিউয়ি দিলেন শিক্ষার্থীর উপর; হার্বার্ট সংপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মেনেছিলেন, কিন্তু নতুন পদ্ধতিকার—সেই অভিজ্ঞতাকে সচল বললেন, ক্রমাগত শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতাকে ভাঙে, গড়ে নতুন ক'রে সৃষ্টি করে। কাজেই নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী উঠে গিয়ে এল সক্রিয় শিক্ষার্থী। তাদের সেই ক্রিয়াশীল মনকে পরিচালনা ক'রে এবারে সমাজীয় করতে হবে। মানসিক শক্তি শিক্ষার্থীর কি আছে, না আছে, দেখবার দরকার নেই, দরকার হচ্ছে তাদের প্রথম সমাজীয় করে তোলা। প্রথমে ব্যক্তির বিকাশ, পরে সহযোগী মনের সৃষ্টি না ক'রে, প্রথমেই সমাজীয় ক'রে তুলে পরে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাতে হবে। আমেরিকার ইস্কুলে তাই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগও যেমন দেওয়া হয়, তেমনি সমাজীয় ক'রে তোলা হয়। শিক্ষা হবে স্বাভাবিক এবং আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত। শিক্ষার্থীর কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষা অগ্রসর হবে।

পদ্ধতির এই দর্শনই হচ্ছে মূল; কিন্তু ইস্কুলের করণীয় কি? কেমন ভাবে পড়াবে? সেই রূপের মধ্যে এসে দাঁড়াল—বক্তৃতা এবং পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি, প্রোজেক্ট বা পরিকল্পনামূলক পদ্ধতি এবং প্রোব্লেম বা সমস্যা পদ্ধতি,

সোশ্যালিজেসন বা সমাজীয় পদ্ধতি, ল্যাবরেটরী বা কর্মশালা পদ্ধতি প্রভৃতি।

বক্তৃতা পদ্ধতি : এই পদ্ধতির উপর অনেকেরই আক্রোশ। পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষক পাঠসম্পর্কে কোন বর্ণনা করবেন কি না। ইস্কুলের কর্মকর্তারা বলেন, না, শিক্ষক কিছু বলবেন না। অথচ কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐটিই চলে।

'বক্তৃতা' কথাটা অবাস্তব, নাম হওয়া উচিত পাঠ-ব্যাখ্যা। আগেকার দিনে মনীষীদের পাণ্ডুলিপি পড়ানো হ'ত, তাকে ব্যাখ্যা না ক'রে দিলে ছাত্রেরা বুঝতে পারত না; তাই থেকে এই পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এল। আমেরিকার ইস্কুলে এর অনুমোদন না থাকলেও, এই পদ্ধতিতে জার্মানী, ফ্রান্স্, ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রভূত উপকার পাওয়া গেছে। কাজেই একে নাকচ ক'রে দেওয়া আমেরিকার শিক্ষাব্রতীরা খুব ভালো চোখে বর্তমানে দেখছেন না।

এই পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের মিল আছে কিনা দেখা যাক। মাধ্যমিক ইস্কুলেও বিষয়বস্তু অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিক্ষককে পাঠের মধ্যমণি না-করে সরিয়ে রাখার নীতিই অনেকটা এই বিরুদ্ধ অভিযানের জন্য দায়ী। আচ্ছা, তাঁদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা চান, ছেলেরা সক্রিয় হোক। তারা কাজ করতে করতে শিখুক। কাজ করা ক্রিয়াজ শিক্ষা, ক্রিয়াজ শিক্ষা চেষ্টা-কেন্দ্র (motor nerve centre) থেকে আসে। 'মানসিক ক্রিয়া'কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? হাঁটতে শেখা ক্রিয়াজ শিক্ষা, কিন্তু 'ভাবতে' শেখা—মানসিক ক্রিয়া ঘটিয়ে। এই মানসিক ক্রিয়া হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়া (Self-activity)। কি করে এই স্বয়ংক্রিয়া ঘটে? সেকথা এঁরা কেউ বললেন না। কেউ কেউ বলেন, যখন ছেলেরা বই পড়ে তখন তা হয় স্বয়ংক্রিয়া, কিন্তু যখন পড়া শোনে তখন আর স্বয়ংক্রিয়া নেই। একজন শিক্ষাব্রতী বলেছেন, এই ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত (Such an assumption is foolish)। বই পড়ে যখন জ্ঞান আহরণ করে তখন যদি স্বয়ংক্রিয়া ঘটে, তবে সেই বিষয়বস্তু শুনবার সময় স্বয়ংক্রিয়া ঘটবে না কেন? কারণ হচ্ছে, প্রথম ক্ষেত্রে বইয়ের লেখা চোখের মধ্য দিয়ে

মনে আসবার প্রক্রিয়া থেকে তার স্বয়ংক্রিয়া ঘটে; আর শেষের বেলায় তা ঘটে না। কিন্তু শেষের বেলায় কি হয়? শিক্ষকের কথা কানের মধ্য দিয়ে মনে পৌছে। ছাত্র তাঁর মুখ থেকে শব্দ নিজের কানে নিয়ে মনে পৌছে দেয়। শেষের বেলাতেই তো ইন্দ্রিয় এবং মানসিক ক্রিয়া বেশী ঘটবে। তা ছাড়া আছে, শিক্ষকের বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের ছাপ। তবু বিরোধী দল বলেন—ব্যাখ্যাকরণ পাঠে ছেলেরা নিষ্ক্রিয় থাকে। নিষ্ক্রিয় কাকে বলে? টাইপরাইটিং শিখতে গেলে—তারা ক্রিয়াশীল, সেখানে বক্তৃতা চলে না। কিন্তু সব শিক্ষাই তো আর টাইপ রাইটিং শিক্ষা নয়! কাজেই বিষয়বস্তুর রকমফেরে, বিষয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ চালাতে হবে। অঙ্কের বেলায় ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ বেশী দরকার, অনুশীলনী দরকার—কিন্তু কবিতা পাঠের বেলায়? বই থেকে কবিতা পড়তে দিলে ছাত্রদের রসগ্রহণ-ক্ষমতা জন্মে না, সেখানে শিক্ষককে বক্তৃতাপদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। ক্রিয়া, আত্মক্রিয়া, স্বয়ংক্রিয়া সবই হচ্ছে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার উপকরণ, সেগুলিই উদ্দেশ্য নয়। এ ধারণা ভুল যে, ছেলেরা চুপচাপ বসে শিক্ষকের কথা শোনে বলেই—তাদের ভিতরে কাজ হয় না; ঐ যে অনুভূতির রাজ্য—ওকে খেলাতে গেলেই তাদের সব সময় মনেপ্রাণে সচল থাকতে হয়। অনেক সময় শিক্ষক বক্তৃতাপদ্ধতিতে ঘণ্টার বহু সময় অপচয় করেন, পাঠশেষ ক'রে উঠতে পারেন না; সে তো পদ্ধতির দোষ নয়, শিক্ষকের। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিলে চলবে কেন? কাজেই বিষয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষাব্রতীরা ইস্কুলেও বক্তৃতাপদ্ধতিকে অনুমোদন করেছেন। যে-পাঠের মোটামুটি ধারণা দিতে হবে, যেখানে ছাত্রদের পাঠ-পরিধিকে বিস্তৃত করতে হবে, যেখানে পাঠের ভূমিকা দিতে হবে, যেখানে ছাত্রদের সময়কে বেশী পাঠে নিযুক্ত করতে হবে, যেখানে পাঠে আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগাতে হবে, যেখানে সংজ্ঞা দিতে হবে, সমালোচনা করতে হবে সেখানেই বক্তৃতা-পদ্ধতি চলতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার পদ্ধতি নিয়েও এমনি ভুল ধারণা আমেরিকাতে ছিল। কারণ পাঠ্যপুস্তক আনত অনেকটা মুখস্থ করার প্রবণতা। ছেলেরা মুখস্থ

ক'রে শিক্ষকের সামনে পাঠ বলত, আর শিক্ষক তাই মেনে নিতেন, দেখতেন না তাদের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক হচ্ছে পাঠের মূল ভিত্তি। ওকে বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই বর্তমানে সেখানে পূর্বেকার ত্রুটি সংশোধন ক'রে পাঠ্যপুস্তক অনুমোদিত হচ্ছে। একটা অনুমোদন হচ্ছে—শিক্ষক এবং ছাত্র সহযোগী হয়ে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে। শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন—পাঠ্যপুস্তকের বক্তব্য কি ভাবে বোঝা যায়, কি ভাবে আয়ত্ত করতে হয়। একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন ক'রে পাঠের কাজ ভালো হয়। তবে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। সময় সময় অধিকতর সংখ্যায় পুস্তক ব্যবহার করাও চলে। অর্থাৎ শিক্ষকের উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করে।

প্রোজেক্ট মেথড :

ইস্কুলের শিক্ষক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবার পূর্বে ইঞ্জিনীয়ার এবং সার্ভেয়ার-রাই এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। বোধহয় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই ইস্কুলের শিক্ষায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। কারণ, তাঁরা মামুলী শিক্ষা-পদ্ধতির বিরোধী। তার পূর্বে ছাত্রদের মডেল অনুকরণ ক'রে হাতের কাজ করতে বলা হ'ত। কিন্তু এই অনুচিকীর্ষা-পদ্ধতির বহু দোষ দেখা যায়। এই প্রোজেক্ট মেথডের গুণ হ'ল—ছেলেরাই নিজেরা কি করতে হবে স্থির করবে, তারপর তারাই বস্তু নির্মাণ করবে। ম্যাসাস্যুসেট্‌স-এ ব্যক্তিগত এবং কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হ'ল। তারপর বাগান তৈরী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি এল। শারীরিক শ্রম শিক্ষা এবং নক্সা বা পরিকল্পনা করা—এই পদ্ধতির এই দুটিই দিক তখনও।

১৯১৮ সালে কলাম্বিয়া বিশ্বত্যালয়ের কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতির এক সংজ্ঞা দিলেন এই বলে যে, "সামাজিক পরিবেশের দিকে গতিরেখে সর্বান্তরিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত যে ক্রিয়াকর্ম তাকেই প্রোজেক্ট বলা যাবে।" তারপর ব্যাখ্যা করলেন স্টিভেনসন, "প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে সমস্যামূলক কাজ-কে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া তাই-ই প্রোজেক্ট।"

(1. Wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment—Kilpatrick.)

(2. A project is a problematic act carried to completion in its natural setting—Stevenson.)

কিন্তু সংজ্ঞা দুটিই অস্পষ্ট থাকল; সংক্ষিপ্তি এই অস্পষ্টতার জন্য দায়ী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি যখন এল, তখন কর্মপ্রধান কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচীর সঙ্গে এই প্রোজেক্ট কথাটির গোলমাল জুড়ে গেল। অনুষ্ঠান-গত (Extracurricular) কার্যক্রমের সঙ্গে এর তালগোল পাকিয়ে ফেললে তো চলবে না। শিক্ষাব্রতীরা বলেন, প্রাথমিক ইস্কুলে, পাঠ্যসূচীকে কতগুলো কর্তব্য-কর্মে নির্বাহ করার কথা; পাঠে বিভক্ত করার কথা নয়; যেমন অঙ্ক শিখতে তারা খেলা-খেলা ব্যাঙ্ক খুলবে, দোকান খুলবে, ইতিহাস পড়তে তারা নাটক-অনুষ্ঠান করবে; মডেল তৈরী করবে, ইস্কুল সাজাবে আর কত কি কাজের মধ্য দিয়ে পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য সার্থক করতে হবে। মাধ্যমিক ইস্কুলে, ভাষা পড়ানোর বেলায়—খবরের কাগজ থেকে বাক্যাংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখবে—কোন্ ভাষা থেকে সেই বাক্য বা বাক্যাংশের উদ্ভব ইত্যাদি। অসুবিধা হচ্ছে, যদি প্রোজেক্ট-কে কর্মের দিক বলা হয় আপত্তি নেই, কিন্তু পড়ানোর পদ্ধতি হিসাবে দেখলেই তো গোল বেধে যায়। যেমন ধরুন, ইতিহাসের অংশ অভিনয়-করাকেই তো আর প্রোজেক্ট বলা যায় না; প্রোজেক্টের মধ্যে থাকবে—কাজের দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কার্য ছাত্রদের দিয়ে নির্বাহ করতে শেখানো। কোন কিছু ক'রে যাওয়াই তো আর প্রোজেক্ট নয়। কোন-কিছু-করতে-পারাকে কর্ম-ই বলুন, প্রোজেক্ট নয়। তা ছাড়া দেখা গেছে, প্রোজেক্টের মধ্য দিয়ে সব কিছু শেখাতে গেলে অনেক 'সময়' নেয়, অনাবশ্যক বড় হয়ে ওঠে পাঠটি। শিক্ষার উদ্দেশ্যটি ছেলেদের বয়সের মাপের মধ্যে সাধিত হয়ে উঠতে পারে না। কাজেই সব ক্ষেত্রেই প্রোজেক্ট-পদ্ধতি আজকাল আর শিক্ষাব্রতীরা অনুমোদন করেন না। ছেলেদের পাঠের উদ্দেশ্য—জ্ঞান আয়ত্ত করা এবং উপলব্ধির স্তরকে উন্নত করা। তারা নিজেরাই কাজের ছক কাটবে—তাকে রূপায়িত করবে; তাদের দায়িত্ব-

জ্ঞান বর্ধিত হবে, কাজে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ করতে শিখবে। এই উদ্দেশ্য সব বিষয় দিয়ে ঢালাও ভাবে হয় না। যে-পাঠের যে-উদ্দেশ্য তাকে সহজসাধ্য করতে বিশেষ পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। আবার শিক্ষকের কোন দরকার নেই, এমন কথাও বলা চলেনা; প্রোজেক্টের মধ্যেও অনেক সময়ই শিক্ষকের নির্দেশ দিতে হয়। কাজেই, ছাত্রদের ক্ষমতা, প্রতিন্যাস প্রভৃতি মান্য ক'রেও এই পদ্ধতির মৌলিক-সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করা দরকার।

প্রোব্লেম মেথড সম্পর্কেও একই কথা। প্রোব্লেম মেথড দুরকমের হ'তে পারে; পাঠটি এমন ভাবে ভাগ করা যাবে যাতে একটা আশু সমস্যা দেখা যায়, সেই সমস্যা সমাধান করতে ছেলেদের বেশী সময় না লাগে। কিন্তু পাঠকে এমন ভাবে গ্রথিত ক'রে দেওয়া যায় যাতে ছেলেদের বেশ কিছুকাল দরকার সমাধান করতে। কালের পরিমাণ অনুযায়ী, ছেলেদের বুদ্ধি, ক্ষমতা অনুযায়ী এই প্রোব্লেম সৃষ্টি করতে হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ছেলেদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভাগ করে দেওয়া যায়, ব্যক্তিগত ভাবেও হতেও পারে। তবে গোষ্ঠীগত আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সমাধান করিয়ে নেওয়া আমেরিকার ইস্কুলের শিক্ষক পছন্দ করেন বেশী। যে সমস্যা যুক্তি-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখেনা, তা পাঠ্যপুস্তক আলোচনা করে সমাধান করতে বলা যায়। কিন্তু যে সমস্যায় যুক্তি এবং চিন্তন-প্রক্রিয়া বিশেষ মাত্রায় দরকার, তা গোষ্ঠীগত আলোচনায় সহজসাধ্য হয়।

ল্যাবরেটরী মেথড:

সব ইস্কুলেই একরকম ল্যাবরেটরী মেথড প্রয়োগ করা হয় না। এই মেথডে কি করতে হয়? ছাত্রদের নির্দিষ্ট কাজ করতে দেওয়া হয় শ্রেণীকক্ষে; শিক্ষক তাদের সঙ্গে কাজ করতে করতে তাদের ভুল সংশোধন ক'রে দেন, উৎসাহ দেন। সময় সময় কাজ থামিয়ে জটিল বিষয়গুলি শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। এই হচ্ছে এই মেথডের সাধারণ নিয়ম।

লেখা-পড়ার কাজও এমনি পদ্ধতিতে চলতে পারে। একই শ্রেণীকক্ষে

দেখা যাবে—কেউ অভিধান খুঁজে শব্দ ব্যাখ্যা বের করছে, কয়েকজন হাড় বা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, কেউ মানচিত্র দেখছে, কেউ বা শিক্ষকের সঙ্গে জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

কোন ইস্কুলে আবার রকমফের আছে। শ্রেণীর কাজের সঙ্গে ল্যাবরেটরীর কাজ মিশিয়ে দেওয়া হয় এখানে। কোন সমস্যা আর তার নির্দেশ দেওয়া হ'ল; ছাত্রেরা নিজেরা সেইগুলি ক'রে যাবে, দরকার হ'লে শিক্ষকের সাহায্য নেবে। শিক্ষক হয়ত তখন অন্য গোষ্ঠীর অন্য ধরণের কাজ করছেন। এখানে শিক্ষকের পরিদর্শন কাজটি তেমন অব্যাহত চলেনা।

কিন্তু এই মেথডের অসুবিধাও আছে। অনেক সময়ই এই পদ্ধতির পড়া কলের মতো চলে। খুব একটা বুদ্ধিদীপ্ত কাজ হয় না। শিক্ষককে সেইজন্য পাঠের উদ্দেশ্যের প্রতি খুব সতর্ক থাকতে হয়। যদি তিনি দেখেন যে, পাঠের উদ্দেশ্য অন্য কোন পদ্ধতিতে বেশী সিদ্ধ হবে, তবে তিনি সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। অর্থাৎ, পাঠ-টিতে বুদ্ধির কাজ কতখানি, আর বাঁধাধরা বা গতানুগতিক কর্মের দিক কতখানি। যদি গতানুগতিক কাজ হয় এই পদ্ধতি চলতে পারে; এতে বৈচিত্র্য সাধন করা যাবে। কিন্তু বুদ্ধির কাজ হ'লে অন্য পদ্ধতি প্রযোগ করা ভালো।

এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তই হচ্ছে ডালটন ল্যাবরেটরী প্ল্যান। ডালটন কোন ব্যক্তির নাম নয়; ম্যাসাস্যুসেটস-এর অন্তর্ভুক্ত ডালটনের ইস্কুলের নাম। পার্কহার্স্ট এই পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর সে পরিকল্পনা একটু সংস্কার ক'রে এখন অনেক ইস্কুলেই ব্যবহৃত হয়।

ডালটন প্ল্যানে সমস্ত বিষয়ের একটি ক'রে ল্যাবরেটরী বা প্রদর্শ-শালা ক'রে দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে বিষয়ের একটি ক'রে কাজের চুক্তিতে নামানো হয়। সেই কাজ কি, তার সম্পর্কে কোন্ কোন্ বই দেখতে হবে, কোন্ কোন্ উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, তার এক নির্দেশ সম্বলিত তালিকাও তাকে দেওয়া হয়। তারপর সে সেই কাজ নিয়ে প্রদর্শশালায় গেল। কতদিন এ কাজ করতে হবে—তার কোন নির্দেশ থাকে না; তবে এইটুকু উল্লেখ

থাকে যে, এ কাজটি সম্পন্ন না-করা পর্যন্ত সে অন্য কাজ পাবে না। অনেক সময় কাজের মেয়াদ এক মাসও থাকে।

পদ্ধতিটি মন্দ নয়; কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে—মেয়াদটা ছাত্রের উপর নির্ভর না করলেই হ'ত। তা ছাড়া বোধশক্তির চেয়ে—পুস্তক আলোচনা করার শক্তি বড় হয়ে যায়। উপরন্তু, এতে গোষ্ঠীগত শিক্ষা ব্যাহত হয়; একেবারে ব্যক্তিসর্বস্ব এই পড়া। কাজেই এ-কে সংস্কার ক'রে নিয়ে অনেক ইস্কুল এই পদ্ধতি প্রয়োগ করছে।

সমাজীয় পদ্ধতিঃ

পুরনো ইস্কুলে শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতেন। সে-ছাত্র জবাব দিতে পারল ভালো, নতুবা আর একজনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল। এই পদ্ধতিতে পাঠটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হয়ত শিক্ষক নিজেই পাঠ সম্পর্কে বলে গেলেন।

এই পদ্ধতির বিরুদ্ধেই এল নতুন সমাজীয় পদ্ধতি। অর্থাৎ পাঠ-কে সকলের বা সর্বজনীন করতে হবে। কি করে? পাঠটিকে ভেঙে ভেঙে এককেটি সমস্যায় ফেলা হ'ল। শিক্ষক পড়াতে আসবার আগেই এটি ক'রে নেবেন। তারপর কোন ছাত্রকে সামনে এসে সেই অংশের আলোচনা করতে বলবেন। সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে—অন্যান্য ছাত্র, অথচ বিতর্ক নয়। এমনি ক'রে গোষ্ঠীগত আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠ-কে অগ্রসর করাই সমাজীয় পদ্ধতি।

কিন্তু অসুবিধা হয় তখন, যখন আলোচক ছাত্রটি উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন না হয়। সেই সময় অলোচনা বড় নিম্নস্তরে নেমে যায়। ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকে। তা ছাড়া, আলোচনা ছাত্রদের উপর নির্ভর করলে—ছাত্রদের মানসিক স্তরের উপর নির্ভর করে পাঠের চরিত্র। এক্ষেত্রে তো, শিক্ষকের পক্ষেই আলোচনার স্তর উন্নীত ক'রে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ পুরনো-পদ্ধতির বক্তৃতা।

তা ছাড়াও অসুবিধা আছে; আলোচক ছাত্র নায়ক হিসাবে গণ্য হ'ল

শ্রেণী কক্ষে। এদিক দিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসতে পারে; শিক্ষক নিষ্প্রভ হ'য়ে যেতে পারেন, অনাবশ্যক তর্ক-বিতর্ক উঠতে পারে।

অথচ এর ভালো দিকও বহু। ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আসে, পাঠে তাদের আগ্রহ জন্মে। কাজেই সুনিপুণ শিক্ষক না-হ'লে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। আর যদি শিক্ষক নিপুণ হ'ন—তবে ছেলেদের বাচনভঙ্গী জন্মাবে, যুক্তি-প্রয়োগ ক্ষমতা আসবে—বিষয়বস্তুর নানাদিক দেখবার ক্ষমতা জন্মাবে।

সঙ্ক্ষেপে বলতে গেলে, আমেরিকার ইস্কুলে বর্তমানে এই সব পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। তবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই প্রথম দিকে যেমন উৎসাহ থাকে শেষের দিকে তা স্তিমিত হয়ে আসে, তার মধ্যে অনেক অসুবিধা দেখা যায়; তখন আবার তার সংস্কার চলে, আবার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা ওঠে। দেখেশুনে মনে হয়, আমেরিকার শিক্ষকেরা সর্বদাই নতুন কিছু করার পক্ষপাতী। তবে সুবিধা এই, এমনি করে পড়ানো-শোনানোয় এক-ঘেয়েমি অনেকটা কেটে যেতে পারে। যা-কিছু বিপদ তা আসে কোন পদ্ধতির গোঁড়া মতবাদীদের কাছ থেকে। এই পদ্ধতিগুলি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি নীতির উপর: (১) শিক্ষার্থীকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ধরতে হবে, (২) শিক্ষার্থীকে সমাজীয় করতে হবে, (৩) বিষয়বস্তুর চেয়ে ক্রিয়াজ শিক্ষার প্রাধান্য দিতে হবে। এই তিনটিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করবার জন্য পদ্ধতির পর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'তে থাকে। ছাত্রই যে প্রধান অঙ্গ সেই কথা মরিসন প্ল্যান থেকেও বোঝা যায়। মরিসন হার্বার্টের পরিকল্পনাকে তুলে দিলেন। হার্বার্ট জোর দিয়েছিলেন শিক্ষকের কর্তব্যের উপর। তাঁর পাঠ-পরিকল্পনার পঞ্চস্কন্ধে ছিল:

(১) **প্রস্তুতি বা আয়োজন (Preparation)**: পাঠের উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয় এই স্তরে; ছাত্রদের পাঠ-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মে দেওয়া হয়; তাদের বর্তমান পাঠের সম্পর্কীয় পুরনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আলোকিত করা হয়। আরোহ প্রণালী এই স্তরে বেশী কাজে লাগানো হয়।

(২) **উপস্থাপন (Presentation)**: এই স্তরে নতুন বা বর্তমান

পাঠ দেওয়া হয় ; অনেক উপায়ে এই পাঠ দেওয়া হ'তে পারে—যেমন, প্রশ্ন ক'রে, আলোচনা ক'রে, পড়িয়ে, বক্তৃতা দিয়ে। তবে চতুর্থস্তরে যে সাধারণীকরণ হবে তার দিকে নজর রেখেই এই উপস্থাপনের কাজ চলে।

(৩) **তুলনা বা অনুষঙ্গ নির্মাণ (Comparison) :** এখানে নানা অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যে বর্তমান পাঠ-কে আনা হয় ; সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি কোন বৈষম্য থাকে তা দেখানো হবে, সাদৃশ্য থাকলে তাও বলা হবে ; এই স্তরটি চতুর্থ-স্তরের অনুপূরক, বলতে গেলে এই স্তরের কাজ সিদ্ধ হ'লেই চতুর্থ-স্তরটি আপনি-আপনি এসে যাবে।

(৪) **সাধারণীকরণ (Generalisation) :** আরোহ প্রণালীর এই স্তরটিই হচ্ছে শীর্ষভাগ। তৃতীয় স্তরে যে সংজ্ঞা বৈষম্য প্রভৃতি দেখানো হ'ল —সেই সূত্র ধরেই ছাত্রেরা এই সাধারণী কৃতিতে পৌছবে।

(৫) **অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application) :** এটি আসবে চতুর্থ স্তরের সিদ্ধান্তের পর। ঐ স্তরে যে সিদ্ধান্তে পৌছনো গেল—তাকেই এখানে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তারা এই পাঠের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে কিনা দেখা হবে।

প্রত্যেক পাঠে এই পাঁচটি ধারায় হার্বার্ট শিক্ষকদের কর্তব্য বেঁধে দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় শিক্ষকই যেন এখানে যাদুদণ্ড, তাঁরই প্রেরণায় ছাত্রেরা করণীয় খুঁজে পাবে। পাঠ-পরিচালনা হয়ত আছে— কিন্তু শিক্ষক এখানে বড় বেশী সক্রিয়। হার্বার্টের বিরোধিতা ক'রে মরিসন যে পঞ্চধারা যোগ করলেন, তা হচ্ছে—

(১) **সন্ধানী কাজ (Exploration) :** এই স্তরে শিক্ষককে জেনে নিতে হবে নতুন পাঠের পক্ষে ছেলেদের কি রকম মানসিক-ক্ষেত্রের প্রয়োজন। লিখিত-পরীক্ষা, বা মৌখিক আলোচনার মধ্য দিযে শিক্ষক এই মানসিক ক্ষেত্রকে জেনে নেন।

(২) **আয়োজন (Preparation) :**—শিক্ষক এখানে কথায় বা বক্তৃতায় নতুন পাঠের আবশ্যক দিকগুলি অবতারণা করেন। তারপর একটি টেস্ট বা অভীক্ষা পত্র ছেলেদের উপর প্রয়োগ করা হয়। এই পরীক্ষা থেকে

শিক্ষক দেখেন, ছেলেদের মনে এই নতুন বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে কিনা। যদি ব্যর্থ হয়, তবে আবার বলতে হবে। বিষয়বস্তুর সহজ ধারণা ছেলেদের এ স্তরে হতেই হবে।

(৩) **আত্তীকরণ (Assimilation) :** ছাত্র এখন বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য বিষয়-বস্তুর প্রধান প্রধান অংশ আয়ত্ত করে নেবে। এই সময় তারা পড়ে, লেখে, পরস্পর আলোচনা করে, শিক্ষককে জিগ্‌গেস করে। এর মধ্যে আসে পরিচালিত-পাঠ (**supervised study**)-পদ্ধতি, ল্যাবরেটরী বা কর্মশালা পদ্ধতি। এখানে ব্যক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী পাঠ পরিচালিত করা হয়।

(৪) **বিন্যাস করণ (Organisation) :** এবার সমস্ত ছেলেকে একত্র করা হবে, প্রত্যেক ছাত্রকে লিখতে বলা হবে। লিখবে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে, নিজের মতো করে—যাতে অন্যে তার লেখা পড়লেই তার যুক্তিতে পরিচালিত হ'তে পারে ; যে পাঠটি তারা পড়ল, সেইটি যা বুঝল তাই লিখতে হবে।

(৫) **আবৃত্তি করা (Recitation) :** আবৃত্তি অর্থ মুখস্থ করা নয়, সে যা লিখেছে তা শিক্ষক দ্বিতীয় স্তরে যেমন ক'রে বলেছেন—তেমনি ক'রে সহপাঠীদের সামনে বলতে হবে। অনেক সময় তার নিজস্ব রচনাটিও পড়ানো হয়। এই ব্যাপারে সময় অনেক বেশী লাগে। কাজেই করা হয় কি, চার-পাঁচজন ছাত্রকে মিলিয়ে আলোচনা-চক্র মতো বসানো হয় ; সেখানে একজন তার বক্তব্য বলে—আর কয়জন তার আলোচনা করে। এমনি ক'রে সময় থাকলে অন্য একটি গোষ্ঠীকে ডাকা হয় ক্লাসের সামনে।

কিন্তু মরিসনের পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয় যখন, ঠিকমতো পাঠের 'ইউনিট' বা মাত্রা ঠিক ক'রে নেওয়া হয়। মাত্রাজ্ঞানহীনের মতো মাত্রা ঠিক করলে—সময়ের অপচয় হবে। মাত্রা কি ?

জার্মানীর গেস্টালট্‌ মনোবিদরাই এই মাত্রার কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। মানুষের শরীরের বিভিন্ন আচরণ বিশ্লিষ্ট নয়, সেগুলি সমমাত্রায় ব্যক্তির পূর্ণজীবনকে প্রকাশ করে। এই যে পূর্ণ-এক বিভিন্ন অংশ থেকে হয়ে ওঠে, এ হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ এক নির্দিষ্ট মাত্রার সাহায্যে। পাঠের মধ্যেও

সেই পূর্ণ-একের মাত্রাকে ধরতে হবে। পাঠের মধ্যে অনেকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থাকে যথা, বোধ, অভ্যাস, প্রতিন্যাস, জ্ঞান, কৌশল প্রভৃতি—এই-গুলিকে একত্রে এনে পরিপূর্ণ বা সামগ্রিক অভিজ্ঞতা তৈরী করতে হয়। মাত্রা অনেক রকমের আছে। আমরা যখন লিখি, তখন তার মধ্যে থাকে একটি বর্ণ মূলত, কিন্তু অনেকগুলি বর্ণের পৃথক পৃথক মাত্রা লুপ্ত হয়ে একটি শব্দের মাত্রায় আসে; আবার শব্দগুলো অপ্রত্যক্ষ বাক্যের মাত্রায় রূপান্তরিত, বাক্য অপ্রত্যক্ষ ভাবের মাত্রায় গিয়ে দাঁড়ায়। পাঠ্যাংশটির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাকেও উপলব্ধির অপ্রত্যক্ষ সেই একক মাত্রায় দাঁড় করানো দরকার। সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠের সেই পৃথক পৃথক মাত্রা গ্রথিত হবে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হেনরি মরিসন এই মাত্রা গঠনের কথাই বিশেষ ক'রে বলেছেন। এই মাত্রা গঠন যদি ঠিক হয়, তবেই ছাত্রদের অস্মিতা (Personality) বা ব্যক্তিত্ব সেই পাঠে তৈরী করা সহজ হবে। কাজেই মাত্রার সঙ্গে বিষয়বস্তুর অধ্যায় বা নামকরণে অনেক তফাৎ হয়। অধ্যায় বা নামকরণ যাই হোক. দেখতে হবে সেই পাঠের পরিবেশকে বা বক্তব্যকে কতখানি ব্যাপক উপলব্ধিতে এবং সাধারণ সূত্র বা ধর্মে আনা যায়। কাজেই সাধারণ শিক্ষককে দিয়ে মরিসন-পরিকল্পনা সার্থক হয়ে ওঠে না।

আমেরিকার ইস্কুল ব্যবস্থায় আমরা এটুকু অন্তত বেশ বুঝতে পেরেছি, শিক্ষককে তাঁরা যতই উহ্য করতে চেষ্টা করুন না কেন, সমস্ত দিকেই শিক্ষক ভাস্বর হয়ে আছেন; শিক্ষককে উহ্য করা গেলেও, উপেক্ষা করা চলছে না। গণতন্ত্র শিক্ষা-দর্শনকে সফল করতে হলে শিক্ষকের মর্যাদার উপর বেশী দৃষ্টি দিতে হবেই। সমস্ত পরিকল্পনা, শিক্ষা পরিচালনা শিক্ষকের দায়িত্বেই নির্ভর করছে। এ দিক দিয়ে আমেরিকা অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষকের উপর বেশী নির্ভর ক'রে বসেছে। লাস্কি আমেরিকার শিক্ষকদের দুরবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। জানিনা, কতখানি সেকথা সত্য। তবে এত পদ্ধতির আবিষ্কারের মূলে শিক্ষকদের অসামর্থ্য আর অসন্তোষ নেই তো! যাই হোক, একথা তো সত্য যে, আমেরিকা তার নিজের সমাজের উপযোগী শিক্ষাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করছে। এই সত্য প্রমাণের জন্যই এই প্রসঙ্গে

জন ডিউয়ির শিক্ষাদর্শন, সমাজ-পাঠ, পরিচালনা পদ্ধতি এবং ব্যবহারকের শিক্ষা—এই প্রসঙ্গ কয়টি আলোচনা করতে হচ্ছে।

জন ডিউয়ি :

ডিউয়ি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৯ সালে। প্রায় ৯২ বছর বেঁচে ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক মনের চেয়ে দার্শনিকতার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। জীবনের বাস্তব দিকের সংস্পর্শেই তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি। তাঁর শিক্ষা-দর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জাত।

১৮৯৬তে তিনি 'ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল' স্থাপন করেন। ভবিষ্যৎ বিদ্যালয়ের প্রেরণাকল্পেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রম-বিপ্লবের পর সাধারণ ইস্কুল যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে অক্ষম। মামুলী ইস্কুল চলত যখন মানুষে গ্রামে বাস করত ; কিন্তু সহরবাসীর পক্ষে এগুলো বেখাপ্পা। প্রধান কারণ, পারিবারিক গঠন পূর্ব থেকে এখন স্বতন্ত্র, আর সরল গ্রামবাসী এখন অনেকটাই বদলে গেছে কারখানার চাপে, অতএব তাদের শিশুদের শিক্ষা নতুন পদ্ধতিতে হওয়া অবশ্যই উচিত। আধুনিক যুগের শিশুরা তৈরী জিনিসের প্রস্তুত-পদ্ধতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ; কাপড়টাই চেনে, কাপড় কি ক'রে তৈরা হয় জানে না। পূর্বকাল থেকে বাড়ীঘর আলোর ব্যবস্থা সবই যে ভিন্ন। এই দিক দিয়ে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার গ্রাম্যবালকের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী সমৃদ্ধ।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মনের চিন্তারীতি পরিবর্তিত হয় ; মানসিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলেরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। শিক্ষার পক্ষে পরিবেশ যে প্রধান প্রয়োজন। শিক্ষা এখন আর তাদের পক্ষে বিলাস নয়, অথচ সেইভাবেই ইস্কুলের শিক্ষা তাদের কাছে এসে পড়েছে। সেই পুঁথিগত শিক্ষা, সেই ইস্কুলে যেখানে শিক্ষক বলবেন আর ছাত্র শুনবে। আসনের বদল নেই, তাদের মনও নিষ্ক্রিয়। কাজের মধ্য দিয়ে তারা শিখতে পায় না, কারণ ডেস্কে ব'সে কাজ করার চেয়ে শোনা-ই চলে বেশী। তা ছাড়া, কিছু করতে গেলেও সামাজিকতা আসতে পারে না, আসে কেবল ব্যক্তিতা।

সামাজিক দিকের এই পরিবর্তনের জন্যই ডিউয়ি নতুন ধরণের ইস্কুল খুললেন। চারটি সমস্যা দেখা দিল :

(১) গৃহ এবং প্রতিবেশী-পরিবেশের সম্পর্কে ইস্কুলকে আনতে হ'লে কি করতে হবে ?

(২) ইতিহাস, বিজ্ঞান, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়-নির্দেশের পথে কি ব্যবস্থা করা যায় ?

(৩) দৈনন্দিন ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখা, পড়া এবং অঙ্ক কসা বিষয় কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ?

(৪) ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং প্রয়োজন সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ কি ভাবে দেওয়া যেতে পারে ? ইস্কুল তাঁর কাছে গৃহ। এই ইস্কুলে পিতামাতার মতো সস্নেহ দৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর প্রযোজন বুঝে শিক্ষাপ্রদানই প্রকৃষ্ট পন্থা। ইস্কুল হবে বৃহত্তর গোষ্ঠী-পরিবার। এখানে শিশু দৈবাৎ কাজের মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতার সম্মুখীন হবে।

বাড়ীর মতোই এখানে ছাত্রেরা বুঝতে শিখুক যে, তাদের দায়িত্বের মধ্য থেকেই তাদের মঙ্গল আসবে। কিন্তু কার্যত কি ক'রে একে পরিণত করা যায় ?

ল্যাবরেটরী ইস্কুলে তিন দিক দিয়ে এই নীতি কার্যকরী করার চেষ্টা হ'তে লাগল :

(ক) কাঠ আর যন্ত্রপাতি নিয়ে দোকান-কাজ ;

(খ) রান্নার কাজ, (গ) বস্ত্রবয়ন এবং সীবন ইত্যাদি।

এইসব কর্ম-পরিচয় শিক্ষকের পরিচালনায় তারা জানতে পারল। জানতে পারল—তুলা, পশম প্রভৃতির কাল-ভেদ, স্বভাব-ভেদ, প্রয়োজন ইত্যাদি। তারা আবিষ্কার করতে করতে চিন্তাশক্তি বাড়িযে বাড়িয়ে এই সব কাজ করে। পুরনো যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কি ভাবে এর বিবর্তন হয়ে আসছে—তা' বুঝল।

এইভাবেই শিশুর মনে প্রীতিকর শিক্ষা-বোধ আসতে পেল। রন্ধন-ক্রিয়ায় রসায়ন সম্বন্ধে, কাঠের কাজে জ্যামিতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি প্রাথমিক ইস্কুল-জীবনকে তিন ভাগে ভাগ ক'রেছেন।

(১) খেলার যুগ—৪ থেকে ৮ বৎসর,

(২) স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের যুগ—৮ থেকে ১২,

(৩) চিন্তামূলক মনোযোগের যুগ—১২ থেকে।

খেলার যুগে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এই সময় সে ক্ষুদ্র গৃহ-গণ্ডী থেকে সমাজের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে আসতে সুরু করে। এখনও কোন্ উপায়ে এই মিলনের কাজ করতে হয়, সে জানে না। শেষের দিকে সে সমাজের আরও বড় দিক দেখে। গোলাবাড়ী খেত-খামার দেখে—তার উপরই বাড়ীর সমস্ত কিছু নির্ভর করে। তাই, এই সময়েই লেখা-পড়া এবং ভূগোলের কিছু কিছু করানো হয়।

দ্বিতীয় যুগে বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্য শিশু ব্যগ্র হয়। বিশ্লেষণী শক্তি কিছু কিছু আসে। এই সময় ভূগোল এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান কিছু কিছু শেখানো হয়।

তৃতীয় যুগে চিন্তা-প্রণালী সে বিশেষভাবে আয়ত্ত করে। বিশেষ বিশেষ দিকে তার প্রবণতা পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দূরকল্পী এবং দূরদৃষ্টির মন জন্মেছে এখন। ছেলেরা নিজেরাই সমস্যা তোলে, নিজেরাই সমাধান করে। অবশ্য ডিউয়ি এই শেষ স্তর সম্পর্কে খুব বেশী কাজ করেন নি।

ডিউয়ির মতে, মন কখনও স্থিতিশীল নয়, অনবরত সে বেড়ে চলছে। তার এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই তাকে শক্তি দেয়। কিন্তু পূর্বেকার যুগে মনকে স্থায়ী একটি বিষয় মাত্র মনে করা হ'ত। অবশ্য তাঁরা পার্থক্য যে স্বীকার না করতেন তা নয়, তবে সে পার্থক্য অনেকটা আপেক্ষিক তারতম্যের উপর নির্ভর করত, স্বভাবের তারতম্যে নয়। শিশু যেন ক্ষুদে মানুষ, তার মনটিও প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ডিউয়ি এই মত গ্রাহ্য করেন না।

ডিউয়ির মতে, মন হচ্ছে বিকাশের প্রক্রিয়া আর পদ্ধতি। মন সামাজিক, সমাজের উপর নির্ভর ক'রেই এর পরিণতি। আগেকার লোকে মনকে

ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে মনে করত; কিন্তু এখন স্থির হ'ল, সমাজের চালচিত্রেই এর স্পষ্টতা, এর পুষ্টি সামাজিক বস্তুতেই ঘটে। প্রকৃতি অবশ্য আলো, বাতাস, উত্তাপ সবই দিয়েছে, কিন্তু মানুষ সেই উদ্দীপক-কে বদ্‌লে দিয়েছে। মানুষের কাছে প্রকৃতির এসব আর অচেনা নয়; তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে এখন এদের রূপ। এইজন্যই এখন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানকে খবর জানানোর মতো ক'রে পড়ালে চলে না, পড়াতে হবে মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মিশিয়ে।

শিক্ষকের শিক্ষাদান রীতির দুটি ধর্ম এখন দেখা গেল: (১) বর্তমান শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে, (২) ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে অব্যাহত পরিবর্ধন এবং পরিগ্রহণ।

এই ইস্কুলের একটি প্রধান সত্য হচ্ছে, বিমূর্ত-চিন্তায় পরিচয় ঘটানোর পূর্বে কাজের মধ্য দিয়ে পরিচয় ঘটানো। কিছু করাটাই প্রথম স্থান পেল, তারপর চিন্তাশক্তি। অবশ্য এ দ্বারা বোঝাচ্ছেনা যে, শিশু কেবল কাজের মধ্য দিয়েই সব শিখবে।

কর্ম বা 'অকুপেসন' বলতে ডিউয়ি বলেন, কাজ অর্থ কোন 'ব্যস্ততার কাজ' নয় (Busy Work) কিন্তু কাজের কতগুলো স্বভাব, কর্মের আত্ম-প্রকাশের দিক। অর্থাৎ, হাত, চোখ প্রভৃতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ, ছক তৈরী, চিন্তন আসবে—আবার পিছনে থাকবে, বিস্তৃত বুদ্ধির, নন্দনতত্ত্বীয় এবং নীতি-গত আগ্রহ; 'ব্যস্ততার কাজ' অর্থ কেবল কাজের জন্যই কাজ।

ডিউয়ির দর্শনের সঙ্গে প্রয়োগবাদ বা 'প্রাগমেটিজ্‌ম' (Pragmatism)-এর অনেকটা যোগ আছে। এই প্রয়োগবাদ ভাব-সংহতির চেয়ে (System of ideas) মানসিক গঠনের (attitude of mind) উপরই জোর দেয় বেশী।

ইতিহাসের দিক দিয়ে প্রয়োগবাদকে ক্যালভিন (Calvin) থেকে সুরু করা যায়। ক্যালভিনের দার্শনিকতার সূক্ষ্মতত্ত্ব বাদ দিয়ে আমরা এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তাঁর মানুষ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অনেকটা অদ্বৈতবাদী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একক, এবং তার প্রত্যেকটি অংশের প্রকৃতি ঐ এককের

আভ্যন্তরীণ সময় এবং সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক চিন্তা যেন ইতিহাস আর ভাগ্য কর্তৃক পূর্বপরিকল্পিত। ক্যালভিনের এই পূর্বপরিকল্পনা কিন্তু অনেকটা দ্বৈতভাবের ছিল; এতে ইনি মানুষকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন, শাশ্বত বাঞ্ছিত এবং শাশ্বত অবাঞ্ছিত। কিন্তু পরবর্তী অংশটি আর তেমন ব্যবহার করা হ'ল না।

ক্যালভিনের মতবাদ নগর এবং গ্রাম-অঞ্চলের জীবন-দর্শনে দুভাবে আত্মপ্রকাশ করল। নাগরিক-জীবনের বড় প্রাপ্তি হচ্ছে, নগরের সংস্কৃতি এবং স্বস্তিকে প্রসারিত ক'রে। কিন্তু গ্রামে এর রূপ অন্য প্রকারের। গ্রাম সাধারণত দেশের প্রান্তে, তা ছাড়া অনেকটা পরিত্যক্ত গোছের। অনিশ্চিত জল-হাওয়া, অনিশ্চিত ভূমি-সংস্থা, তেমনি বিপদ আছে পশুর কাছ থেকে, নিগ্রো বা আদিবাসীদের কাছ থেকে (আমেরিকায়)। ভবিষ্যৎ তাদের অনিশ্চিত আর বিপজ্জনক। এমন অবস্থায়, ক্যালভিনের নিশ্চিত-বাদ কাল্পনিক ভাবে একটু মানসিক উদ্বেগের পরিপূরণ ঘটাতে পারে। পূর্বেকার তথাকথিত ভদ্র ঐতিহ্য এখানে আর বজায় রাখা যায় না; পরিবর্তে এল, সুযোগ এবং পরিবর্তন—এই জীবনযুদ্ধে। এই সমাজে তাই নির্দিষ্ট জাতিভেদ, সামাজিক মর্যাদাস্তর অকেজো হ'য়ে যেতে বাধ্য। লব্ধ-মর্যাদাই হ'ল জীবন-মূল্যায়নের মাপকাঠি। সমাজ-শ্রেণী এবং মর্যাদার বদলে স্থান ক'রে নিল কর্ম এবং বৃত্তি। অর্থাৎ, তারা আর সৎ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে না, সৎ হওয়ার জন্য তৈরী হয়। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি আছে। এইজন্যই বোধ হয় আমেরিকার জীবনযাত্রায় কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিন্যাস নেই, আছে প্রেরণা, উদ্ভাবনী-শক্তি, উৎসাহ,—এবং এগুলির বিচার স্বতঃসিদ্ধ নয়, ফলপ্রাপ্তিতে।

ক্যালভিনের পর ইমার্সন (Emerson) এই জীবন-দর্শনে প্রভাব আনলেন।

কাল এবং পরিবর্তন এখন হ'ল প্রাথমিক এবং মৌলিক বিশেষ। 'শাশ্বত' ব্যাপারটি হ'য়ে গেল নিরর্থক প্রত্যয়, প্রয়োজনের উপর এল সুযোগ; যুক্তিবাদ যেন পরিচয়বাদের মধ্যে আশ্রয় নিল।

এইভাবে জীবন-দর্শন মোড় ঘুরতে ঘুরতে উইলিয়াম জেমস এবং পেইয়ার্সের হাতে এসে প্রয়োগবাদে দাঁড়াল। ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতার কর্ম এবং ঐক্যের উপর জোর দিলেন জেম্‌স্ বেশী। সংজ্ঞানের কর্মের দিক হচ্ছে,—নির্বাচনমূলক, অনুরাগমূলক এবং যুক্তিমূলক। অনেকগুলো সম্ভাবনান্তরের মধ্য দিয়ে এই প্রথমে কাজ করে; তারপর অণুর নৈরাজ্য এবং শূন্যতার অসংযুক্ত প্রবাহ থেকে এ তার আপন জগৎ বের ক'রে নেয়। কাজেই এই ঐক্যের কাজ হচ্ছে, একটি সংযোগমূলক অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করা।

জেমস্‌-এর জ্ঞান সম্পর্কে যে-মতবাদ তার দুটো দিক আছে; অনুরাগ আর অভ্যাস। এই দুটি থেকেই বিচ্ছুরিত হয় সম্পর্কজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, এবং এবং কর্মজ্ঞান, আর পরিশেষে তুরীয়জ্ঞান। এই ভাবেই, ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতার অব্যাহত ধারাটি পরিণত হয়।

কাজেই, জেমস-এর মতে জ্ঞান সুরু হয় দু'টিকে আশ্রয় ক'রে—পরিচয় ঘটিয়ে (by acquaintance) এবং পরিপার্শ্ব থেকে। প্রথমটি সাধ্য হয়, বস্তুটির আশু সান্নিধ্য ঘটিয়ে, আর দ্বিতীয়টি—গৌণভাবে বা ভাবকল্পের সাহায্যে। এইজন্যই জেম্‌স্ জীবন ও মনকে দেখলেন প্রচেষ্টার প্রবাহ হিসাবে (streams of effort)। কি প্রচেষ্টা? সব সময়ই ভাবে কোন্‌টি গ্রহণ যোগ্য, পরিণাম দেখে নির্বাচনকে মঙ্গলময় করার উদ্দেশ্যে। পরিণতি দেখেই বস্তুর বিচার ঘটবে—সেটি ভালো, কি মন্দ, কি সত্য, কি মিথ্যা।

ডিউয়ি এই প্রয়োগবাদের সমার্থক শব্দ দিলেন উপকরণবাদ (Instrumentalism) হিসাবে। উপকরণবাদের মর্মার্থ হিসাবে বলা যায়, জ্ঞানশক্তির প্রক্রিয়া (Cognition) হচ্ছে—যে পরিবেশ থেকে কর্ম-ক্রিয়া স্থানচ্যুত হ'ল তার সঙ্গে তাল সামলাতে কতগুলি ভাবের উপকরণের (tools or instruments) ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকা। তিনি তাই সমাজ দর্শন এবং প্রগতির উপর জোর দিলেন। প্রতিনিয়ত চিন্তা সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন করছে; এই সিদ্ধান্ত আর উদ্দেশ্যই জীবনের প্রসার এবং বিস্তৃতি ঘটায়।

জেম্‌স্ থেকে ডিউয়িকেই আমেরিকাবাসী বেশী আপনার মনে করে।

'জেম্‌সের মধ্যে নানা কারণে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা উভয় দেশের দর্শন মিশে গেছে (বিশেষ ক'রে জেম্‌সের তুরীয়-বাদে), কিন্তু ডিউয়ির জীবন-দর্শন একেবারে আমেরিকার সমাজ থেকেই যেন পাওয়া। কারণও আছে।

ডিউয়ির যৌবন ভার্মণ্ট হিল সহর থেকে সুরু ক'রে মধ্য-পশ্চিম ভূখণ্ডের কর্মব্যস্ত নগরের মধ্যেই কেটেছে। তিনি দেখেছেন, কি ক'রে কৃষি-প্রধান অর্থনীতিকে যন্ত্র-প্রধান অর্থনীতি গ্রাস ক'রে ফেলেছে। এই ক্রম-পরিবর্তন সম্পর্কে ডিউয়ি যত মনোযোগের সঙ্গে ভেবেছেন, জেম্‌স্ তত নয়। জগৎ এবং আত্মা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা—সেই ভাব-ঐক্যের মধ্যে হারিয়ে গেল যেন তাঁর হেগেলীয় মতবাদ, পরে জেম্‌সের ক্রিয়াবাদ (Functionalism) যেন তাঁকে সেই ঐক্যকে মূর্ত করল, তার রূপ-উপকরণ প্রত্যক্ষ করালো; আর তারপর থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষ এবং ঘটনা বা পরিপার্শ্ব যেন এক রকমের পদ্ধতি যা কেবল অব্যাহত ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে, সংগঠন ক'রে চলেছে; আর এই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় আছে প্রত্যেকের সমাযোজন (Communication) এবং ভূমিকা গ্রহণ (Participation)। তাঁর মতে, চিন্তা করা এবং জানা যেন এক রকমের উপায় যাতে বাধাপ্রাপ্ত গতি, সঙ্কল্প-বিচ্যুত কর্ম এবং রুদ্ধ ইচ্ছা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারে; আবার তার স্রোত ফিরে পায়। অক্ষুণ্ণ রাখবার, সংরক্ষণ করবার, সংহতি সাধনের ক্রিয়াশীল যন্ত্র বিশেষ যেন এই ভাব-কল্প। বিশেষ ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া বৃদ্ধি-প্রবণ মানুষের সমাজসূত্রে-প্রাপ্ত বৃত্তিকে যেন একেবারে সামনে তুলে এনে দেয়। এই দর্শনই প্রতিপন্ন করল,-শিশু বাড়ছে, শিশুর অস্মিতা চির-পরিবর্তনশীল; ইস্কুল হচ্ছে তার সেই উপায় যাতে তার বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের সহায়ক হ'তে পারে; আর পড়ানো এবং শিক্ষা যেন সমাযোজন এবং অংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া বিশেষ। এমনি ক'রেই তো শিশু তার ভূমিকা যথাযথ ক'রে গ্রহণ ক'রে অতীতকে আয়ত্ত করে, আর ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করে।

ডিউয়ির দর্শন নিয়ে আমরা অধিকদূর আলোচনা করতে যাচ্ছিনে। ডিউয়ি অব্যাহত ধারা বলতে কি বোঝেন, বৃদ্ধি বলতে কি চান, পরিবেশ কাকে বলেন, পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গীর সম্পর্ক কি, তারও বিস্তৃত আলোচনা করছি নে।

তবে দু' একটা কথা এই প্রসঙ্গে না বললে ডিউয়ির শিক্ষানীতি যে কতখানি অস্পষ্টও বটে, তা বোঝা যাবে না।

তিনি বলেছেন, "অঙ্গীয়-জীবন যাই হোক না কেন, এ হচ্ছে কর্মের একটি প্রক্রিয়া, আর এই প্রক্রিয়াতেই জড়িয়ে পড়ে পরিবেশ। অঙ্গীর অবস্থান-সীমাকে অতিক্রম ক'রে দিয়ে যায় এই প্রক্রিয়া।" আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, "অঙ্গী কখনও পরিবেশের আশ্রয়ে নেই, পরিবেশ দিয়েই অঙ্গী বাঁচে।" প্রথম উক্তিতে পরিবেশ আর অঙ্গী এক দেহী হ'তে পারছিল, কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিতে পরিবেশ আর অঙ্গী দুটি পৃথক বস্তু। তবে পরিবেশ কি?

ডিউয়ি সাধারণত ব্যতিষঙ্গবাদে (Relativism) বিশ্বাসী, কিন্তু পরিবেশ আর অঙ্গীর ব্যতিষঙ্গ খুব স্পষ্ট করতে পারছেন না তিনি বলছেন, 'পরিবেশ আর অঙ্গীকে কখনও পৃথক ক'রে দেখা যায় না, একজন অপরকে নিয়ন্ত্রণও করে না; "মাছ জলে বাস করে, পাখী বাতাসে বাস করে"—এমন পার্থক্য এদের নেই; জল এবং বাতাস তাদের স্বীয় কর্ম-প্রণালীর মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে একটা বিশেষ কর্ম-চরিত্র দেয়।' অথচ দুটি বস্তর মিথক্রিয়াকে তিনি মানেন।

কর্ম-প্রবাহ সম্পর্কেও তাঁর ঐরকম অস্পষ্ট মত। কর্মের যে অব্যাহত গতি তা একটার পর আর-একটা আসবার মতো নয়। কিন্তু একটা ধারার মতো, অথচ কোন ধারা থেকে অন্য ধারা পৃথক ক'রে ধরাও যায় না। আর এই কর্মপ্রণালীর ধারা-গুণ শক্তিশালী হয় কেমন করে? না, প্রত্যেক বিশেষ কার্যের জটিল উপাদানের সূক্ষ্ম সমতা প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে।

আবার, 'বিশেষ কার্য'। এই ভারসাম্যের ওজনের বাড়তি ঘটলে জীবনের বৃদ্ধি ঘটে, ঘাটতি থাকলে ক্ষয় একথাও তিনি বলেন।

এমনি ক'রে সূক্ষ্ম যুক্তি কিন্তু অস্পষ্ট ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি জীবনের বিকাশ আর পরিবেশকে বোঝাতে চেয়েছেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে 'অভিজ্ঞতার' কথা যেখানে বলেছেন, সেখানেও তাঁর সেই নির্বিশেষ ব্যতিষঙ্গবাদ সামঞ্জস্য রাখতে পারে নি। তিনি বলছেন, সমস্ত

সত্যকার শিক্ষা অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিলেও, সমস্ত অভিজ্ঞতাই সৎ শিক্ষা দিতে পারে না। অধিকতর অভিজ্ঞতার পথে যে-অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারে না—সে অভিজ্ঞতা মিথ্যা শিক্ষা দেয়। অভিজ্ঞতাও কিন্তু একটির শেষে আর একটি সুরু হয় না, বরং ধারার মতো। তা হ'লে এই নির্বিশেষ দুষ্ট অভিজ্ঞতাকে বরবাদ করবার পন্থা কি? শিক্ষক এখানে কোন হদিসই পাচ্ছেন না। ডিউয়ির এই প্রবাহ ব্যতিষঙ্গবাদে শিক্ষাজগতে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি ক'রে বসেছেন।

এই যুক্তি অনুসরণ করেই তো তিনি মামুলী ইস্কুল আর প্রগতির ইস্কুলের তফাৎ বে'র করেছিলেন! মামুলী ইস্কুলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারত না ছাত্রেরা, তা নয়—কিন্তু সে অভিজ্ঞতা ভুল পথের।

তা হলে ডিউয়ি অভিজ্ঞতাকে বিশেষ ক'রে ধরতে পারছেন! অথচ তিনি বলেন সেই অভিজ্ঞতাই সুস্থ যা অন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে মিশে যেতে পারে। তা হ'লে সুস্থ অভিজ্ঞতারও তো বৈশিষ্ট্য এসে পড়ল! তিনি তো নীতির দিক দিয়ে অভিজ্ঞতাকে ভালো-মন্দ বলেন নি, বলেছেন সেই অভিজ্ঞতার জ্ঞান-স্বরূপ থেকে।

শিক্ষা যেখানে বিশেষ রূপ নেয়, স্বতন্ত্র আকারের হয়, সেই শিক্ষাই তাঁর মতে মামুলী শিক্ষা। ব্যতিষঙ্গ স্থাপন ক'রে না চললে সে শিক্ষা সত্যকার শিক্ষা হয় না। ভালো কথা, কিন্তু ব্যতিষঙ্গ স্থাপন করতেও তো অভিজ্ঞতার স্বরূপ বুঝতে হবে!

এমনি ক'রে তিনি 'বৃদ্ধিই শিক্ষা, শিক্ষাই বৃদ্ধি' ব'লে আবার বলছেন, "বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, কোন্ দিকে বৃদ্ধি ঘটছে তা-ও দেখতে হবে।" কোন লোক তার কর্ম নৈপুণ্যকে তো চৌর্যকার্যেও লাগাতে পার! কাজেই বৃদ্ধির দিকনির্ণয় করা দরকার। কোন্ দিক? সাধারণ বৃদ্ধির দিকের বিরোধী হ'লে তাকে শিক্ষা বলা যাবে না।

তা হ'লে শিক্ষা আর বৃদ্ধি পৃথক হয়ে গেল! তা হোক, কিন্তু কোন্ দিকটি যে সুস্থ তা তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল না।

যাই হোক, ডিউয়ির দার্শনিক অস্পষ্টতা নিয়ে শিক্ষাব্রতীরা বর্তমানে

আলোচনা করতে কেবল সুরু ক'রেছেন—সেই কথার আভাস দিয়েই আমরা বর্তমান আলোচনার উপসংহার টেনে দিতে পারি। তবে একটা কথা স্বীকার্য, ডিউয়ি মামুলী ইস্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন তুলেছেন এই ব'লে যে, এই ইস্কুলে যে ছাত্রের ব্যক্তিক দিক তারা গ্রাহ্য করে না তা নয়; কিন্তু শিক্ষা বস্তুর (ছাত্রের মনের পক্ষে বাইরের) সঙ্গে ছাত্রের মনের অভিজ্ঞতার পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় না, তেমনি অভিযোগ তুলেছেন নয়া ইস্কুলও যেন ছাত্রের ব্যক্তিক দিককে মান্য ক'রে তার মনের বাইরের পরিবেশ বা বিষয় বস্তুর যোগাযোগ ঘটাতে পারছেনা। শিক্ষার পক্ষে এই উভয় দিকই খারাপ।

ডিউয়ির যুক্তি-দর্শনের বিরুদ্ধে বর্তমান আমেরিকায় আলোচনা-সুরু হলেও (এঁদের মধ্যে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পল ক্রসার-এর নাম করতে হয় মুখ্যত,) ডিউয়ি যে আমেরিকার চিন্তাধারার রুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডিউয়িকে হয়ত আমেরিকার সোক্রাতিস বলা যায় না, কিন্তু আমেরিকার সফিস্ট ব'লেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভবিষ্যতের সোক্রাতিসকে ডিউয়ির চিন্তার উপরই (আমেরিকাতে) কাজ করতে হবে—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমেরিকার দর্শনশাস্ত্রে ডিউয়ি হচ্ছেন পথিকৃৎ।

সমাজ-পাঠ (Social Studies):

বিজ্ঞান পড়াতে আমরা ক'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করি, অঙ্ক বলতে আমরা ক'টি বিষয়কে ধরি? তেমনি সমাজপাঠ বলতে আমরা ধরব—এমন একটা বিষয়-অঞ্চল যাতে অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস থাকবে। অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক যে-যে বিষয়ে রাখতে জানা যায়, তাকেই সমাজ-পাঠের বিষয় বলব। সমাজ-পাঠ অর্থ—সমাজ-বিষয় পাঠ।

ঐ সব বিষয়কে পৃথক ক'রে ধরলে তাদের পাঠ-উদ্দেশ্য আমাদের অনেকের কাছেই জানা। তবে এই সব বিষয়কে একত্র ক'রে আবার বিশেষ নাম

নাম দেওয়া হচ্ছে কেন? তা ছাড়া, সমাজ-পাঠ বলতে আমরা যে উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নিলাম—তার মধ্যে ভূগোল পড়েছে কিন্তু অঙ্ক আসছেনা কেন? মানুষের সমাজ থেকেই যদি অঙ্ক আসে, তবে তাকে সমাজ-পাঠের অন্তর্ভুক্ত করিনা কেন? কারণ হচ্ছে, ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমরা যে কেবল পৃথিবীর খণ্ডটুকুর পরিচয় পাই তা তো নয়; আরও পাই, ভৌগোলিক স্থান এবং আবহাওয়া মানুষের মন এবং সামাজিক ব্যবহার নীতিকে পরিবর্তিত ক'রে দেয়—সেই জ্ঞান। সেই জ্ঞান যদি আসে তবেই তো বুঝতে পারব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধ যে-কারণে আসে তা কত অযথা। কিন্তু অঙ্ক সংখ্যাতত্ত্বের যে-খবরই দিক না কেন, সমাজের মানুষ সম্পর্কে কোন খবরই দিতে পারে না; সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে অঙ্ক এসেছে যেন দৈবাৎ।

আর-একটি প্রভেদ ও বুঝতে হবে। সামজ-বিজ্ঞানের (Social Science) সঙ্গে এর তফাৎ কি? খুব যে তফাৎ আছে তা নয়, তবে বলা যায়, সমাজ-বিজ্ঞান একটু উঁচুস্তরের, গবেষণা-উপযোগী আলোচনা থাকে এখানে—এই মাত্র। আর সমাজ-পাঠ ইস্কুলের শিক্ষার আওতাতেই পড়ে, ঐ সমাজ-বিজ্ঞান থেকেই বাছাই ক'রে ক'রে বিষয় নেওয়া হয়। দুটির এই পার্থক্য বজায় রাখবার কথা আমেরিকাতে ১৯১৬ সাল থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। যাই হোক, এইটুকু মোটামুটি বোঝা গেল যে, সমাজবিজ্ঞানকেই আরও সরল ক'রে সমাজ-পাঠ হিসাবে ধরা হ'ল।

সাধারণত ইস্কুলের সমাজ-পাঠের মধ্যে থাকে—ভূগোল, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং পৌরবিজ্ঞান। এছাড়া চলতি দুনিয়ার খবর, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, ভদ্রতা, ব্যবসায়বিজ্ঞান, বৃত্তিশিক্ষা প্রভৃতি কিছু কিছু পাঠ্যসূচীর মধ্যে থাকে। কিন্তু এরই মধ্যে আরও অনেক বিষয় নিয়ে অধিকারীরা দাবী তুলেছেন। সে বিষয়গুলিও সমাজ-পাঠের অন্তর্গত করা হোক। অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে একবার টান দিলে সে সুতো যে কত দূর গিয়ে পৌছবে—তা কেউ বলতে পারে না। সমাজ-পাঠের পাঠ্যসূচী যাঁরা প্রস্তুত করেন—তাঁদের মাত্রাবোধ থাকা চাই-ই, কিন্তু থাকে না। কারণ বয়স্কেরা যে-ভাবে অভিজ্ঞতাকে দেখেন, সেখান থেকে তাঁদের কিশোর মনে

নেমে আসাকে সময় সময় মানসিক-অপরাধ ব'লে মনে করেন। 'দুর্বিনীত' কথাটার যদি কোন অর্থ এখনও বেঁচে থাকে, তবে সমাজ-পাঠ পাঠ্যসূচী নির্মাতার মধ্যেই বোধ হয় তা পাওয়া যায়।

আমেরিকার শিক্ষা-ইতিহাসে সমাজ-পাঠের তিনটি যুগ পাওয়া যায়।

প্রথম যুগ সুরু হয়, ১৮৯০ থেকে ১৯১৬। অবশ্য ১৯১৬ সালের আগে সমাজ-পাঠের ইতিহাস সুরু একটু জোর ক'রে করতে হয়; কারণ ১৯১৬ এর আগে এই কথাটা খুব পাওয়া যায় নি। এই প্রথম যুগে কেবল তত্ত্ব, পদ্ধতি, পাঠ্য-সূচীর আলোচনা অবাস্তব উদ্দেশ্য-নিরূপণের মধ্যেই অতিবাহিত হ'ল।

দ্বিতীয় যুগ পাই, ১৯১৬ থেকে ১৯৩৩। এই সময় সমাজ-পাঠের উদ্দেশ্য ছ'কে নেবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম শিক্ষা-অধিকর্তারা করতে থাকেন। কি ক'রে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের লয় (fusion) ঘটানো হবে। কি ক'রে এদের মধ্যে ঐক্য গঠন করা হচ্ছিল।

তৃতীয় যুগ সুরু হয় ১৯৩৩ থেকে। এই সময় পাঠ্যসূচী নির্মাণ করা হ'ল, ছেলেদের মনের ক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করা হ'ল, সমাজ-পাঠের পরীক্ষা এবং উন্নয়ন প্রভৃতির দিক দেখা হ'তে থাকল।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়ানো উঠে গিয়ে (প্রাথমিক দিকে), এই সমাজপাঠের মধ্য দিয়ে বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে এবং ঐক্য স্থাপন ক'রে পড়ানো সুরু হয়েছে।

এমনি ক'রে দেখা গেল, প্রাথমিক ইস্কুলে এই সমাজ-পাঠ পড়াতে গিয়েই বিভিন্ন ইস্কুল সমাজ-পাঠের বিভিন্ন চরিত্রের উপর জোর দিচ্ছেন। যেমন আগে জোর দিত,—ছুটি সম্পর্কে, বীরদের কাহিনীতে, সাধারণ এবং স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশে, আদিম মানব সমাজে। এখন জোর দিচ্ছে—বাড়ীর পরিবেশ এবং চরিত্রের উপর, পারিবারিক জীবনে, সম্প্রদায়ের জীবনে, খাদ্য ব্যবস্থায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আশ্রয়-স্থানের উপর, যাতায়াত ব্যবস্থার উপর। কোন কোন ইস্কুলে প্রথম দিকে ইতিহাসের উপর প্রায় নজর দেয়-ই না। এমনি ভাবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোর পড়ছে, যুদ্ধের ফলাফলে এবং অন্যান্য

দেশের সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহে, দেশের পরিকল্পনা বিষয়ে, ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রায়, চিন্তার-উৎকর্ষতায়।

এই সমাজ-পাঠের উদ্দেশ্য হিসাবে একটি বড় দিক দেখা যায়, সুস্থ এবং দক্ষ নাগরিকতা বোধ জন্মান। 'নাগরিকতা' না ব'লে, সমাজ-মানুষই বলা উচিত। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ নয়। তাই গবেষণা হচ্ছে, সমাজ-মানুষ বা সমাজ-ব্যক্তির সত্যকার অর্থ বলতে কি বুঝি, ঐ ব্যবহারের মধ্যে কোন্ কোন্ মানসিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়া পেতে পারি। কাজেই, এই বিষয়ে একটা শেষ কথা না পেলে সমাজ-পাঠ পড়ার উদ্দেশ্য ঠিক মতো ছকতে পারা যাবে ব'লে মনে হয় না। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগেই তো দেখা গেছে, সমাজ-পাঠের এই উদ্দেশ্যের মধ্যে যেন একটা ব্যক্তিতার স্পর্শ কড়া রকমের ছিল, অথচ আজ আবার সমাজের বোধ স্পষ্ট হয়ে এসেছে। কাজেই এই 'ঐক্য-বিধায়ক' সমাজ পাঠের উদ্দেশ্যের 'জয়-হে' বলা আজও অনেক দেরী।

কেবল উদ্দেশ্যের কথা বলি কেন? শিক্ষাসূত্রের কোনটিকে ধ'রে এই সমাজ-পাঠ দিতে হবে—তার মধ্যেও তো বৈষম্য আছে।

অভিজ্ঞতা সৃষ্টি ক'রে যদি পাঠ দিতে হয়, তবে সমাজ-পাঠের অভিজ্ঞতা হবে সামাজিক-অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার চরিত্র কি? ধরা যাক, ব্যক্তিগত ভাবে মানুষে-মানুষে-সম্পর্ক-কে বুঝতে পারা, মানুষের কর্মপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান এবং গোষ্ঠীর মধ্যে মিলে মিশে কাজ করতে জানা। কিন্তু কি ক'রে এসব হবে? প্রত্যক্ষ ভাবে নিজকে জড়িত ক'রে। সে তো অনেক সময় দরকার। অতএব অন্যের অভিজ্ঞতা থেকেও সে এসব জানবে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অতীত হয়ে। কিন্তু এমনি ঘুরপথে যদি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তবে ভাষার সাহায্য নিতে হ'বে বেশী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় থাকবে,—নিজের কার্যপদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রভৃতি; আর অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দরকার হবে,—শব্দজ্ঞানের প্রসার, স্থান এবং কাল সম্পর্কে প্রত্যয় গঠন, পাঠ করার কৌশল আয়ত্তি।

এইজন্য প্রাথমিক ইস্কুলে—প্রথম দিকটির উপর, আর মাধ্যমিক ইস্কুল দ্বিতীয়টির উপর বেশী জোর দিচ্ছে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই একটা ধারণা চলে আসছিল যে, ছেলেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ধনের জন্য ইস্কুলকে নানা পরিকল্পনা করে সেইরূপ পরিবেশ গঠন করতে হবে। বিংশ শতাব্দীতেও এই ধারা অক্ষুণ্ণই থাকল। মাঠের কাজ, সাপ্তাহান্তিক পরিক্রমণ কার্য এবং সমাজের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যোগ দিয়ে এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা এই সমাজ-পাঠের উদ্যোক্তারাও বললেন। ছেলেদের স্বায়ত্ত শাসন, সমাজ-উপযোগী ক্লাব—প্রভৃতিও অনুমোদন করা হ'ল। কিন্তু পরবর্তী কালের শিক্ষাব্রতীরা এবিষয়ে নানা প্রশ্ন তুললেন। কেউ কেউ বলেন, বিষয় বস্তু, প্রদর্শ-বস্তু, মিউজিয়াম, প্রমোদ ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য থেকে তারা যে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টি ধর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাকেই কাজে লাগাতে হবে এই সমাজপাঠে। এঁরা বলেন, এই যে পদ্ধতি এগুলি অন্যান্য পদ্ধতির আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকবে, কিন্তু অন্যগুলি বর্জন করে এদের স্থান হওয়া উচিত নয়। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে ভাষা আশ্রয়ী শিক্ষা-পদ্ধতি অন্যতম। কাল এবং স্থান সম্পর্কে বোধ জন্মানোও আর একটি পদ্ধতি। ইতিহাস অংশে এই কাল একটি বিপজ্জনক ব্যাপার। কাল এবং তারিখ এক কিনা, এই নিয়েই কত প্রশ্ন। যে ব্যক্তি তারিখ মুখস্থ করল, তারই কালবোধ জন্মেছে কিনা। সমাজ-পাঠ এই বিষয়েও হাত দিল। আধুনিক সমাজ-পাঠের শিক্ষাবিদেরা বলেন, কাল-বোধ শিশুর যে-কোন সময়েই জন্মাতে পারে, তবে সেটি স্থায়ী হবে কিনা—তার জন্য দরকার বিশেষ রকম শিক্ষা-পরিচালনা। যেমন, ১২ বছরের আগে তারিখ সম্পর্কে কিছু বলা অনেকটা অনাবশ্যক। এইজন্য তাঁরা বলেন, জুনিয়ার হাই ইস্কুলের আগে সময়-রেখা বা সময়-পত্র ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এ প্রচেষ্টা অযথা। তাঁরা বলেন, ঠিক তারিখ জানলে তারিখ অনুযায়ী পাঠকে সীমিত করলে সময়ের অপব্যয় কমে; সাধারণ ভাবে সময়-জ্ঞান দিলে শিক্ষা-সময় অনাবশ্যক বেড়ে যায়; তবে এসব করা দরকার—অনুষঙ্গ নির্মাণের পদ্ধতিতে।

এমনি ক'রে ভূগোলের অংশে স্থান-বোধ বিশেষ দরকার। অর্থাৎ, এই সমাজ-পাঠের শিক্ষকেরা কিছুই বাদ দেন নি। পরিমাণ বোধ, সংখ্যা-বোধ

সমালোচনার মন, সব কিছুই এই সমাজ-পাঠে দরকার, আর সমাজ-পাঠে সেইগুলিকেই পরিণত করতে হবে।

মোট কথা, এই সমাজ-পাঠ শিক্ষা-প্রসঙ্গে এক নতুন দিক খুলে দিল। পদ্ধতির মধ্যে, বিষয়বস্তু ব্যবহারের মধ্যে, পরীক্ষা এবং উন্নতি-পরিমাপ বিষয়ে —এককথায় ইস্কুলের নানাদিক নিয়ে "সূক্ষ্ম" গবেষণা এরা সুরু করেছে। আমাদের দেশেও এই ঢেউ আসছে ব'লে মনে হয়।

ব্যবহারকের শিক্ষা (Consumer Education):

ইস্কুলের একটি লক্ষ্যের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক বিষয়ে উপযুক্ত এবং সুস্থ চরিত্রের হওয়া। চরিত্রের এই সুস্থতার জন্য দরকার বুদ্ধি দিয়ে পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করতে শেখা। ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের পণ্যদ্রব্য নির্বাচনে এবং ব্যবহারে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেই সমস্যা সমাধানের উপযোগী মনকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যত আবিক্রিয়ার দিকে ঝোঁক জাতির বাড়বে, শিল্প-কারখানায় যত উন্নত হবে দেশ, ততই এই সমস্যা বাড়ে। ততই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

শিল্পকারিগরীতে উন্নত হওয়ার দরুণ ব্যবহারকের মানসিকতার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানবসভ্যতার প্রথম দিকে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস তৈরী করত, নিজেই ছিল উৎপাদক আর নিজেই ব্যবহারক। কিন্তু বর্তমানে এই দিক দিয়ে উন্নতি ঘটালো, মানে, বিপর্যয় ঘটালো। প্রত্যেক উৎপাদকই সঙ্কীর্ণভাবে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু সে-তুলনায় ব্যবহারক হিসাবে সে হয়ে যাচ্ছে আহত-শম্বুক। কোন্ বস্তুটি যে ব্যবহারকের নিতান্তই প্রয়োজন, কোন বস্তুটি যে কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় তা সে জানে না— অথচ লোভ আছে প্রচুর। এদিক দিয়ে তার আরও বিপদ আসে—অভ্যাসে, ঐতিহ্যে, সংস্কারে, অনুকরণে, এবং উৎপাদকের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। পূর্বে উৎপাদক এবং ব্যবহারক একই সমাজের লোক ছিল; এখন তো তা নয়! উৎপাদকের সঙ্গে ব্যবহারকের অনেক দিক দিয়েই যোগাযোগ নেই। এখন সব কিছু হয় বাজারের মাধ্যমে, দোকানদারের চটকে। সব সময়ই যে

ব্যবহারকের বা সমাজের কল্যাণে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে তা নয়, হওয়ার কারণও নেই। তবে, উৎপাদক আর ব্যবসায়ীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জন্যই যা কিছু ভালো জিনিস উৎপত্তির প্রেরণা উৎপন্নকারীর মনে আসে। কাজেই ব্যবহারকের পক্ষে এইসব কৌশলকে আয়ত্ত ক'রে পণ্যদ্রব্য ক্রয় এবং ব্যবহার করার শিক্ষা লাভ করা দরকার।

যত কম আয়ের পরিবার ততই যেন তাদের ছেলেমেয়েদের বেশীরকম ক্রয়ের দিকে ঝোঁক—এ ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই ও-দেশে জানা গেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ছেলেমেয়েরাই ক্রেতা হিসাবে অধিক সক্রিয়। নতুনত্বের প্রলোভন তাদেরই বেশী। কাজেই, তাদের এই ব্যবহারক-উৎপাদকের জটিল আবর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা দরকার বেশী। এ কাজ কে করবে? সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইস্কুলই করবে।

ইস্কুলকে বাস্তবানুগ উদ্দেশ্যপুষ্ট করাই হচ্ছে বর্তমান আমেরিকা শিক্ষা-নীতির পরিবর্তিত দার্শনিকতা। এইজন্য ইস্কুলের পাঠক্রমে এই দিকটি এসে যাচ্ছে।

আমেরিকার পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ প্রধানত এই অর্থনৈতিক দিক। কাজেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান হোম ইকনমিক্স্ এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হ'ল গার্হস্থ্য-অর্থনীতিকে ব্যবহারকের শিক্ষা হিসাবে চালু করতে। তারপর ১৯২০ থেকে ১৯৩০, ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই দিক দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করা সুরু হ'ল। হ্যাজেল কার্ক (Hazel Kyrk) এবং হেনরী হারাপ (Henry Harap) এই বিষয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মাধ্যমিক ইস্কুলে এবং কলেজে এঁদের গ্রন্থকে অনুসরণ ক'রেই পাঠ্যপুস্তক রচিত হ'তে থাকে। তারপর 'এডুকেসনাল পলিসিস্ কমিসন' এবং 'ন্যাসন্যাল এ্যাসোসিয়েসন অব্ সেকেণ্ডারী স্কুল প্রিন্সিপ্যালস' এই শিক্ষাকে আরও শক্তি যোগালেন।

'ইউনাটেড স্টেসস অফিস অব্ এডুকেসন'-এর রিপোর্ট থেকে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু তুলে দিচ্ছি:

(১) নির্বাচন করা—বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টিকে কিভাবে মানুষ বাছাই করে, এবং কোন্‌টির কিরূপ ভাবে মূল্য দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা—

(২) বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য কোন্ পণ্যদ্রব্যের কিরূপ সাহায্য নেওয়া হবে, আর আয়-পরিমাণ এবং পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কিভাবে সেই দ্রব্য আয়ত্ত করতে হয়—

(৩) আয়-সংস্থার উপর নির্ভর ক'রে চরম সন্তোষ লাভ করতে হ'লে কোন্ দ্রব্য ব্যবহার করা প্রয়োজন—

(৪) জাতীয়-সম্পদ বণ্টনের কি কি দিক; সমাজে এই বিষয়ে ব্যক্তির এবং পরিবারের কি কর্তব্য—ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা।

তা হ'লে শিক্ষার্থীর পক্ষে দরকার হচ্ছে, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে উদার এবং বুদ্ধি-দীপ্ত মতবাদ গঠন; কলকারখানার সঙ্গে দেশের সম্পর্কের উপযুক্ত ধারণা গঠন; অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিভাবে কল্যাণ আসবে সে সম্পর্কে মনোভাব গঠন; দ্রব্যের মূল্যায়নে এবং রুচিতে উন্নত মান; ক্রেতা হিসাবে এবং ব্যবহারক হিসাবে সুবুদ্ধি জন্মানো; সঞ্চয় করবার সুস্থ মনোভাব; সমাজের প্রতি ব্যবহারকের দায়িত্ব স্বীকার।

অবশ্য হাই-ইস্কুলে এই শিক্ষার নীতির কতটা ব্যবহার করা হবে—সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। সমাজ-পাঠে এর কতকাংশ শিক্ষা দেওয়া যায়, কি ইতিহাস পড়ানোয় কতখানি এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায়—সে সব সম্পর্কে নানা কথাই আছে।

সাধারণত যে-যে বিষয়ের মধ্য দিয়ে এগুলো শেখানো যায় তা হচ্ছে, সমাজপাঠ, ইতিহাস, ব্যবসায়িক বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-অর্থনীতি, এবং বিজ্ঞান।

এ বিষয়ে আমেরিকাতে এতহ আস্থা যে, প্রাথমিক ইস্কুলেও এই শিক্ষা কার্যক্রম বেশ আশ্রয় পাচ্ছে। তবে এখনও সমাজপাঠে, বিজ্ঞানে এবং অঙ্কের পাঠেই এই ব্যবহারকের শিক্ষা-উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে—একথা স্বীকৃত।

পরিচালনা পদ্ধতি (Guidance Method) :

শিক্ষা কি ভাবে সাধিত হয়, সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে পরিচালনার (Guidance) একটা দিক ওয়াটসনের আমল থেকে এসে পড়েছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এই পদ্ধতিটি একটি অবশ্য কর্তব্য হিসাবে গৃহীত হ'ল। শিক্ষাসূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হ'ল—উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে

যে বিষয়কে বারবার সম্মুখীন করতে হয়, তার পৌনঃপুনিকতার উপরই নির্ভর করে শিক্ষা (Learning is primarily a matter of the frequency of repetition of the adequate response.)। এই যদি হয় শিক্ষাসূত্র তবে তো ঐ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পরিচালনা দরকার। ঐখানেই তো শিক্ষার্থীকে সমস্যার উপর স্থির দৃষ্টি দিতে হবে। কেমন ক'রে সে-কাজ করবে, কতখানি প্রতিক্রিয়া বা সাড়ার সৃষ্টি হবে, কোন্ বিষয় মাধ্যমে সে-কাজ করা যাবে—সবই পরিচালনার উপর নির্ভর করবে। কা'র (Carr) এই বিষয়ে অগ্রণী হ'লেন। এই ভাবে তিনি যে-পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন তাতে দেখা গেল, এই পরিচালনামূলক শিক্ষা যেন মুখস্থবিদ্যার এবং সমস্যা-সমাধান শিক্ষার মধ্যপন্থা। কা'র সাহেবের দৃষ্টিতে—সক্রিয় এবং ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী-শক্তি-জাত যে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া তাই ঠিক ক'রে দেয় উপযুক্ত প্রতি-ক্রিযার প্রতি মনোযোগী হ'তে, আর অপ্রচুর এবং অনুপযুক্ত প্রতিক্রিয়াকে পরিবর্জন করতে (Active and individual discovery of the adequate response is a necessary part of the fixation of the adequate response and the elimination of inadequate responses in many types of learning.)। তাই অনুকরণ-পদ্ধতিতেও এই পরিচালনা পদ্ধতি দরকার।

শিক্ষা-সূত্রের কথা বাদ দিলেও, সাধারণভাবে শিক্ষার সঙ্গে এই পরিচালনা-পদ্ধতি অনেকখানি জড়িয়ে। তাদের সামর্থ্য পরিমাপ ক'রে, অনুরাগকে বুঝে, প্রবণতা জেনে, তাদের উন্নতি কতটুকু হ'ল সে সবের সন্ধান ক'রে তাদেব পাঠের পরিবর্তন করতে পারলে, সুস্থ শিক্ষা দেওয়া যায়। কেবল ক্লাশের পড়াই কি সব ? সেইটুকুতেই কি তাদের চরিত্র নির্ণীত হয় ? সমাজের কত দিকে কত কাজের সঙ্গে তাদেব যোগ দিতে হয়, কত ভাবে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। সব কিছুরই তো হিসাব রাখা দরকার। ব্যক্তিগত তারতম্য-ও জানতে হবে। এইজন্য ছেলেদের কাজকর্ম, খেলাধূলা, আনন্দ-অনুষ্ঠান সব কিছুকেই ইস্কুলের আয়ত্তে আনা দরকার, যাতে এলোমেলো ভাবে তারা কিছু না করতে যায়। ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে কি লাভ ?

মানসিক স্বাস্থ্য বিধানের জন্যও এই উপদেষ্টা বা পরিচালকের দরকার। কাজেই এই পরিচালনা বা উপদেষ্টার শিক্ষাকে বলা যেতে পারে ছাত্র ও উপদেষ্টার সম্মিলিত ক্রিয়াকর্ম। ছাত্রদের মঙ্গলবিধানের জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমেরিকায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭এর মধ্যে এই বিষয়ে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে শিক্ষা-অঞ্চলের বিভিন্ন দিক, যথা—ব্যক্তিগত, সমাজগত, ধর্ম-সম্পর্কীয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে নানারকম খোঁজ-খবর দেওয়াই ছিল প্রধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ বিষয়ে আরও নির্দেশ বেড়ে গেল; সমস্ত ইস্কুল-কলেজও এই নির্দেশ একরকম মেনে নিল; অবশ্য, নামের অনেক বৈষম্য আছে। যেমন, কোথায়ও বলে 'গাইডেন্স', কোথায় ও বলে 'কাউন্সেলিং', কোথায়ও বলে 'পার্সনাল ওয়ার্ক'।

কাউন্সেলিং বা উপদেষ্টার কাজ দুদিকে বর্তমানে দেখা যায়; (১) অস্মিতার (Personality) চলতা (dynamicity)-দিককে অনুধাবন করা; এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বৃত্তিগত দিকের স্থান খুব নেই; বৃত্তিগত দিক আসবে এই পদ্ধতির আশ্রিত হয়ে। (২) দ্বিতীয় দিকে দেখা যায়, বিভিন্ন অভীক্ষার বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা নিয়ে, জীবন-ইতিহাস নিয়ে (ছাত্রদের) এবং সাক্ষাৎকারের আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা নিয়ে ছাত্রদের সম্পর্কে গবেষকের একটি অভিমত গঠন।

এইসব অভিমত সংগ্রহ ক'রে পরিচালনা-পদ্ধতির শিক্ষা ইস্কুলে প্রয়োগ করা হবে; অর্থাৎ, কেন ছাত্রটি বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে থাকে, কোন্ বিষয়ে সে পারদর্শী হ'তে পারবে, কোন্ বিষয়টি সে নির্বাচন করবে, সমাজের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত—সব বিষয়েই নির্দেশ দেবেন তাদের এই উপদেষ্টা।

এই ভাবে এখন আমেরিকার ইস্কুল-কলেজে তিন রকমের পরিচালনা দেখা যাচ্ছে—(১) মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে, (২) শিক্ষা-বিষয় সম্পর্কে, (৩) বৃত্তি-নির্বাচন সম্পর্কে।

শিক্ষাবিষয় সম্পর্কে এই পরিচালনা-পদ্ধতির স্বরূপ স্পষ্ট করতে হ'লে বলতে হয়, এই পরিচালনা পদ্ধতির প্রথম প্রশ্নই থাকে—এই যে ছেলে বা

মেয়েটি ইস্কুলে পড়ছে, সে সমাজের কোন্ কাজে ভালোভাবে লাগতে পারে? কোন্ রকমের শিক্ষা তার সামর্থ্যকে বিকশিত করবে, কেমন শিক্ষা সেই ক্ষমতাকে বৃদ্ধির পথে সাহায্য করবে ?

শিক্ষা-দর্শনে এতকাল এই বিষয়ে অনেক কথাই হয়ে গেছে, কিন্তু ইস্কুলে সেগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করা গেল না। ব্যবহার করতে পারা গেল না, কারণ ইস্কুল, সমাজের প্রচার-যন্ত্র হয়েই ছিল মূলত, সময় সময় শিশুর মন নিয়ে 'হা টিমা টিম্' করছিল, আর তাই নাকি শিশু-দর্শন, বা শিশু মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান ছিল শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে 'আপনার মনের মাধুরী' হ'য়ে। আমেরিকা সেই খানেই আঘাত হানল এই পরিচালনা পদ্ধতির আবাহন ক'রে, ইস্কুলের কাজ-কর্মেই শিশুকে বিচার ক'রে। মনোবিজ্ঞানের যে-আলোক এতকাল দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছিল, সেই দর্পণকে বিশেষ বস্তু-দর্শন দিয়ে আমেরিকা টুক্‌রো টুকরো ক'রে দিল। কিন্তু প্লেতোর সেই মানুষটির মতো আমেরিকার শিক্ষা-দর্শনও 'গুহার দেয়ালের' দিকে মুখ ক'রেই জীবন-যাত্রার ছায়া দেখে মনে করছে, আসল বস্তুটিই সে দেখছে। কারণ, এই পরিচালনা-পদ্ধতিতে শিক্ষকের উপর এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে যে মানুষ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ঈশ্বরের উপরও কোন দিন এত অত্যাচার করেনি, এত ভরসা করেনি। আর এই পরিচালনা-পদ্ধতি যদি কোনদিন সফল হয় তবে ফুটপাথের গণৎকারের উপর সুস্থ মানুষেরও আস্থা ফিরে আসবে।

এ বিপদ যে সেখানকার শিক্ষাব্রতীরা অনুমান না করেছেন তা নয়; কারণ তাঁরা 'অনুমান' দিয়ে এ বিপদ বোঝেন নি, এই বিপদ আসা যে সূর্যের মতোই স্বাভাবিক তা তাঁরা জানেন।

যে-বিপদ অনিবার্য সে বিপদ সম্পর্কেই সতর্ক ক'রে দিয়ে তাই তাঁরা বলেন: (১) ইস্কুলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছাত্রদের উপর এটি ইস্কুলের 'উপরি' প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা উচিত হবে না, (২) পূর্ব-পরিকল্পিত কার্যক্রমকে গ্রহণ করাতে ইস্কুলের একটি অস্ত্র হিসাবেও একে ব্যবহার করা হবে না।

তবে কি হিসাবে দেখা হবে? সমগ্র জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইস্কুলের

অভিজ্ঞতা কেমন ভাবে নির্বাচন ও যুক্ত করা যায়, নির্বাচিত ও সংযুক্ত হ'য়ে যায় —তা-ই অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করতে যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপযুক্ত ভূমি-সংস্থান প্রয়োজন, তাকেই আয়ত্ত করবার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের এক প্রচেষ্টা মাত্র (It should be an effort on the part of Counselor and student to gain a vantage point from which they can see how his school experiences may be selected and incorporated with his total life experience—R. Strang)। এমন কল্প-লোকের সংজ্ঞা হিং-টিং-ছটের মতো অনেকটা। কিন্তু এর কার্যক্রমে তেমন অস্পষ্টতা নেই। এই কার্যক্রমের উপকরণ হচ্ছে, (১) ছাত্র-ব্যক্তির ক্ষমতা এবং অনুরাগ সম্পর্কে জ্ঞান, (২) শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যাপকতা সম্পর্কে চেতনা, (৩) কার্যক্রম এবং নির্দেশনা—যাতে ছেলেরা বুদ্ধির সঙ্গে এই সব নির্বাচন করতে শেখে।

আরও স্পষ্ট করতে হলে বলতে হয়, এর মধ্যে করণীয় হচ্ছে,

(১) শিক্ষা-গ্রহণ ক্ষমতা সম্পর্কে ছাত্রের নিজস্ব পরিমাপ।

(২) তার বৃত্তিগত প্রবণতা এবং আগ্রহ সম্পর্কে জানা-র ব্যবস্থা।

(৩) ইস্কুলে এবং সমাজে শিক্ষাবিষয়ের কি কি বিষয় আছে সে সম্পর্কে সংবাদ রাখবার উপায়।

(৪) ছাত্রের ক্ষমতা এবং অনুরাগ অনুসারী ইস্কুল, কলেজ অথবা শিক্ষণ-বিদ্যালয় বাছাই করার ব্যবস্থা।

(৫) এই শিক্ষা-সুযোগের যে সব বাধা তার আছে সেগুলো ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ ক'রে সেগুলি অপসারণ করা।

অস্পষ্টতা নেই, কিন্তু এসব ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে বহু মত আছে, দ্বন্দ্ব আছে। বিশেষ ক'রে, প্রথম দুটি বিষয়ে আজও তো কেউ একমত হ'লেন না। কেউ কেউ এই সব অভীক্ষাকে ব্রহ্মাস্ত্র বলে মনে করেন, কেউ কেউ এই সব অভীক্ষাকে 'লাফিং-গ্যাস' বলেন। এই জন্য স্থিরবুদ্ধির ব্যক্তিরা বলেন, কোন ব্যক্তিকে জানবার জন্য বহুবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে অভীক্ষাপত্রের ব্যবস্থা একটি; কোন নির্ণীত অবস্থার মধ্যে সে কেমন আচরণ করে সেই-

গুলি প্রতিফলিত হয় অভীক্ষায়; প্রত্যেক অভীক্ষা সমগ্র অস্মিতার কোন একটি মাত্র দিককেই পরিমাপ করতে পারে; কাজেই, কোন বিষয়ে একমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য অভীক্ষাকে ব্যবহার করা উচিত নয় (Tests are only one of many sources of understanding a person. They show how he responds in certain standardised situations. Each test is merely one measurement of the total personality and should never be used as the sole basis for decision making—Strang.)।

প্রথম দিকে দেখা যায়, ছেলেরা ইস্কুলের পাঠ-বিষয়ে কতগুলো অসুবিধা বোধ করে; সেই অসুবিধার সন্ধান করতে দেখা যায়, আর্থিক সামাজিক, স্বাস্থ্য-বিষয় এবং প্রক্ষোভের দিক দিয়ে তাদের অনেক জট আছে। এত দিক দিয়ে উপদেষ্টার কাজ যখন অগ্রসর হয় তখন স্বভাবতই তাঁকে অনেক বিপদ এবং নিজের নীতির উপর গোঁযাতুর্মির সম্মুখীন হ'তে হয়। ছাত্রই হোক আর উপদেষ্টাই হোক নিজের মন এবং কর্ম-নিষ্ঠার একরোখা দিকটিকে কেউ-ই একেবারে কাটিযে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে কির্কপ্যাট্রিক (kirckpatrick) কিছু সন্ধান ক'রে বলেছেন—

'যখন ছাত্রদের শিক্ষায় মানসিক প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম রচনার বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার, তখন কাউন্সেলর বা উপদেষ্টা যেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি নির্বাচনের উপর আগুরি কতগুলি জোর দিয়ে বসেন।' কিন্তু একথা বোঝা দরকার, 'যদি ব্যক্তির বুদ্ধি এবং বুদ্ধি বিকাশের উপর নজর দিয়ে সেইগুলির ভিত্তিমূলক কিছু আন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা ক'রে দেওয়া যায়, তবে বৃত্তিগত পরিচালনা স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তীকালে (তাদের জীবনের ঠিক সময়ে) আপনা থেকেই পথ ক'রে নেবে।'

উপদেষ্টাই হোক আর মনোবিদই হোক কোন মানুষের পক্ষেই অন্য মানুষকে জোর ক'রে বলতে যাওয়া ঠিক হবে না যে, 'তুমি বাপু কেবল এই কাজটিরই উপযুক্ত।' যত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হোক, যত অভীক্ষাই থাকুক—সেগুলি নিতান্তই তার জীবন-পথের কতগুলি সহায়ক নির্দেশ

মাত্র। এই নির্দেশ নিয়ে কাকেও প্রবঞ্চিত করা বা শিক্ষা আর বৃত্তি বিষয়ে পঙ্গু ক'রে দেওয়া এক রকমের অপরাধ।

কিন্তু কেন এমন প্রবঞ্চনা আসে? উপদেষ্টারা কি কেবলই গণক ঠাকুর? তা হয়ত নয়। তবে তাঁরা বের্গসঁ আর জেম্‌সের মনোবিজ্ঞানের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন ক'রে বসেন। যেমন ক'রে কোষ্ঠী নির্মাতারা আজও টলেমীর বিশ্বসংস্থানের আজগুবি নির্দেশকে মেনে 'বক্রী বৃহস্পতি' প্রভৃতি গণনা করেন, যে জন্য তাঁরা আজও 'গ্রহাণুপুঞ্জ'কে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না।

মানুষ তার অতীত মানসকেই অনুসরণ করে; আজ যা 'করছে' তাই নিয়ন্ত্রিত করবে কালকের 'করা'-কে। কেবল ব্যক্তিই যে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, সমাজের আশু চাহিদা-ও ভীষণভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। চাকরী ক'রে খেতে গেলে সন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরা যায় না, তা তো আমরা জানি-ই, তা তাঁদের আদর্শ যত বড়-ই হোক; রেলে চড়তে গেলে নিজের টিকিট নিজেই 'কিউ' দিয়ে কিনতে হবে; মালের উপর নজর রাখতে হবে —কারণ জুয়াচোর চোর আর পকেটমার নিকটেই আছেন। বড় কর্তাকে খুসী করতে হলে নিজের বাড়ীতে 'ঘি' তৈরী করতে হয়; পুকুরে ইলিশ মাছ মারতে হয়। যুদ্ধের সময়ে দেশে কেউ বেকার থাকে না, সে সময়ে স্ত্রীজাতিকে 'নরকের দ্বার' মনে করা যায় না; যুদ্ধের পর ব্যাঙ্ক-এর 'পতন ও মূর্ছা' ঘটে। এমনি ক'রে ব্যক্তির উপর ছ'দিকের নিয়ন্ত্রণ আছে। আর উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে ব্যক্তি-মানসকে মর্যাদা দিতে হয়; কারণ ইস্কুল আর তার উপদেষ্টা—রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত।

এমন অবস্থায় 'নিয়ন্ত্রণ-বাদ' সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীদের কথা কেউ শুনতে পায় না। শুনতে পেলেও, এককালের পদার্থবিজ্ঞানের নীতি যে অন্যকালে বদলে যাচ্ছে তা কেউ মানতে চায় না। কারণ 'অভ্যাস' হচ্ছে অতীতমুখী। অভ্যাস বদলাতে সময় লাগে। মোহ ভাঙতে মুদ্গরের প্রয়োজন। নিউটনের যান্ত্রিক-নীতি পদার্থের তরঙ্গ-ধর্মিতা থেকে যে অনেক পৃথক, তা বিজ্ঞানের গ্রন্থটিতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। তেমনি, দেকার্ত, স্পিনোজা, লেইবনীজ,

(৩) শ্রেণীকক্ষের ছাত্রদের ব্যক্তি-মুখীন পড়ানো পদ্ধতি আশ্রয় করা

(৪) ছাত্রের উপরই শিক্ষা গ্রহণ করার প্রক্রিয়া অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ করা

(৫) ইস্কুলের কার্যক্রমে আবশ্যিক ভাবে এবং একান্ত ভাবে এই উপদেশাত্মক পরিচালনার সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া

(৬) ছাত্রদের ক্রিয়া-কর্মে কোন্ ছাত্রব্যক্তির কি রকম আগ্রহ, কি রকম সুযোগ তারা সে বিষয়ে পাচ্ছে—তা একান্তভাবে ইস্কুলের পক্ষে বিচার করা এবং তাদের সেই আগ্রহকে স্বীকার ক'রে নেওয়া; মনে রাখতে হবে—ছাত্রব্যক্তির এই আগ্রহ আর সুযোগ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, তবে তাদের বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে এসব ক্রিয়াকর্ম অশেষ সাহায্য করবে।

উপরের অনুশাসনগুলি পড়লেই বোঝা যায়, প্রবীণ উপদেষ্টা কত সঙ্কোচ আর সতর্কতার সঙ্গে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান। এত সতর্কতা রাখতে গেলে বিশেষ-শিক্ষণ এই বিষয়ে দরকার। তবু সন্দেহ হয়, যেখানে মানুষের মন থাকে, সেখানে কি এতখানি নিষ্ঠা আর সতর্কতা আশা করা যায়? যেখানে সমাজ বহু-মানুষের কল্যাণের দিকে, সেখানে কি কোন বিশেষ ব্যক্তির কল্যাণকে এতই বড় ক'রে দেখতে চাইবে? কে জানে, হয়ত চাইবে। শুভ-নাস্তিক হওয়ার চেয়ে শুভবুদ্ধির হওয়া ভালো, কারণ সেখানে বুদ্ধি একটু বিশ্রাম পায়।

উপসংহার

এই খণ্ডে পাশ্চাত্য আর আমেরিকা-ভূখণ্ডের ইস্কুলের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে আমরা বেশ বুঝতে পারলাম, যুগ, দেশ এবং সমাজ অনুযায়ী শিক্ষা বদলায়; প্রাচীন ইস্কুল, শিক্ষানীতি, পদ্ধতি প্রভৃতি নতুন যুগে কাজ দেয় না; কোন বিদেশী জিনিস কোন সমাজের অঙ্গে মিশ খায় না বলেই তার পরিবর্তন হয়। সমাজ একগুঁয়ের মতো চাপানো-ইস্কুলকে ঢেলে ভেঙে সাজিয়ে নেবেই। হয়ত তার মধ্যে অনেক শিশুর দুর্গতি ঘটে গেল। মাটির তলার তেলের অনুসন্ধানকারীদের মতো শিক্ষাব্রতীরা মাঝে মাঝে ডিনামাইট বা ঐ জাতীয় কিছুর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কৃত্রিম ভূকম্পন সৃষ্টি ক'রে ইস্কুলকে মেপে দেখবেন, পরীক্ষা ক'রে দেখবেন; সেই কম্পনে বসতি-অঞ্চলের মাটির কিছু অনিষ্ট ঘটে যাবে, স্থায়ী সমাজে আলোড়ন আসবে—কিন্তু পরিশেষে স্থায়ী-সমাজ একটা স্থিরতার সন্ধান করে নেয়ই। এর মধ্যে,

> 'দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
> নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
> সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।'

কারণ, নিখিল এবং মহাকাল বড় বেশী সজাগ আর ভয়ঙ্কর রকমের অব্যয়। কোন অভিনবত্বে, কোন রক্ষণশীলতায়, কোন ক্ষয়-ক্ষতিতে, কোন কায়েমী স্বার্থে, কোন বিপ্লবে সে ভ্রূক্ষেপ করেনা। সেই নিখিল আর মহাকালের প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে যুগযুগান্তরের মানব সমাজ—মানবের অজ্ঞাত তার মানসিকতা। সেই বুঝি 'সোনার তরী'।

পরিশিষ্ট

এই খণ্ড রচনা করতে যে-সব পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা গেল। অন্যান্য-গুলি পুস্তকের মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি।

K. K. Mookerjee—New Education and its aspects.

Ali Akber—German School System.

Eby and Arrowood—History of Philosophy of Education (Ancient & Medieval).

Laurie—Historical survey of Pre-christian Education.

Gerth—Character and Social Structure.

Skinner and Langfitt—An introduction to modern Education.

Bernard Darwin—The English Public Education.

Oman—A History of Greece.

Werner Jaeger—Paideia : the ideals of Greek.

Arnold Toynbee—A Study of History (Somervell edition).

Will Durant—The life of Greece.

Jean Debiesse—Compulsory Education in France.

Compayre and Payne—The History of Pedagogy.

Auchmuty—Irish Education.

Andreas Boje—Education in Denmark.

Dover Wilson—The Schools of England.

Montmorency—State intervention in English Education.

Isaac Sharpless—English Education in the elementary and Secondary Schools.

Scott James—Education in Britain ; yesterday, To-day and To-morrow.

Townsend Warner—Landmarks in English Industrial history.

Trevelyan—Illustrated English social History.

Stirling Taylor—A modern History of England.

Laski—The American Democracy.

Cubberley—Readings in the History of Education.

Freaman—Schools of Hellas.

Monroe—A brief course in the History of Education.

G. D. H. Cole—Lectures on social theories,

Wilkins—Roman Education.

Archer—Rousseau on Education.

Bowen—Froebel.

Chalke—A synthesis of Froebel & Herbart.

Compayre—Herbart and Education by Instruction.

Davidson—(a) Aristotle, (b) Rousseau.

Green—Educational Ideas of Pestalozzi.

Hayward—Pestalozzi, Herbart & Froebel.

Peterson—A hundred years of Education

Samuel & Thomas—Education and society in modern Germany.

Boyd—History of Western Education.

Moore—Fifty years of American Education.

Fyffe—Greece.

Slesinger - Education and the class struggle

Veblen—The Vested Interest.

Manheim—Freedom, Power, and Democratic Planning.

Crosser—The Nihilism of John Dewey.

H. R. Hall—The Ancient history of the Near East.

Breasted—History of Egypt.

Barnett—Innovation.

Aldous Huxley - Ends & Means.

James Jeans - Physics and Philosophy.

Joad—(a) Guide to Philosophy ; (b) Philosophy (Teach yourself series).
Strang—Educational Guidance.
Brewer—Education as Guidance.
Wesley—Teaching Social Studies in High schools.
Frasier—An introduction to the study of Education.
Mursell—Education for American Democracy.
Roman—The new education in Eurpe.
Findlay—The School
Mc Iver & Page—Society.
Ogburn & Nimkoff—A handbook of sociology
Gordon Childe—Man Makes Himself.
Montessori—Montessori Method.
Monroe—A cyclopaedia of Education.
W. Monroe—Encyclopaedia of Educational Research.
Sandiford—Comparative Education.
Hans—Comparative Education.
Meyer—An educational history of the American People.
Stevenson—The Project method of Teaching.
Balfour—Educational systems of Great Britain and Ireland.
Birchenough—History of elementary education.
Education Act, 1944 (England).